মৌন রেখা

শ্রীমতী কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়

"মোর গলার স্বরটি নীরব হবে যবে
এই হাতের লেখা, মৌন রেখা,
...দিন কথা কবে।"
—রবীন্দ্রনাথ

কলিকাতা গভর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ
ডক্টর অনন্তপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শাস্ত্রী
বিদ্যাভূষণ, বাচস্পতি, এম.বি ই., এম.এ., এল.এল.বি., পি.এইচ.ডি.(অক্সন) কর্তৃক
সম্পাদিত

১৩৬৩

ভূমিকা

'ভিল্‌হেলম টেলের প্রতি পত্রাবলী'তে গেটে লিখিয়াছিলেন—"সুখ তোমার একান্ত লক্ষ্য, কিন্তু উহা কি ও কেমন করিয়া পাওয়া যায়? কোন বিশেষ লক্ষ্য হারাইবার প্রকৃষ্ট উপায়, ঐ লক্ষ্যটীর দিকে মুখ্যভাবে সরাসরি অগ্রসর হওয়া। আনুষ্ঠানিক চেষ্টার অন্তিমে দেখিবে যাহা পাইয়াছ, তাহা চাহ নাই, তাহা তোমার লক্ষ্য সুখ নয়। কিন্তু যদি পারিপার্শ্বিক বিচিত্র সংঘটনের সাহচর্য্যে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে পার, অভীষ্ট লাভ হইতে পারে।"

এই অনুকূল সমন্বয়ের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়—সাহিত্যে। শব্দচিত্রনিপুণা এক মহীয়সী মহিলার রচনাবলীতে এই পারিবেশিক সৃষ্টি সফল হইয়াছে। স্বর্গীয়া কল্যাণী চট্টোপাধ্যায় 'মৌন রেখা'য়—কবিতা ও গানে, গল্প ও প্রবন্ধে, উপন্যাস ও নাটকে, গৃহকর্ম্ম ও বেতার-ভাষণে—যে সাহিত্য সম্পদ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই উপাদেয় ও উপভোগ্য। ইহাতে প্রত্যেকটী তরুলতার মাধুর্য্য পাই, আর পাই পটভূমির বিশাল বনানীর উদারতা। প্রবাদ আছে, আকবর একদিন এক বনে পরিভ্রমণ করিবার সময় হঠাৎ শুনিলেন কে গান করিতেছে; এমন গান তিনি কখনও শুনেন নাই। অগ্রসর হইয়া দেখিলেন তাঁহারই রাজগায়ক তানসেন। বলিলেন—'আমার সহিত প্রতারণা করিয়াছ। এমন সুন্দর গান আমাকে কখনও শুনাও নাই।' তানসেন উত্তর দিলেন—'না দিল্লীশ্বর, স্বেচ্ছাকৃত প্রবঞ্চনা নয়। রাজসভায় গান করি আপনার সামনে, শ্রোতা ওমরাহবৃন্দ। এখানে মুক্ত আকাশ, জীবন্ত ব্রততীবিতান, মহীরুহ-মহোৎসব, সান্নিধ্য স্বয়ং জগদীশ্বরের।' কল্যাণী দেবী নিজের অবাধ আনন্দে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন; তাই তাঁহার সমন্বিত আলেখ্য রঙ্গভূমির বহু বিন্যস্ত রশ্মিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

ঈপ্সিত অনীপ্সিত নানা কার্য্যকলাপ ও অবস্থা ব্যবস্থার অন্তরালে যে ছবিটী ফুটিয়া উঠে তাহাকেই নারী অভিধা দেওয়া হয়। এইরূপ এক একটী নারীকে কেন্দ্র করিয়া পারিবারিক এবং জাতীয় শিক্ষা ও সমাজ গড়িয়া উঠে। তন্ত্রে জায়াকে গৃহমাতৃকা বলে ; জায়া জগদম্বার অংশরূপিণী। প্রতিদিনের নানা কর্ম্মের সম্মেলনে যে রূপটী সাকার হইয়া উঠে, উহাই আমাদের নারীবিগ্রহ। এই বিগ্রহের আদর্শ মুকুরের মত আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবন প্রতিবিম্বিত করে। আদর্শের মালিন্য ঘটিলেও, আদর্শের প্রতি একটা ক্ষীণ ও অস্ফুট মমত্ববোধ এখনও বজায় আছে।

গৃহমাতৃকা কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়ের অভিজাত আদর্শ দিক্‌পালপ্রতিম স্নেহশীল স্বামী, সুকৃতি সন্তান সন্ততি, সাবিত্রী-সমানা স্নুষা ও গুণমুগ্ধ পরিজনের আসরে যে সাহিত্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও অনিবার্য্য ; তাহা আপাতমধুর নগদ বিদায়ের লোভে বদ্ধ বা মুগ্ধের পক্ষে সম্ভব নয়। 'স্তুতিশুল্কবান্ধবতা' কল্যাণী দেবীর ললাটে বিধাতা লিখিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রায় ২০০ পৃষ্ঠায় নানা চিত্র ও চরিত্রের রেখা পাই, কিন্তু যিনি এই পরিকল্পনায় সত্ত্বযোগ করিয়াছেন, সেই কল্যাণী দেবী পাঠকের কল্পনার বিষয় থাকিয়া যান। অথবা ইঙ্গিতে আভাসে উহা যেন অনুসন্ধিৎসার ইন্ধন জোগায়। 'গৌরীদান' (পৃঃ ১৪) এত আন্তরিক কেন, 'পঞ্চশরে'র (পৃঃ ১) ভজহরিবাবুকে এত পরিচিত মনে হয় কেন, 'একটী দিন' ও 'স্মৃতি' (পৃঃ ৯, পৃঃ ৭৯) পড়িতে পড়িতে চোখের পাতা আপনি ভিজিয়া উঠে কেন? তাঁহার নাটকগুলি (পৃথক ভাবে প্রকাশিত হইবে) কৃত্রিম প্রসাধন নিরপেক্ষ, নিসর্গের মুকুর, জগৎ প্রতিবিম্বিত করিতেছে। মানসীর সীমন্ত সিন্দুর উজ্জ্বল করিয়া দিবার, অথবা মোহিনীর কণ্ঠ-মালার মুক্তায় শুভ্রতার আরোপ করিবার জন্য কল্যাণী দেবী 'মিনিয়েচর' চিত্রকরের ন্যায় বর্ণফলকে ধীরে ধীরে তুলিকা ঘর্ষণ করিতেন না ; অনায়াসে, অবলীলায়, উপন্যাস ও নাটকের বিশাল পটে বহিঃপ্রকৃতির ও অন্তঃপ্রকৃতির উপভোগ্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। চিরাগতকে

নবাগতের সহিত সুসঙ্গতভাবে খাপ্ খাওয়াইবার চেষ্টা ঠিক সেইভাবে সাহিত্যের সৌরভ বিতরণ করে যেরূপ লিখিয়াছিলেন সে কালের রাজকবি ঃ কুসুম সুগন্ধির অনুভূতি আধারবদ্ধ নির্য্যাসের ভিতর পাইবে না ; ছড়াইয়া দাও উহা নৃত্যরতা, বসনে ভূষণে সজ্জিতা সুন্দরীর তরঙ্গায়িত অঞ্চলে ; উহা আকাশে বাতাসে ভাসিয়া যাক। ইহাই সৌরভের যথার্থ অবদান।

কল্যাণী দেবীর কবিতা—অকৃত্রিম, অনাবিল। ইহাতে পাই নিজের আনন্দে আপনাকে বিলাইয়া দিবার মাধুর্য্য। কবিতা আলোচনায় অনেক সময় মতান্তর ও মনান্তরের সৃষ্টি হয়। কবি কে? যিনি মনের কথা খুলিয়া বলেন ; যাহা বলি-বলি বলা হয় না—যাহা বলি-বলি বলিতে পারি না,—কবি তাহাই স্পষ্ট বলিয়া দেন। কেবল বলিয়াই ক্ষান্ত হন না ; কবি এমন করিয়া কথাগুলি বলিয়া দেন, যাহার প্রভাবে অনেক নূতন কথা, কত অ-জানা দেশের অপরিজ্ঞাত কথা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। সে সব কথা বলা যায় না, পরন্তু বুঝা যায় ; বুঝি বা তেমন করিয়া বুঝাও যায় না, তবে কেমন-যেন কি-রকম ভাবে সে সব কথা আপনা হইতেই মনে জাগিয়া উঠে। তাই বলিতে হয় যে সে সব বিষয়ের ভাষা নাই ; অভিব্যঞ্জনার কোন উপায় নাই। ভাগ্যে থাকে বুঝিতে পারিবে ; ভাগ্যে না থাকে ত এ জীবনে আর সে বিষয়ের বোধ ও বোধ-লক্ষণা কোন কিছুরই উপলব্ধি হইবে না। কাজেই বলিতে হয়, কবি বুঝান না—দেখান ; কদাচিৎ দেখাইতেও পারেন না—কেবল ভাবান। কল্যাণী দেবীর কবিতা পড়িয়া মনে হয়—কবি সদাই মৃগমদমত্ত, স্বীয় কল্পনাগত সৌরভে আকুল ; পাঠক সে কস্তুরীমঞ্জুষা খুঁজিয়া বাহির করিয়া লন।

রচনাগুলি প্রকাশের কিছু ইতিহাস আছে। আত্মীয়-স্বজনের আশা ছিল লেখয়িত্রীর জীবদ্দশায় ইহার প্রকাশ হইবে ; আত্মীয়, অনাত্মীয় তাঁহার প্রতিভাপ্রসূত আনন্দ মাধুরী উপলব্ধি করিবেন। কল্যাণী দেবীর অকাল মৃত্যুতে এই আশা অপূর্ণ রহিয়া গেল। শোক-বিহ্বল স্বামী শ্রীরতনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখন ইহার প্রকাশ

করিয়া ন্যস্ত কর্ত্তব্যের উদ্‌যাপন ও শোকে শান্তি অন্বেষণ করিয়াছেন। কালসিন্ধুর পরপারে দাঁড়াইয়া কল্যাণী দেবী ইঁহাকে সান্ত্বনা দিবেন—'আলো ও ছায়া' রচয়িত্রীর ভাষায়ঃ

গত যা, তা গত, প্রিয়,
কেন ভাব আর ?
এ নহে সে ক্ষত, প্রিয়,
দাগ শুধু তার।

মহালয়া, ১৩৬৩

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী

প্রকাশকের নিবেদন

'মৌন রেখা'র প্রকাশ উপলক্ষে দু-একটি কথা এখানে নিবেদন করি। মাতৃদেবীর জীবদ্দশাতেই তাঁর সমস্ত রচনার একখানি নির্বাচিত সংকলনগ্রন্থ তাঁর হাতে তুলে দেবার বাসনা ছিলো, কিন্তু আমাদের সংকল্প কাজে পরিণত করার আগেই নিষ্করুণ মৃত্যু তাঁকে আমাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিলো। আত্মীয়-স্বজন এবং তাঁর রচনার অনুরাগী অসংখ্য পাঠকের উৎসাহে ও সহযোগিতায় এতদিনে 'মৌন রেখা' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে পেরে আজ তৃপ্ত বোধ করছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে, পরম শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর অনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনায় ও সহায়তায় 'মৌন রেখা'র প্রকাশ সম্ভব হ'লো। মাতৃদেবীর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত যাবতীয় পাণ্ডুলিপি থেকে বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি তিনি নির্বাচন ক'রে দিয়েছেন। তাঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গ্রন্থের 'বেতার-ভাষণ' পর্যায়ের রচনাগুলি অল্ ইণ্ডিয়া রেডিয়োর সৌজন্যে ও অনুমতিক্রমে প্রকাশিত হ'লো। এই সুযোগে বেতারকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষকেও আমাদের ধন্যবাদ জানাই।

নেপথ্যে থেকে যিনি এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে ও আমাদের কর্তব্য সম্পাদনে অশেষ উৎসাহ দিয়েছেন, যাঁর সর্বাঙ্গীণ আনুকূল্য না পেলে 'মৌন রেখা' প্রকাশের বাসনা অপূর্ণ থাকতো, সেই নিত্যশুভার্থী আমাদের পিতৃদেব শ্রীরতনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীচরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন ক'রে কৃতার্থ হই। ইতি

১ কুইন্স পার্ক
কলকাতা-১৯
৩.১০.৫৬

শ্রীলোকমোহন চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

পরিচয়	...	এক—চার
গল্প	...	১—১০১
পঞ্চশর		১
একটি দিন		৯
গৌরী-দান		১৪
"সে"		২৩
লম্বা হবার বিপদ		২৫
অশ্রুজল		৩০
অন্তরালে		৩৫
জিজ্ঞাসা		৪৯
দোটানা		৫৪
একটি স্মরণীয় ঘটনা		৭৭
স্মৃতি		৭৯
পরগাছা		৮৫
বেতার ভাষণ	...	১০২—১৭৪
শরৎ		১০২
হেমন্ত		১০৭
শীত		১১১
বসন্ত		১১৬
কৃষ্ণভাবিনী দাস		১২০
শ্রীমা		১২৪
মহীয়সী নারী পুত্‌লি বাঈ		১২৮
সাধক সন্তদাস		১৩১
সাধক তুলসীদাস		১৩৪
নৃত্য		১৩৯
তোমায় সাজাবো যতনে		১৪১

জাতকের ইতিকথা	১৪৪
বিবাহিতা জীবন বনাম স্বাধীন জীবন	১৪৬
সংসার পরিচালনা	১৪৯
সুখের সংসার	১৫২
কাপড় কাচা	১৫৪
৭ই পৌষ	১৫৫
পরনির্ভরতা	১৫৮
ভাঙ্গন	১৬২
কাঠের কাজ	১৬৫
ঈশপের গল্প	১৬৮

কবিতা ও গান ... ১৭৫—১৯৯

মা	১৭৫
শরতে আগমনী	১৭৬
অহঙ্কার	১৭৬
স্মরণে	১৭৭
রবীন্দ্র স্মরণে	১৭৮
গান্ধীজী	১৭৯
মরণ	১৮১
ফাল্গুনে	১৮২
প্রাণের ডাক	১৮৩
তৃপ্তি	১৮৪
বর্ষা বিদায়	১৮৫
সারী	১৮৬
হাসনুহানা	১৮৮
মূল্যহীন	১৯০
মানা	১৯১
অভিমান	১৯১
অভিসারিকা	১৯২
একা	১৯৩
গান	১৯৪

কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণী

স্বর্গীয় মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের বৃহৎ অট্টালিকার এক নিভৃত কক্ষে ১৯০৫ সালের ১০ই মে মাসের শুভ মুহূর্তে যে কন্যাটি মা বাপের কোলে এলো আদর করে সবাই তার নামকরণ করলেন কল্যাণী। বিধাতা পুরুষও বোধ হয় এই নামেরই উপযুক্ত লিখন লিখে দিয়ে গেলেন এই চিরকল্যাণময়ী কল্যাণীর ললাটে।

বৃহৎ সংসারের বিরাট নিত্য আয়োজন ও প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যেও কল্যাণী তার আপন মনের নির্লিপ্ততা নিয়ে বেড়ে উঠতে লাগলো দিনে দিনে।

পিতা জগদীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র কন্যা স্নেহের দুলালী কল্যাণী তাঁরই কাছে পেলে ছবি আঁকার প্রথম প্রেরণা। মাতা মহাপ্রভা দেবীর কাছ থেকে জানলে, শিখলে ঐ অল্প বয়সেই সংসারের যাবতীয় নিত্য কর্মের সকল সমস্যা ও সমাধানের সুকঠিন পাঠ। পরবর্ত্তী কালে কল্যাণীর জীবনে এই দুই শিক্ষার ধারা এক হোয়ে অপরূপ শ্রীমণ্ডিত করেছিল নিজের সংসারকে।

পুতুল খেলার সংসারের সকল খেলা মিটিয়ে নেবার আগেই কল্যাণীর জীবনে আহ্বান এলো নিজের সংসার পাতার। খেলাঘরের আসন ছেড়ে দশ বছরের মেয়ে কল্যাণী সালঙ্করা বধূরূপে এসে বসলো সম্প্রদানের পিঁড়ীর উপর ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গী রতনমোহনের পাশে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের জামাতা বিখ্যাত এটর্নি ৺রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র রতনমোহনের জীবনসঙ্গিনী হলেন কল্যাণী, ১৯১৫ সালের জুন মাসের এক শুভ মুহূর্তে।

কল্যাণীর জীবনের পরম বিস্ময়রূপে দেখা দিলেন তাঁর শাশুড়ী শ্রীমতী সুনয়নী দেবী, যাঁর মাঝে পরিপূর্ণ প্রকাশ লাভ করেছিল বহু

॥ দুই ॥

কলাবিদ্যা কুশলতা—যা তিনি স্বয়ং লাভ করেছিলেন তাঁর তিন দিক্‌পাল গুণীশ্রেষ্ঠ ভাইয়েদের কাছ থেকে—গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ।

সুনয়নী দেবীর স্নেহ ভালবাসায় ও শিক্ষায় বধূ কল্যাণীর শিক্ষা হোল সম্পূর্ণ। তিনি হোলেন নানা বিদ্যার অধিকারিণী।

আর হোল রঙিন মধুর তাঁর অবসর মুহূর্তগুলি স্বামী রতনমোহনের সাহচর্য্যে। দিবারাত্রের জাগ্রত স্বপ্নের সহচর রতনমোহন তখন ছাত্র ও কর্ম-জীবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। পিতা রজনীমোহন তাঁর বিরাট কাজের ভার ধীরে ধীরে উপযুক্ত পুত্র রতনমোহনের হাতে তুলে দিয়ে অবসরের আশায় উদ্‌গ্রীব। এই কর্মচঞ্চল দিনগুলিতে কল্যাণী তাঁর শিশু সন্তানগুলির সকল ভার নিজের হাতে তুলে নিয়ে স্বামীকে দিলেন পরম নিশ্চিন্ততা। রতনমোহন পরম উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কর্মস্রোতে—যে স্রোত আজও প্রবল ধারায় বইছে তাঁরই হারিয়ে যাওয়া কল্যাণীর নির্দ্দেশিত জনকল্যাণের ক্ষেত্রে।

স্বামী রতনমোহনের পার্শ্বচরী, কল্যাণীকে চলতে হোল নানা পথের নিশানা ধরে শুধুই স্বামীর কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে। এল খ্যাতি, এল যশ, এল ধন, এল পরিপূর্ণ সংসারের আনন্দ, দাস দাসী, পরিজন, এল বহু অনাত্মীয়ের প্রীতি, ভালবাসা, ভক্তি। তিনিও বিলিয়ে দিয়ে গেলেন মুক্ত হাতে সবার জন্য নিজের স্নেহের দান।

তিনি নিজের টাকায় স্থাপনা করলেন 'কল্যাণী এক্‌স-রে ফাণ্ড' যা আজ সত্যই সকলের গর্ব্বের বস্তু, যা আজ বেঙ্গল টিউবারকুলোসিস এসোসিয়েশনের একটি বিরাট অংশ বিশেষ। দুঃস্থ রোগীদের পরীক্ষা হোচ্ছে আজ কল্যাণীর কল্যাণে।

কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে হোলো কল্যাণীর যোগাযোগ। তাঁর কণ্ঠ ছিল অতি মিষ্ট—অতি পরিষ্কার—তিনি বেতারে পাঠ করতে সুরু করলেন স্বরচিত গল্প, কথিকা, পদ্য ও নানা বিষয়ের রচনা।

কলকাতার বিখ্যাত চিত্র-প্রদর্শনীতে স্থান পেল কল্যাণীর আঁকা ছবি*—পেল পুরস্কার। কল্যাণীর কল্যাণময়ী স্পর্শে তাঁর স্বামীর জয়যাত্রার পথ হোল উদ্‌ভাসিত। ইংরাজ সরকার দিলে তাঁকে এম. বি. ই. খেতাব। ডেপুটি সেরিফের পদলাভ করলেন তিনি। নানা সরকারী ও জনহিতকর† কাজের সঙ্গে যোগাযোগ হোল তাঁর।

পরিবারের সবার আশীর্ব্বাদ, স্নেহ কুড়িয়ে নিয়ে এই কল্যাণী নারীর সোনার তরী সংসারের সুবাতাসে পাল তুলে আনন্দে ভেসে চললো পরম নিশ্চিন্ততায়।

দুই পুত্র রাসমোহন ও লোকমোহন হোয়ে উঠলো উপযুক্ত—মা দিলেন তাদের নিজের জীবনের অনুকরণে সংসার বেঁধে। দুই কন্যা রচনা ও ইরাকেও দান করলেন উপযুক্ত পাত্রে। নাতি নাতনির কলধ্বনিতে হেসে উঠলো রতনমোহন ও কল্যাণীর সাজানো ফুলের বাগান।

এইবার বোধ হয় সময় হোল সংসারের নিত্যকর্মের ক্রমবর্ধমান ব্যস্ততা থেকে চির অবসর নেবার, এই কথা যখন ভাবছেন স্বামী-স্ত্রীতে তখনই এলো ঘনিয়ে সংসারের ঈশাণ কোণে পুঞ্জীভূত মেঘ ঘন অন্ধকার কালো ছায়া বিস্তার করে।

কল্যাণীর সোনার তরীর রঙিন পালে লাগলো ঝোড়ো হাওয়া—তরী উঠলো দুলে—স্বামী রতনমোহন উঠলেন হাহাকার করে। তাঁর সংসারের সোনার তরীর কাণ্ডারী সোনার প্রতিমা কল্যাণী নিলেন চির বিদায় ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে কয়েক দিনের অসুখে।

*২২শে মার্চ ১৯৫৩ রবিবারের যুগান্তরে হাসিরাশি দেবীর 'চিত্রলেখায় বাংলার মহিলা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

†Kalyani X'Ray Fund বিশেষ উল্লেখযোগ্য—Bengal Tuberculosis Association Silver Jubilee Souvenir (1929—53), P. 31.

কল্যাণী বৌঠান, এইবার সবাই জানুক তুমি কি ছিলে, কে ছিলে আমাদের। তোমার কথা জানাতে হবে ভাবতে পারিনি, ভাবতে হবে জানতে পেরেছিলুম—তাই তো ভাল করে জানাতে পারিনি—ভাবতে পারি।

শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মৌন রেখা

পঞ্চশর

ভজহরি বাবু মানুষ বেশ ভালো, শ্যামবর্ণ রোগা চেহারা মাথায় টাক। বহুকাল থেকেই এঁর সঙ্গে জানা-শোনা আছে। পেশা ওকালতী, তবে যোগ শাস্ত্র, ফলিত জ্যোতিষ প্রভৃতি গূঢ় তত্ত্বের চর্চ্চাও করেন। ধর্ম্মবুদ্ধিও খুব,—কিছুদিন আগেও দেখেছি ঘটা করে পূজো-আহ্নিক করতে, সম্প্রতি একটু ঢিলে পড়েছে। এখনও বিয়ে থা করেন নি। বার্দ্ধক্যের দ্বারদেশে এসে গৃহী হবার সাধ হয়েছে। শুধু বংশ-রক্ষার জন্যেই। তবে বয়েসটা একটু হয়েছে তো? তাই মুখ ফুটে ব'লতে পারেন না, লোকে কি ব'লবে! এতদিন ভজহরি বাবুর বিয়ে হয়নি কেন—এই প্রশ্নই মনে ওঠে। চেষ্টা অনেক হয়েছে—কিন্তু হয়ে ওঠেনি ; তবে ভবিষ্যতে আশা আছে!!

অনেকদিন পরে কিছু ল্যাংড়া আম নিয়ে ভজহরি বাবু তাঁর বহু পরিচিত এক বন্ধুর বাড়ীতে এলেন। কথায় কথায় বন্ধুপত্নী মায়া দেবীর কাছে তাঁর মনের কথা কিছুটা প্রকাশ করেন।

কপট গম্ভীরমুখে মায়া দেবী বল্লেন—"এর জন্য ভাবনা কি? এদেশে পাত্রীর অভাব হবে না। কত বুড়ো লোকেরা বিয়ে করছে, আজকাল আর বয়সের বালাই নেই। খোঁজ খবর নিয়ে একটি ভালো মেয়ের জোগাড় করছি দাঁড়াও। তবে কথা হচ্ছে—তুমি ঠিক কেমনটি চাও বলো তো? বিয়ের পদ্ধতি তো অনেক রকমের আছে।"

ভজহরি—তার মানে?

মায়া—মানে হচ্ছে, আমরা দেখে দিলে কি তোমার পছন্দ হবে, না নিজে দেখে শুনে 'কোর্টশিপ' করে বিয়ে করবে? আর একরকম হচ্ছে—দু'একদিন দেখে পরীক্ষা করে নেবে, মানে হচ্ছে সোজা কথায় যাকে বলে বাজিয়ে নেওয়া, সেই আর কি।

ভজহরি বাবু বল্লেন—এই এক ফ্যাসাদে ফেললেন, ওসব আমি জানি না,—আপনি পছন্দ করে দিলেই হবে। তবে 'কোর্টশিপে'র কথা যখন তুললেন তখন এই বিষয়ে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা আছে বলি শুনুন।—বয়স তখন কম ছিল, পাঁচজনের যেমন হ'য়ে থাকে তেমনি একটি মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল। তখন তো নিজে দেখে মেয়ে পছন্দ করবার নিয়ম ছিল না। মাকে জানালাম মেয়ে না দেখে বিয়ে করতে পারবো না। এই শুনে তো গুরুজনেরা মহাখাপ্পা হ'য়ে উঠলেন।

মায়া—আহা রে! তা'হলে তো আর 'কোর্টশিপ্' করা হোল না!—

ভজহরি—শুনুন আগে সবটা। আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। শুনলাম ছুটিতে ওরা চেঞ্জে যাচ্ছে কলকাতার কাছে-পিঠে জায়গাতে। আমিও চলে গেলাম সেখানে হাওয়া বদল করতে। কিছুদিনের মধ্যেই ওদের বাড়ীর সঙ্গে আলাপ হোল, মেয়েটিকেও দেখলাম। বেশ দশাসই চেহারা, চোখ ছুটো বড় আছে কিন্তু সেই ড্যাব্‌ড্যাবে চাহনিতে অন্তর ভেদ করে। বুঝলাম ইনি একজন জবরদস্ত মহিলা। আমি যেমন তাঁকে বাজিয়ে দেখতে চাই, তিনিও আমাকে। ছুচারদিন আসা যাওয়া চল্‌ল—একদিন নেমন্তন্ন পেলাম। খাবার পর বারান্দায় এসে বসলাম—আমি আর সেই মেয়ে।

উঃ সে কি প্রশ্ন! হাজার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলাম। তারপর উপদেশ। আমায় কি রকম কথাবার্তা ব'লতে হবে, কেমন সাজ-পোষাক হবে, কি ভাবে হাঁটাচলা করতে হবে ইত্যাদি।—তখন আমার সৌখিন গোঁফ ছিল,—তাও ফেলে দিতে হোল, কারণ তিনি ছুচক্ষে গোঁফ দেখতে পারেন না, শুনুন একবার কথাটা। সব কথা নীরবে তখন শুনে গেলাম, কিচ্ছু বললাম না। তার পরের প্রশ্ন হচ্ছে—আমার আয় কত, এবং ব্যাঙ্কে কত টাকা জমা আছে।—আচ্ছা বলুন তো, এসব কথা কার সহ্য হয়? মাথাটা গরম হয়ে উঠল, বললাম—এর

উত্তর আমি দিতে পারব না। তাছাড়া জেনেও আপনার লাভ নেই! তারপর 'গুডবাই' করে চলে এলাম।

মায়া—মেয়েটির বুদ্ধি কম, তা নইলে, তোমার মত পাত্রের মূল্য বুঝলো না।

ভজহরি বললেন—আর একটি ব্যাপার ঘটেছিল, সেটা অবশ্য তেমন কিছু নয়।

মায়া দেবী আগ্রহে বলে ওঠেন—ত্নম্বর ঘটনাটা কি বল না ঠাকুরপো?

ভজহরি—আমার ভাগ্যই খারাপ! কারো মন পেলাম না।

মায়া দেবী—মন পেলে না? তাহলে তুমি এক কাজ কর। খান কতক আধুনিক নভেল পড়ো—বাংলা ইংরেজি অনেক তো বেরিয়েছে। আর ছুটির দিনে সিনেমাতে যাও। দেখ না ট্রাই করে একবার।

ভজহরি—নাঃ! সময় কোথায় আমার?

মায়া—তবে আর শিখবে কোথা থেকে?

বাইরে বন্ধু মহিম বাবুর গাড়ীর শব্দ শোনা গেল।

মায়া দেবী বল্লেন—তুমি একটু বোসো, আমি আসছি; চলে যেও না, চা খেয়ে যাবে।

ভজহরি বল্লেন—আমাকে আবার হুগ্‌লী যেতে হবে সাতটার ট্রেণে, বেশী দেরী হবে না তো?

মায়া—না না; দেরী হবে না, এখুনি আসছি।

* * * *

সেদিন বাড়িতে এসে ভজহরি বাবু নিজের মনেই বলে যেতে লাগলেন,—দূর ছাই, আর একা একা ভালো লাগে না। বৌদি তো আশ্বাস দিয়েছেন তিনি শীগ্‌গির পাত্রী ঠিক করবেন। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি সুন্দরী তরুণীর মুখ। ক্রমশঃই ঝাপসা হয়ে যেতে লাগ্‌লো। চোখ ত্নটো আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। ঘুমের মধ্যেই বোধ করি 'পঞ্চদশী'র স্বপ্ন দেখছিলেন আমাদের ভজহরি বাবু।

কিছুদিনের মধ্যেই ভজহরি বাবুর ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল। ক্ষুধা নেই, ঘুম নেই, মনেও শান্তি নেই ; ঐ একই চিন্তা তাঁকে দহন করছে। চিঠির পর চিঠি লিখে বন্ধুপত্নী মায়া দেবীকে অতিষ্ঠ করে তুললেন। ওধারে বন্ধুবর মহিম বাবুর উপদেশে তাঁর পত্নী মায়া দেবীর কাছ থেকে মনের এই অবস্থার মধ্যে ভজহরি বাবু একটা চিঠি পেলেন—"ঠাকুর পো,—চিঠি পেলেই দেখা কোরো, অনেক কথা আছে।"

সাধনার ফলে অসম্ভবও সম্ভব হয়! বৌদির সঙ্গে তাহলে কালই দেখা করা দরকার।

পরের দিন অফিস ফেরত খুসী মনে তিনি বৌদির বাড়ীর দিকে রওনা হলেন।

মায়া দেবী বললেন—তোমার কপাল ভালো ঠাকুরপো, এমন মেয়ে জোগাড় করেছি—লাখে একটি মেলে। "লরেটো"য় পড়ে, গান করে চমৎকার! সুন্দর চেহারা। তাছাড়া ওর মামা প্রকাণ্ড বড় লোক। তাঁর যা কিছু সব ঐ মেয়েকেই দেবেন। ওকে বাগাতে পারলে তোমার আর ভাবনা নেই।

ভজহরি বাবু হাস্য মুখে বললেন—মেয়েটির নাম কি ?

মায়া—ওর নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো—'ফ্যেমাস্' মেয়ে "বুঁচি রায়"।

ভজহরি—কি নাম বল্লেন ? বুঁচি ? উঃ! কি সাঙ্ঘাতিক নাম! না, না, না বৌদি, খেঁদি, বুঁচি, পুটি ওসব নাম চলবে না।

মায়া হাস্যমুখে বললে—আরে! নামের জন্যে কি এসে যায় ? পরে নাম বদলে যা হয় কিছু রাখা যাবে। এই সামনের রবিবারেই মেয়ে দেখবো, এখানেই সব বন্দোবস্ত করবো। তাহলে সব ব্যবস্থা করি কি বল ?

ভজহরি—সে সব আমি জানি না, আমাকে কি করতে হবে তাই বলুন ? কিন্তু ঐ বিদ্‌ঘুটে নামটা—

মায়া দেবী বল্লেন—ওসব ছোটোখাটো ব্যাপার, তার জন্যে অতো

মাথা ঘামিও না। আর ভাল কথা—সেদিন বেশ একটু সাজ সজ্জা করে এসো।

ভজহরি—এসব ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি ?

মায়া—না, ঠাট্টা নয় ঠাকুরপো, সত্যি বলছি, বয়সটা একটু বেড়ে গেছে তো ; একটু সাজগোজ না হলে মানাবে কেন ?

ভজহরি—হ্যাঁ, আমার বয়সটার সম্বন্ধে বলছিলাম,—চল্লিশের ওপর বলবেন না। বিয়ে থা'র ব্যাপারে একটু আধটু অমন কমিয়ে বলতে হয়।

মায়া দেবীর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি দেখা দিল।

বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা, রবিবার সন্ধ্যা ; ঠিক মনে থাকে যেন।

হাস্যমুখে ভজহরি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে হবে, এখন Good bye

* * * *

নির্দিষ্ট দিন এসে গেল। সাড়ে পাঁচটায় ভজহরি বাবু ট্যাক্সি থেকে নামলেন, পরণে সূক্ষ্ম ধুতী, রেশমী পাঞ্জাবী, পায়ে কালো স্যোয়েডের জুতো। মাথার মধ্যিখানে যে কয়গাছা চুল আছে, তাই দিয়ে সিঁথি কাটবার বৃথা চেষ্টা করেছেন।

ঘরে ঢুকেই বল্লেন,—কৈ আপনার ই'য়ে কোথায় ?

মায়া—একটু ধৈর্য্য ধরো···ওরা মানে সুকুমার আর ওর এক বন্ধু সিনেমায় গেছে, আসতে একটু দেরি হবে। আর একটু পরেই এসে যাবে। বাঃ বেশ মানিয়েছে তো ?

ভজহরি গম্ভীর মুখে বললে—সিনেমায় গেছে ? সঙ্গে পুরুষ বন্ধু ?

মায়া—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই তো আজ দেখাচ্ছে,—বন্ধু, তা নিয়ে গেলেই বা ক্ষতি কি হয়েছে ?

ভজহরি—না, না, ওগুলো আমি মোটেই পছন্দ করি না তা বুঝিয়ে দেবেন। বন্ধু ! হুঃ !

কপট গম্ভীর মুখে মায়া দেবী বল্লেন—এখনও তো বিয়ে হয়নি, বৃথা রাগ করছো কেন ? ওগুলো কিন্তু তোমায় 'ওভারলুক' করে

যেতে হবে। ওসব 'মাইণ্ড' করলে চলবে না। আমি না হয় একবার টেলিফোন করে দেখছি, তুমি একটু বসো।

ভজহরি বাবু একা বসে না-দেখা তরুণীর ধ্যান করেন—কিছুক্ষণ কেটে গেল। তারপর আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল—ভজহরি বাবু আর কত অপেক্ষা করবেন? ঘড়ির পানে বারে বারেই তাকান।

বাইরে চুড়ীর শব্দ হোলো—ভজহরি বাবু নিজেকে একটু গুছিয়ে বসলেন। পাশের ঘরের নীলপর্দ্দা ঠেলে ঘরে এসে ঢুকলেন মায়া দেবী আর সবুজ জর্জ্জেটের শাড়ী পরা একটি মেয়ে, তাছাড়া আরও অনেকে। জোর পাওয়ারের বাতিটা জ্বালিয়ে দেওয়া হোলো। অন্যধারে ঠিক সামনের কৌচে বসে আছেন ভজহরি বাবু। মেয়েটির পানে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, চোখ ফেরাতে পারেন না।—মেয়েটির সমস্ত দেহভার উজ্জ্বল পরিপূর্ণতায় টলমল। ঠোঁটে অদ্ভুত চাপা হাসি। অনেকক্ষণ ধরে দেখেই চলেছেন ভজহরি বাবু। কি ফর্সা রং, টুকটুকে ঠোঁট, কাঁধ পর্য্যন্ত কোঁকড়ান চুল। লাল নখ সবই সুন্দর। আহা! এর স্বামী যদি হতে পারি! চাপা গলায় মায়াকে বল্লেন—একটা গান টান করতে বলুন—এমনিই চুপ চাপ বসে আছি সকলে। বহু অনুনয় বিনয়ের পর "বুঁচি রায়" গান ধরলে ঃ—

"তুমি যে গিয়াছ,
বকুল বিছানো পথে,
নিয়েছিলে হায়
একটি কুসুম, আমারি কবরী হতে।"

ভজহরি বাবুর হিয়াতে তখন হিল্লোল উঠেছে, চিত্তে চাঞ্চল্য। সাদা কথায় যাকে বলে আহ্লাদে আটখানা। মায়া দেবী বল্লেন "কি ঠাকুরপো, কেমন লাগছে? চলো একটু চা-টা খেয়ে আসবে। শুধু রূপ-সুধা পান করলেই তো পেট ভরবে না।"

সকলে উঠে দাঁড়ালেন। ভজহরি বাবু বল্লেন মিস্ রায়ের পানে তাকিয়ে—"গানটি আপনার চমৎকার হয়েছে, খাসা।" মেয়েটি

মুখখানি নামিয়ে নিলে, কথা বল্লে না। তারপর অতি ধীরেধীরে মায়া দেবীকে ভজুবাবু জানালেন—বৌদি, ওর নামটা পালটে দিন না।

মায়া—বেশ তো। তোমার নামের সঙ্গে মিল করে একটা নাম বিয়ের পরে রাখলেই হবে, কি বল ঠাকুরপো? উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে লজ্জায় ভজুবাবু নুয়ে পড়লেন।

সকলে খাবার ঘরের উদ্দেশে এগিয়ে গেলেন। টেবিলে নানা রকমের খাবার সাজানো। একে একে সকলে বসে গেলেন। সেদিনকার প্রধান আকর্ষণ "বুঁচি রায়" এবং প্রধান অতিথি "ভজহরি বাবু"। বাড়ীর কর্ত্তার কন্‌সাল্‌টেশান্‌ আছে, ফিরতে দেরী হবে একটু, পরে তিনি এসে 'জয়েন' করবেন বলেছেন। ভজহরি বাবু মিস্‌ বুঁচি রায়কে লক্ষ্য করে বল্লেন,—কৈ কিছুই তো খাচ্ছেন না। মায়া দেবী বল্লেন—মিষ্টি খেতে বুঁচি খুব ভালবাসেন, দেখে খাওয়ান।

বুঁচি তখন নিবিষ্ট মনে খেয়ে যাচ্ছিলেন, মুখ না তুলেই বল্লেন—"না না দরকার নেই।" তবুও কে শোনে? ভজুবাবু একটা রাজভোগ তুলে নিয়ে পাতে দিতে গেলেন। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়ালো অন্যরূপ। পাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বুঁচির হাতের উল্টো পিঠে রস সমেত রাজভোগটি থপ্‌ করে প'ড়ে গেল। ব্যথিত কণ্ঠে ভজুবাবু বিনয় সহযোগে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, তারপর আপনার পকেট থেকে সদ্যক্রীত "প্রিয়া" সেণ্ট মাখানো রুমালটি বার করে বল্লেন, "নিন, হাতটা মুছে ফেলুন। ছিঃ ছিঃ, কি করলুম দেখুন তো।"

ইতিমধ্যে বন্ধুবর মহিম বাবু এসে দরজার সামনে হাসিমুখে বল্লেন—"কি হলো ভজহরি, আলাপ সালাপ হোলো? বেশ জ'মেছে দেখছি। আর এদের কাছে থেকো না, তোমাকে ক্ষেপিয়ে মারবে—চলো পাশের ঘরে যাই। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে চলো।" মায়া দেবী বল্লেন,—চুপ করো,—ভারি অসভ্য তোমরা। আচ্ছা ভজহরি বাবু, মেয়েকে পছন্দ হয়েছে তো? আমাকে বলুন, ওদের খবর দেবো তো?

ভজহরি একমুখ হেসে বল্লেন—"অপছন্দ হবার মত তো কিছু নেই, তবে একটা কথা আছে—(আস্তে আস্তে)—মেয়েটির হাতটি লক্ষ্য করছিলাম, কেমন যেন পুরুষালি ছাঁদের, মানে একটু শক্ত শক্ত হাত।"

মায়া ব্যস্ত হয়ে বললেন—আরে, ও যে ঘোড়ায় চড়ে, লাঠি খেলে, একসারসাইস্ করে, এসব বেশী করলে কমনীয়তা অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। তার জন্যে কিছু নয়, তোমার কাছে থাকলেই স্বমূর্ত্তি ফিরে পাবে।

তারপর মায়া মিস্ বুঁচি রায়ের হাত ধরে টেনে আনলেন, বল্লেন—ঠাকুরপো, একে জিজ্ঞেস করো পছন্দ হয়েছে কিনা, দেখ ভাল করে তাকিয়ে, মুখখানা তুলে ধরেন মায়া দেবী।

মহিম বাবু বল্লেন—ভাল করে চেয়ে দেখচ না, চেনা মনে হয় কি ?

ভজহরিবাবু চক্ষু দুটি বিস্ফারিত করে বুঁচি রায়ের মুখের পানে সাগ্রহে তাকান।

অ্যাঁ, শচী, তুমি। আচ্ছা ফাজিল ছেলে তো! তোমার মামাকে পড়িয়েছি আমি। বাবার বয়সী লোকের সঙ্গে ঠাট্টা, লজ্জা করে না একটু !! কালই তোমার বাবাকে রিপোর্ট করবো।

যার উদ্দেশে এতগুলি কথা বলে গেলেন ভজহরি বাবু সে যে কোথায় উধাও হয়ে গেল আর দেখা মিলল না। তারপর যে কি ঘটেছিল তা অনুমানেই বেশ বুঝতে পারছেন। সেবারের মত ভজহরি বাবুর কিনারা আর হল না বন্ধুপত্নীর ঠাট্টায়।

আপনারাও একটু চেষ্টা করে দেখুন না যদি ভজহরি বাবুর কিনারা করতে পারেন !!!

একটি দিন

অঞ্জুকে অনেকদিন পরে হঠাৎ দেখে খুব ভালো লাগল। কতদিন —কতদিন যে তাকে দেখিনি! এক সঙ্গে স্কুলে পড়তাম, হেসে খেলে দিন কাটিয়েছি, স্বাধীনভাবে। তারপর অঞ্জুর বিয়ে হয়ে গেল। মস্ত বড়লোকের বাড়িতে। আর দেখা হয়নি তার সঙ্গে। বনের পাখি বন্দী হয়েছে সোনার খাঁচায়।

আজ সত্যিই খুব আনন্দ হলো। সেও খুব খুশী, এগিয়ে এল আমার কাছে। দুজনে বসে কত গল্প করলাম। কিন্তু তার মধ্যে আগেকার সেই আনন্দময়ী মূর্তিটি আর আজ খুঁজে পেলাম না। রূপ আছে, অর্থ আছে—মস্ত ধনীঘরের বউ সে, কিন্তু বড় ম্লান দেখাচ্ছে তাকে। বৃহৎ পরিবারের মধ্যে আছে। অঞ্জুর মুখে তার শ্বশুরবাড়ির কথা শুনছিলাম। রান্না-খাওয়ার যা গল্প শুনলাম সে এক যজ্ঞি বাড়ির ব্যাপার। অদ্ভুত লাগল শুনে। তাদের দিনের বেলার খাওয়া নাকি শেষ হয় বেলা চারটেয়, রাত্রের খাওয়া শেষ হতে একটা বাজে। বললাম, এত রাত্রি পর্যন্ত ঠাকুর চাকর কাজ করে, চলে যায় না? সে বললে,—ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে। সন্ধ্যের দিকে বোধ হয় ঘুমিয়ে নেয়। এধারে সকালে চা খেতেও দশটা বাজে, দশটার আগে আমাদের ভোর হয় না। নানান রকমের গল্প শুনছিলাম। শুনতে কৌতূহল জাগে।

সে বললে, সকলেই তাকে খুব ভালবাসেন। জেঠিমা, খুড়িমারা নিজে হাতে তাকে সাজিয়ে দেন। নিজের হাতে ভাত মেখে খাওয়ান।

বললাম—তোর বরটি কেমন রে?

সে হেসে বললে—বেশ ভালো। জমিদার বাড়ির ছেলে যেমন হয়ে থাকে। তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

বললাম—সে কি কথা! বরের সঙ্গে দেখা হয় না?

—বাঃ রে! গুরুজনদের সামনে দিনরাত আমাকে নিয়ে বসে

থাকবে ?—সে বড়. লজ্জার কথা ! ও আসে—রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে।

অনেক অদ্ভুত গল্প শুনলাম। আসবার সময় বললাম, একদিন এসো আমাদের বাড়িতে।

অঞ্জু বল্লে—কি ক'রে যাবো ভাই, গাড়ি তো পাবো না।

বল্লাম—সে কি কথা ! তোমাদের আবার গাড়ির অভাব !

অঞ্জু বললে—না, না, তা নয়, তবে শ্বশুর আছেন, ভাশুর আছেন। তাঁদের কাজকর্ম আছে। সমস্ত দিনই গাড়ি বাইরে থাকে। আমরা পাই না।

কি আর বলব, চুপ ক'রে রইলাম। বললাম, চিঠি দিও মাঝে মাঝে।

* * *

কিছুদিন পরে দাদার বিয়ের নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছি। মনে হলো অঞ্জুর কথা। মা বলেছেন, আমার বন্ধুদের বল্‌তে। গেলাম তাদের বাড়িতে। গাড়ি এসে দাঁড়াল প্রকাণ্ড একটা বাড়ির সামনে। ঠিকানাটা মিলিয়ে দেখলাম ঠিক আছে। "শুভ বিবাহ" লেখা হল্‌দে চিঠিটা নিয়ে নামলাম। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো। বোধ হয় বাড়ির কোনো কর্মচারী। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এসে অন্দর মহলে যাবার পথ দেখিয়ে দিলেন, বললেন—সোজা চলে যান এই রাস্তা ধরে, তারপর একটা সিঁড়ি পাবেন, উপরে উঠে গেলে দেখা হবে মেয়েদের সঙ্গে। আমার সঙ্গে তিনি উঠতে পারছেন না, কারণ এ-সময়ে অন্দর মহলে পুরুষদের যাবার নিয়ম নেই। ভদ্রলোকের নির্দেশমতো সোজা পথ ধরে চললাম। সরু একটা ঝিলিমিলি দেওয়া লম্বা পথ, ভীষণ অন্ধকার।

পায়ে হোঁচট্ লাগল—হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে সেই অন্ধকার পথ ধরে ধরে এগিয়ে গেলাম। সামনেই সিঁড়ি, কম পাওয়ারের একটা আলো জ্বলছে। সিঁড়িও যেমন সরু, তেমনি উঁচু। এমন বাড়ি কলকাতায়

আছে, জানতাম না। যাই হোক, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম। সামনে চক্‌মেলানো বারান্দায় পৌঁছে এধার ওধার তাকাচ্ছি, এবাড়ির কাউকে তো চিনি না, শুধু অঞ্জুকেই জানি।

দরজা দিয়ে অঞ্জু উঁকি মারলে, মাথায় ঘোমটা তোলা। দেখলাম তার স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। হঠাৎ আমাকে দেখে এগিয়ে এল খুশী হয়ে। ডেকে নিয়ে গেল একটা ঘরে—খাটের ওপর আমায় বসালে।

বললাম—দাদার বিয়ে। নেমন্তন্ন করতে এলাম।

সে খুশী হয়ে বললে—কতদিন যে বাইরে বেরোইনি। মুখখানা ম্লান হয়ে গেল।

বললাম—কেন ভাই, বাইরে কোথাও যাও না বুঝি? আমাদের বাড়িতে যেতেই হবে, ছাড়ব না।

সে বললে—যাবো, যদি অনুমতি পাই। তুমি বোসো—আমি শাশুড়ীকে ডেকে আনি।

তারপর চুপি চুপি বললে—শাশুড়ী এলে তাঁকে প্রণাম ক'রো। অনেক ক'রে যেতে বলবে, আর আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে বলবে।—তিনি তো কোথাও যান না, আমাকেই যেতে হবে। নতুন জায়গায় আমাকে একা যেতে দেন না, কিন্তু তোমাদের বাড়িতে যেতে দেবেন। আমি অনেক গল্প করেছি তোমাদের। তাছাড়া, তোমাদের বাড়ির সকলকে উনি জানেন। তাই মনে হয়, আপত্তি হবে না। তারপর বললে—ছ' মাস কোথাও যাইনি, প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। স্কুলে যেতাম, কেমন স্বাধীনভাবে দিন কাটিয়েছি পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে হেসে খেলে। এখন আর সেদিন নেই, এখন যে বড়লোকের বাড়ির বৌ হয়েছি।

বললাম—তা তো দেখতেই পাচ্ছি ভাই।

বড় বড় আয়না, পাথরের টেবিল, খাট, আলমারী, কৌচ কেদারা, নানারকমের পাথরের মূর্তি প্রভৃতি আসবাবপত্রে বাড়ি বোঝাই।

দেখে মনে হয়, এরা হঠাৎ-বড়লোক নয়, বনেদী ঘর। আমাকে বসিয়ে রেখে সে গেল তার শাশুড়ীকে ডাকতে। যাবার সময় ব'লে গেল—ভাল করে আমার যাবার কথা বলবে, তোমার বলার উপর আমার যাওয়া নির্ভর করছে। তার এই ব্যাকুলতায় যেমনি আশ্চর্য্য হলাম, দুঃখও পেলাম তেমনি।

শাশুড়ী এলেন। মোটাসোটা বর্ষীয়সী মহিলা। এক-গা সোনার গহনা, চওড়া-পাড় শাড়ি, কপালে মস্ত একটা সিঁদুরের টিপ্। প্রণাম ক'রে যথাসম্ভব বিনীতভাবে নিবেদন করলাম নিমন্ত্রণের কথা। গম্ভীর-ভাবে বললেন—আমি তো কোথাও যাই না, বৌমাকে পাঠিয়ে দেব কর্তা যদি বলেন। তবে তাঁর বোধ হয় অমত হবে না। তারপর কিছুক্ষণ ধরে আমাকে বেশ ভালভাবে নিরীক্ষণ করলেন। নানারকমের প্রশ্ন ক'রে আমাদের পরিচয় জানলেন। তার মধ্যে আবার আমাদের সঙ্গে কোথা দিয়ে কার সূত্র ধরে আত্মীয়তা বার হয়ে গেল। অবশ্য আমি বিশেষ কিছু বুঝলাম না। তারপর একটু হেসে বললেন—না যাবার কি আছে বলো, নিশ্চয় যাবে। ও বৌমা, তোমার বন্ধুকে জলখাবার দাও। চকিতে অঞ্জুর মুখের দিকে তাকালাম, দেখলাম ঘোমটার ফাঁকে তার সকৃতজ্ঞ চাহনিটুকু। বিদায় নিয়ে চলে এলাম। অঞ্জু সঙ্গে সঙ্গে এসে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াল। বললে—আসি ভাই, এই গণ্ডীর বাইরে যাবার নিয়ম নেই। সোজা চলে যাও বাইরে, পৌঁছে যাবে। খুশী মনে আমার হাত দুটো চেপে ধরলে। সোজা চলে এলাম। অঞ্জুর সেই সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিটুকু মনে জেগে রইল।

* * *

দাদার বৌভাতের দিন। মিষ্টির থালা হাতে নিয়ে পরিবেশন করছি, হঠাৎ কে বলে উঠল—চিনতে পারছ আমাকে? তাকালাম, দেখি অঞ্জু এসেছে। পরনে জমকালো টিশু শাড়ি, সর্বাঙ্গে ঝলমল করছে হীরেমুক্তোর গয়না। কিন্তু সেই গয়নার প্রাচুর্যে অঞ্জু ঢাকা পড়ে গেছে। তাকে দেখে সত্যিই খুশী হলাম—বললাম—যাক্, আসতে

পারলে তা হলে। খুব ভাল লাগছে। অঞ্জুও একটু হাসল, বললে—হ্যাঁ, এক ঘণ্টার ছুটি আছে আমার।

এই এক ঘণ্টার মধ্যে সে ফিরে পেয়েছিল তার আগেকার জীবন। কাজের ভিড়ে বেশীক্ষণ তার কাছে থাকতে পারিনি। যাবার সময় আমার কাছে এসে বললে—যাচ্ছি ভাই, খুব আনন্দে কাটিয়ে গেলাম। আবার কবে যে দেখা হবে জানি না।

বললাম—এর মধ্যেই চলে যাচ্ছ?

সে বললে—হ্যাঁ যাচ্ছি, সেই দুর্গের মধ্যে। মলিন মুখে করুণ হাসি হাসলে সে।

মোটর পর্যন্ত তাকে তুলে দিতে এলাম। তার স্বামীর সঙ্গে আলাপ হলো। গোলগাল ফর্সা চেহারা, ধুতি আর চাদরের শেষ প্রান্তটুকু মাটিতে লুটোচ্ছে। হাতে গোটাকতক হীরের আংটি। বোতাম, রিস্টওয়াচ, দামী সেন্ট, কোনো কিছুরই ত্রুটি নেই। দুটি হাত জড়ো করে নমস্কার করলেন, আংটির হীরেগুলো জ্বল-জ্বল ক'রে উঠল। প্রকাণ্ড গাড়িখানাতে উঠে বসলেন। যাবার সময় মুখ বাড়িয়ে যথেষ্ট বিনয় ক'রে বললেন—একদিন পায়ের ধূলো দেবেন আমাদের বাড়িতে।

হেসে সম্মতি জানালাম।

অঞ্জু বললে—তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে জানি না, কিন্তু আজকের এই দিনটি মনে থাকবে। আচ্ছা, আসি ভাই।

মার ডাক শুনে তাড়াতাড়ি ভেতরে গেলাম। মা বললেন, তোর বন্ধু চলে গেল বুঝি? মস্ত বড়লোক ওরা, কি হীরেমুক্তো পরেছে, আজকালকার দিনে এমন দেখা যায় না। কপাল করেছে বটে।

মার কথার উত্তরে শুধু বললাম—হুঁঃ।

গৌরী-দান

দশ বছরের ছোট্ট রাণুর বিয়ে—

সানাইয়ের করুণ সুর বিয়ে-বাড়ীর আনন্দের মধ্যেও আসন্ন বিরহের বেদনা জাগাচ্ছে। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে বিয়ে-বাড়ীর উৎসবের আয়োজন।

রাণুর মার মন খারাপ, তার বড় আদরের রাণু চলে যাবে। গোপনে চোখের জল মোছেন বারে বারে। ভাবেন, কেমন করে থাকবেন রাণুকে ছেড়ে! এখনও মার হাতে নইলে তার খাওয়া হয় না। স্নানের সময়ও একটি পর্ব্ব। তার দুষ্টুমি শ্বশুর-বাড়ীতে কে সহ্য করবে?

হ্যাঁ, এই ছোট্ট রাণুর বিয়ে! খুব আশ্চর্য লাগছে তো? কিন্তু এ তো আজকের কথা নয়। কবেকার কথা। সে যুগে গৌরীদানের প্রথাই প্রচলিত ছিলো সমাজে। মার বুকে মুখ রেখে কেঁদে চলে যেতো ছোট্ট মেয়েরা। কত না কষ্ট পেতো ভাই-বোনেদের ছেড়ে যেতে। অন্য একটি সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে, কোথা থেকে একটি ছোট্ট জীবন এসে জুড়ে বসতো—ছোটো একটি ভীরু পাখীর মতো। মনে ভয় হোতো তাদের,—প্রত্যেক মুহূর্তে ভয়—কারণে-অকারণে বুক কেঁপে উঠতো ভয়ে। তবুও কত সুখ ছিলো তারি মধ্যে, নিজের অজান্তে নিজেই শান্ত হয়ে যেতো তারা। শ্বশুর-বাড়ী হয়ে যেতো একান্ত আপনার। একটি মুখের প্রতি তাকিয়ে তাদের মন প্লাবিত হয়ে যেতো ভরা জোয়ারের মতো।

তাই রাণুর বিয়ের জন্য আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। বড় ঘর থেকে সম্বন্ধ এসেছে, ভাল ঘর-বর পেলে বিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মার দিক থেকে ইচ্ছাটা প্রবল না হলেও বাবার যুক্তি অকাট্য। তাঁর ইচ্ছাই পূরণ করেছেন।

সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে সানাই বাজছে। সেই মিলনের বাঁশীতেই

যেন বিচ্ছেদের সুর মিলিয়ে আছে। এই বিয়ে-বাড়ীর জমকালো উৎসব যাকে নিয়ে তার কোন দিকে খেয়াল নেই—বেশ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে আছে মার বিছানায়। কাজের ফাঁকে মা এসে দেখে যান রাণুকে—তাঁর কত সাধের রাণু বাড়ী অন্ধকার করে চলে যাবে। কেমন করে থাকবেন তিনি রাণুকে ছেড়ে। মা এসে ঘরে ঢোকেন। রাণু শুয়ে আছে এক রাশ যুঁই ফুলের মতো—বিছানার ওপরে দু'হাতে মুখ ঢেকে সে ঘুমিয়ে আছে। ভোরের আলোর প্রথম রশ্মিটুকু ছড়িয়ে পড়েছে তার সারা গায়ে, কালো রেশমের মতো থোকা-থোকা চুলগুলো কপালের ওপরে ছড়ানো। মেয়ের পানে তাকিয়ে মার চোখে জল ভরে আসে, তার মাথায় হাত রেখে তিনি ডাকেন, রাণু, ওঠো মা! মুখ-হাত ধোও, বেলা যে অনেক হয়েছে। ঘুমের ঘোরেই রাণু বলে—না-না—এখন নয়, আরও একটু পরে। মাথার বালিশের মধ্যে মুখ ঢেকে শুয়ে থাকে রাণু—ঘুম আর ভাঙ্গে না। মার দাঁড়াবার সময় নেই, আত্মীয়-কুটুম্বে বাড়ী ভর্ত্তি, কতটুকু সময় আছে তাঁর মেয়ের কাছে বসবার?

কত কাজ যে আছে—মহাল থেকে বড় বড় রুই-কাতলা এনে ফেলেছে উঠানে—মাছ কোটবার জন্য জেলেরা তাগাদা দিচ্ছে, সে সব বন্দোবস্ত করতে হবে। এধারে রাশীকৃত তরকারী পড়ে আছে বারান্দায়। এর মধ্যেই কয়েক জন আত্মীয়া প্রতিবেশী মিলে তরকারী কোটা শুরু করেছে। গোলাপি রং-ছোপানো শাড়ী, সোনার তাগা হাতে বুড়ী-ঝি, কাটা তরকারীগুলি পৃথক করে সাজাচ্ছে। ছোট মেয়ে-বৌয়েরা পান তৈয়ারী প্রভৃতি খুঁটিনাটি কাজগুলি করছে গিন্নিদের তদারকে। কাজের মধ্যে চলছে হাসি-গল্প—কেমন করে বরকে ঠকানো হবে তার পরিকল্পনাও চলেছে। রাণুর মা এসে দাঁড়ালেন সেখানে। কাকিমা বললেন—ও দিদি! এবার রাণুকে উঠিয়ে দিন, নান্দিমুখ করতে অনেক সময় লাগবে, কত বেলা হবে ঠিক নেই। একটু কিছু মুখে দিক—বাচ্চা মেয়ে তো,

উপোস করতে পারবে কেন? কাকিমা দুঃখ বোধ করেন রাণুর মার জন্য।

বৌদি বলেন—আমি যাচ্ছি কাকিমা, রাণুকে ডেকে আনি।

বৌদি এসে রাণুর চিবুক স্পর্শ করে ডাকেন—ওগো রাণু, ওঠো। আজ যে তোমার বিয়ে। মেয়ের ঘুম ভাঙ্গে না। সেই অচিন দেশের রাজকুমার এসে ঘুম না ভাঙ্গালে বুঝি রাণুর ঘুম ভাঙ্গবে না! বৌদির মুখের পানে তাকায় রাণু তার বড় বড় চোখ দুটো মেলে। বলে, আমি কক্ষনো বিয়ে করবো না। তোমরা ভারী দুষ্টু—খালি বিয়ের কথা বলো, যাও—আমি উঠবো না।

বৌদি বলেন—বেশ মেয়ে যা হোক, আমরা খেটে-খেটে অস্থির হয়ে গেলাম আর উনি বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবেন, সে হবে না।

রাণুর ছোট বোন বেণু এসে ঘরে ঢোকে।—দিদি, একটা মজার জিনিস এনেছি, দেখবে এসো!

—কৈ, দেখি? বলে রাণু এগিয়ে আসে তার ছোট বোনটির কাছে। সে ফ্রকের তলা থেকে ছোট্ট একটা রঙিন বালব বের করে দেখালে।

রাণু বলে, কোথায় পেলি রে এটা? ঠিক গোলাপ ফুলের মত দেখতে।

বেণু—তোমার বরের জন্যে যে সিংহাসন সাজানো হচ্ছে তাইতে এ-রকম অনেক লাগাচ্ছে। একটা এনেছি তোমার জন্য।

রাণু—চল, আর একটা নিয়ে আসি। দু'জনেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বৌদি আপন মনেই হাসেন—কবির এই কথাটি তাঁর মনে হয়:

"ওগো বর ওগো বঁধু
এই যে নবীনা বুদ্ধিবিহীনা,
এ তব বালিকা বধূ"

* * *

উৎসবের অভিনব আয়োজন চলছে। বরের বসবার জায়গাটি বিশেষ করে নজর দেওয়া হচ্ছে। কি ভাবে কোন রং মেলালে সুন্দর লাগবে, দেওয়ালের গায়ে কি নক্‌সা লাগাতে হবে, তারই জল্পনা-কল্পনা চলছে। ছোট ছেলের দল ঘিরে বসেছে—তাদের কৌতূহলী দৃষ্টি সব কিছুই লক্ষ্য করছিলো, না জানি কি হবে আজ সন্ধ্যায়। ময়ূর-সিংহাসন তৈরী হচ্ছে, দামী কাপড়ে মুড়ে শিল্প-চাতুর্যের আস্তরণ দিয়ে ঢেকে দিয়েছে, দু'ধারে দু'টো ময়ূরের মুখ। ছোট ছোট আলোগুলি আস্তরণের ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছিলো। ছেলের দল চেয়ে থাকে সকৌতুকে, চারিধারে উঁকি-ঝুঁকি মারে। তাদের ছোট মনের উপর দিয়ে অনেক কিছুই ভেসে চলে। এই রহস্যজনক আসনটির চারিধারে ভীড় করে থাকে তারা। রং মিলনের সামঞ্জস্য রেখে সাজাবার কায়দায় সাধারণ জিনিসগুলিও মনকে মুগ্ধ করছে। বড় আদরের রাণু, তার আজ বিয়ে, তাই তো এত ঘটা! বয়ঃজ্যেষ্ঠেরা হাঁক-ডাক ক'রে কাজের আবহাওয়া জাগিয়ে রাখছেন। ভিয়েনকরেরা এসে নানা রকমের মিষ্টি তৈরি করছে। রানাঘাটের পান্তুয়া, কৃষ্ণনগরের সরভাজা প্রভৃতি রাশি রাশি মিষ্টি এসেছে নানা দেশ থেকে।

কত সম্ভ্রান্ত লোক আসবেন নিমন্ত্রিত হয়ে—তাঁদের উপযুক্ত উদ্যোগ চলেছে। রাশি রাশি বেল-জুঁইয়ের মালা—তবক-দেওয়া পান রূপোর থালায় রাখা আছে। গান-বাজনার আয়োজন হয়েছে—হাঁক-ডাকেই উৎসব সরগরম হতে লাগলো!

এধারেও রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন চলছে। প্রসিদ্ধ রান্না জানা বামুন এসেছে—সকল রকম রান্নায় ওস্তাদ তারা—আহারবিলাসীদের রসনাকে পরিতৃপ্ত করবার জন্য তারা রান্না সুরু করেছে পূর্ণ উদ্যমে। সুগন্ধে চারি দিক সুরভিত হয়ে উঠেছে। সকালের অনুষ্ঠান শেষ হতে অনেকটা বেলা হয়ে গেলো। দিনের আলো ম্লান হয়ে এলো ক্রমশঃ—গোধূলির রাঙা আবির লাগলো প্রকৃতির গায়ে। কনে-স্নানের আয়োজন সুরু হোলো, রাণুকে ডাক পড়লো, কিন্তু কোথায়

গেলো মেয়ে ? শেষে রাণুকে পাওয়া গেলো তার খেলাঘরের সামনে। দুই বোনে বসে আছে সজল চক্ষে।

শিশু-চিত্তের লোভনীয় জিনিস ছিলো এই পুতুলগুলি। কত যত্নে সেগুলি সঞ্চিত হোতো, মার খাটের তলায় সারা দিন ধরে তাদের নিয়ে নাড়াচাড়া করাই ছিলো তার কাজ। সেই প্রিয় পুতুলগুলির জন্যই আজ রাণুর মন খারাপ।

বেণুকে তার সব পুতুলগুলি দিয়ে দিচ্ছে—তবুও ঘাগরাপরা "ডলি"টার পানে তাকিয়ে মনটা খারাপ হয়ে যায়। তবে বেণু বলছে—দিদি এলে তারা দু'জনেই খেলবে—তাছাড়া খুব যত্নে রাখবে সে। এর আগে বেণুর সাহসই হোত না পুতুলে হাত দেবার, তাই দূরে থেকেই দেখতো, কিন্তু আজ !

দিদি তো তাকেই দিয়ে যাচ্ছে—সে তো শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে, আর তো খেলবে না। মা এসে কখন দাঁড়িয়েছে তাদের কাছে তারা জানতেও পারেনি। চাপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মনে আসে তার ভুলে-যাওয়া দিনের ব্যথা, সে কি আজকের কথা !

নতুন বৌ হয়ে এসেছিলেন বিদেশ থেকে—চেনা-পরিচয় ছিলো না কারো সঙ্গে, ননদ-জাদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক পাতিয়ে নিলেন—তারাই ছিলো সুখ-দুঃখের সাথী। সংসারের নানান ঝঞ্ঝাটের মধ্যে অনেক কিছুই সইতে হয়েছিলো তাঁকে। অবকাশ পেলেই ফাঁকা মনটা গুমরে উঠতো সেই অতিপ্রিয় গৃহটির জন্য। সে সব দিন তো অবাধেই জলের স্রোতের মত কেটে গেলো। সেই বন্দী-জীবনটাও বনেদি ভিতের অন্তরালে স্বপ্নের মত গেলো মিলিয়ে। যাক সে সব কথা। আজ রাত্রির উৎসব-আয়োজনের মধ্যে তাঁর মর্মবেদনার অবকাশ নেই। রাণুকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। বারাণ্ডার একধারে কলাগাছ পোঁতা হয়েছে, তারি মাঝে আল্পনা-দেওয়া পিঁড়ি পাতা আছে, রাণু এসে দাঁড়ালো তারি উপর—হলুদ-তেল-জল মাথায় লাগালে পাঁচ জন এয়ো মিলে। শুভ কর্ম্মের মাঙ্গলিক ক্রিয়া শেষ হলে পরে

নাপতিনী আল্‌তা পরাতে বসলো, ক্ষিপ্র হাতের রেখার টানে রাণুর ছোট্ট সাদা-পা দু-খানা রাঙিয়ে দিলে।

রাণুর ছোট মাসীমা বসে আছেন প্রসাধনের বিচিত্র সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। কনে সাজাতে অদ্বিতীয়া তিনি—এখনকার চেয়ে যে কিছু কম জানতেন তা নয়। রুজ, পাউডার, পমেটম্ থেকে আরম্ভ করে গোলা-টিপ, সুর্মা, কাজল, আলতা, সিঁদুর, সব কিছুই গুছিয়ে রেখেছেন তিনি আগে থেকেই। কনে-স্নানের পরই সুরু হোলো প্রসাধন। মাথা-জোড়া এলো খোঁপা বাঁধা হোলো—সোনার ফুল-কাঁটা চিরুণী দিয়ে সাজালেন। তার পরে চলে প্রসাধনের খুঁটিনাটি নানারূপ কারুকার্য্য। কপালে কনে-চন্দন লেপে দিয়ে ছোট্ট হাতি-দাঁতের চিরুণী দিয়ে টেনে দিলেন তার ওপর ছোট্ট একটি টিপ। রাঙা সাড়ী, গা-ভরা গয়না প'রে লক্ষ্মীর মতই দেখাচ্ছিলো রাণুকে। প্রথানুরূপ সোনা-বাঁধানো লোহা পরিয়ে দেওয়া হোলো রাঙ্গা শাখার কোলে। রাণু তার সাদা মোমবাতির মত হাত দু'খানার পানে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে খুশী হয়েছিলো তা বলাই বাহুল্য। কারণ সাজগোজ করতে রাণু খুব ভালবাসে। বৌদি একটি ছোট আয়না তার হাতে দিয়ে বললেন—একবার মুখখানা দেখো কেমন ভাল দেখাচ্ছে।

বেণু বসে দেখছিলো—দিদির সাজ-গোজ, দিদির পানে তাকিয়ে চোখে জল এলো তার। আজ তো দিদি এখানে, আর কাল এমন সময় দিদি কোথায়। নাঃ, আর সে ভাবতে পারে না। কাকিমা দু'গাছা গড়ে-মালা পরিয়ে দিয়ে বললেন—কনে-চন্দন পরে রাণুর কেমন শ্রী উঠেছে দেখো! রাণুকে বললেন—বর এলে যেন ছুটে দেখতে যেও না—বিয়ের আগে দেখতে নেই, শুভ লগ্নে দেখাব। রাণু গম্ভীর মুখে সম্মতি জানায়। দিন ও রাত্রির মিলনের শুভক্ষণেই রাণুর বিয়ের লগ্ন। সূর্যাস্তের সোনালী আলো তখনও মেলায়নি, ব্যাণ্ডের বাজনা উঠলো বেজে ঝম্ ঝম্ করে, বরের আগমন-বার্ত্তা জানিয়ে দিলে, তারি

সঙ্গে সুর মিলিয়ে নহবতে ধরলে তান সাহানা সুরে। ছেলেমেয়েরা ছুটলো বর দেখতে। ছাদে বারাণ্ডায় জানলায় লোকে ভরে গেলো। বাজনার শব্দ ক্রমশ এগিয়ে এলো রাজপথ ধরে। খাস-গেলাসের আলোয় রাস্তা আলো করে বরের প্রসেসান এগিয়ে এলো। প্রথমে এলো এক দল ঘোড়সোয়ার, তার পর কাগজের প্রকাণ্ড হাতি, ঘোড়া, মানুষ, ক্লাউন, ময়ূরপঙ্খি আরো কত কি, তার পরে এলো জরির তক্‌মা-আঁটা দ্বারবান, হাতে রূপোর আসাসোঁটা। সব শেষে বরকে নিয়ে এলো ফুলে ঢাকা প্রকাণ্ড ল্যাণ্ডো গাড়ী—তেজী তুটো জুড়ী ঘোড়া টগবগ করে এসে দাঁড়ালো আলো-ঝল্‌মলে বাড়ীটার সামনে। ওপর থেকে ফুল ছড়িয়ে দিলো ছেলেরা। শাঁখ উঠলো বেজে। কন্যাপক্ষের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বরকে নামিয়ে নিলেন। জামাই দেখে সকলেই খুশি। বর বেচারার অবস্থা শোচনীয়, সেকালের সুবোধ ছেলে—গুরুজনেরা যেমন সাজিয়েছেন তেমনি সেজেছে—তাই সাজের মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গেছে। গলায় মালা টোপর-পরা বর এসে বসলো ময়ুর-সিংহাসনে। তুই বেয়ারা বরের তু'ধারে দাঁড়িয়ে পাখার বাতাস করতে লাগলো। এধারে চলেছে বরযাত্রীদের আদর-আপ্যায়ন। রূপোর গড়গড়াতে অম্বুরি তামাক সেজে নিয়ে কুশিরাম বেয়ারা চলেছে তাঁদের খাতির করতে, লাল কার্পেটের উপর এনে বসিয়ে দিলে। রূপার আতরদান গোলাপপাস, পানদান আগে থেকেই রাখা আছে সেখানে, এ সব জিনিসের কারুকার্য দেখবার মতো। ছোট ছেলেরা ঘিরে বসেছে বরকে—এর মধ্যেই বেশ আলাপ হয়ে গেছে। বর বেচারা হয়তো চম্পকবরণী কন্যার ধ্যানে মগ্ন ছিলো। হঠাৎ পুরুত মশাই জানালেন শুভ লগ্ন উপস্থিত। বরকে তুলে আনা হোলো স্ত্রী-আচারের জায়গায়। মা এগিয়ে এলেন বরণডালা হাতে নিয়ে—বরণ শুরু হোলো। শুভদৃষ্টির সময় রাণুকে পিঁড়িসমেত ওঠানো হোলো বরের সামনে। রাণুর বন্ধ চোখ তুটো খোলে না—ঘুমে না লজ্জায় কে জানে! ছোট মাসী বলেন, "দেখো রাণু, এ সময় ভালো

করে দেখতে হয়।" রাণু একবার মাত্র চেয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। এত লোকের সামনে বরের পানে চাইবে কেমন করে? মালাবদল হোলো শাঁখের শব্দে পাড়া মুখরিত করে।

সম্প্রদানের জায়গায় তারা আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো।

কত জিনিস-পত্র সাজানো আছে,—কাঠের আসবাবপত্র, রূপোর ও শ্বেত-পাথরের বাসন, তাছাড়া আরও কত সৌখিন জিনিস আছে ঘর জুড়ে। চিত্রিত পিঁড়িতে এসে বসে বর-কনে। পুরুত মশাই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সুরু করেন—মন্ত্রপাঠ হোলো, বরের বাবা এগিয়ে এসে বসেন পুরুতের কাছে। সব শেষে মেয়ের বাবা রাণুর কম্পিত দু'খানি হাত তুলে দিলেন বরের হাতে—মালার বন্ধনে বেঁধে দিলেন। ঘন ঘন শাঁখ বেজে ওঠে। রাণু তার বাবার মুখের পানে চেয়ে থাকে, চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে তার। বিয়ে শেষ হয়ে গেলো—বর-কনেকে সভা থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেলো ভেতরে। উৎসাহী মেয়েরা রাণুর সঙ্গে গেলো বাসর-ঘরে। উৎসবের শেষ রাগিণী বেজে ওঠে বাঁশীতে। আত্মীয়-কুটুম্ব সকলেই পরিতৃপ্ত হয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত উৎসবের জের চললো। রাত্রির ম্লান চাঁদ ক্রমশ মিলিয়ে এলো, পূর্ব দিগন্তে দেখা দিলো সূর্য্যোদয়ের পূর্বাভাষ—কতকগুলো পাখী কিচির-মিচির করে উঠলো ডেকে। গত রাত্রির বাসি মালাগুলো এধারে-ওধারে ছড়ানো, ঝরে-পড়া ফুলের পাপড়িগুলোর বুকে তখনও মিষ্টি গন্ধ শেষ হয়ে যায়নি, উৎসবের চিহ্নটি বুকে ধরে আছে এই বাসি-বিয়ের সকালে। সকলের মন আজ ক্লান্তিতে ভরা। অবসাদের ছায়া পড়েছে বাড়িতে। সানাইয়ের সুর ঝিমিয়ে পড়েছে। সে সুর আজ কান্নায় উচ্ছল।

আজ রাণু চলে যাবে,—আজ আর কোন উৎসাহ নেই; বাবার কাছে বসে আছে ম্লান মুখে। বাবা উপদেশ দিচ্ছেন—ছুটোছুটি কোর না—এখন বউ হয়েছ, ধীরে ধীরে কথা বলবে, লক্ষ্মী হয়ে থাকবে, কেঁদ না, ইত্যাদি। দাদা বলেন—পুতুল ভেঙ্গে গেলে ভ্যাঁ করে কেঁদ

না—লোকে নিন্দে করবে। এতগুলি উপদেশ শুনে মনে ভয় আসে তার, চোখ বড় করে তাকায় বাবার মুখের পানে। সব কিছুতেই মানা—শ্বশুরবাড়ী সে কেমন যায়গা ? একা থাকতে হবে মা-বাবাকে ছেড়ে ! কত দিন তা কে জানে ?

ক্রমে রাণুর বিদায়ের লগ্ন উপস্থিত হয়ে আসে।

শ্বশুরবাড়ী থেকে বাক্স-ভরা গহনা-কাপড় নিয়ে ননদরা এসেছে বৌ সাজাতে। মা, ঠাকুরমাদের গয়না-কাপড় পরিয়ে নিয়ে যাবে বৌকে, কত রকমের গহনা—মুক্তোর সাতনরি, হীরের ঝাপটা, কাণ, বাউটী, বাজুবন্দ আরো কত কি। এই সাজিয়ে নিয়ে যাবার প্রথাটি অনেক জায়গায় নেই। কিন্তু রাণুর শ্বশুরবাড়ীতে এই প্রথাই চলে আসছে। রাণুর প্রসাধন স্বরু হলো—সাজ-সজ্জা চললো কিছুক্ষণ ধরে।

কোন গহনাটি কোথায় পরালে মানাবে, ওড়নাটি কি ভাবে পরালে দেখতে ভালো লাগবে, কোন ছাঁদে খোঁপা বাঁধলে পাশমুখ থেকে সুন্দর লাগবে, তাই নিয়ে কল্পনা-জল্পনা চললো। গহনাকাপড়ের প্রাচুর্যে আসল রাণুকে আর চেনা যায় না। পুরুত ঠাকুর মাঙ্গলিক জিনিসপত্র সাজিয়ে বসেছিলেন—জানালেন আর দেরী করবার সময় নেই। কান্নায় উদ্বেল রাণুকে নিয়ে এলো বৌদি ; গহনার ভারে রাণু চলতে পারে না সহজ ভাবে। পিসিমা বলেন—ও বৌদি এসে দেখো তোমার রাণুকে কেমন মানিয়েছে, ঠিক রাজরাণীর মতোই দেখতে লাগছে। রাণুর মা মিষ্টির থালা হাতে বেরিয়ে আসেন কুটুম্বদের একটু মিষ্টিমুখ করাবার জন্য। আত্মীয়-স্বজনে বাড়ী থৈ-থৈ। আর সময় নেই, বিদায়ের শুভক্ষণ উপস্থিত। অল্প সময়ের মধ্যেই অনুষ্ঠানের পাঠ চুকিয়ে দিয়ে, বর-কনেকে এগিয়ে দিতে গেলেন সকলে। রাণুর চন্দন-আঁকা ক্লান্ত মুখশ্রীর পানে তাকিয়ে মার মন ব্যথায় ভরে উঠলো। গুরুজনদের প্রণাম করে রাণু। বাবা মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন। দু'ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ে। রাণুর কান্না আসে।

মাকে আর দেখতে নেই, তাই আগে থেকেই ঘরের ভেতর চলে গেছেন —চোখের জলে বুক ভেসে যায়। ভগবান! রাণুকে সুখী করুন। বৌদি গাড়ীতে উঠিয়ে দেন বর-কনেকে। আঁচলে আঁচল বাঁধা রাণু বরের পিছু-পিছু উঠে গেলো গাড়ীতে, পায়ে নূপুর বেজে উঠলো ঝম্ ঝুম্ ঝুম্। রাজপথ কাঁপিয়ে গাড়ী ছুটে চলে দূর হতে দূরান্তরে। চলেছে রাণু কোন্ অজানা ভাগ্যপথে—উৎসবকে নিঃশেষ করে দিয়ে! পড়ে রইলো তার খেলাঘরের স্মৃতি। পরিপূর্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে বর রাণুর পানে। কি সুন্দর লাবণ্যমাখা মুখখানা!

"সে"

সে আমাকে ভালবাসে।

কিন্তু আমি তাকে ভালবাসি কিনা ঠিক বুঝি না। কারণ মাঝে মাঝে তাকে আমার অসহ্য লাগে। বেচারা তবুও আমায় খুশী করবার জন্য পাশে এসে বসে এবং করুণ নয়নে আমারই মুখের পানে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু তার প্রতি আমার মোটেই করুণার উদ্রেক হয় না। আমি উঠে চলে যাই। আপনারা হয়তো ভাবছেন—কেন আমি অমন করি! কিন্তু কি করবো বলুন। তার সঙ্গে আমার প্রথম দর্শনের দিন থেকেই এই ভাব। চেহারা যদিও তার ভালোই, রংও ফর্সা, বেশ লম্বা মজবুত চেহারা। স্বভাবও তেমন রুক্ষ নয়। তবুও সময় সময় তাকে আমার অসহ্য লাগে। কিন্তু তবুও সব সহ্য করে যাই কারণ সে আমায় ভালবাসে। কিন্তু যখন সে এসে আমায় তার ভালবাসার কথা জানায় বা আমার মনোনয়নে গান আরম্ভ করে তখন ইচ্ছা করে বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই। কিন্তু আমার এই বিরক্তি সে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনে না। মনের আনন্দে বেশ দিন কাটিয়ে যায়।

আমাকে জব্দ করবার জন্যে মাঝে মাঝে তার মাথায় বেশ দুষ্টু

বুদ্ধি খেলে যায়। সবার অলক্ষ্যে সে বাড়ী থেকে গা ঢাকা দেয়। তাকে দেখতে না পেলে মনটাও যেন কেমন করে। বিরক্তি বোধ করলেও অনেকটা করুণাবশতঃ তার খোঁজ খবর, খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির তদারক আমাকে করতে হয়। আমাকে অযথা হয়রান করার জন্যেই যে তার এই অন্তর্ধান, তা বুঝতে আমার মোটেই কষ্ট হয় না। তবুও আমি ওর জন্যে উদ্বিগ্ন হই, হয়তো বা মনে একটু কষ্টও হয়। কিন্তু সে ফিরে এলেই আবার পুনর্মূষিকোভব। তখন ওর মুখের দিকে তাকালে কেমন একটা মায়া হয়। তাই কিছু না বলে নিজের কাজে চলে যাই। ভাবি এর পর আর ওকে কিছু বলবো না—বরং একটু ভালবাসারই চেষ্টা করবো। আড়াল থেকেই ওর উপর নজর রাখি পাছে না আবার নিরুদ্দেশ হয়। বেশ কিছুদিন শান্তিতে কাটলো। ভাবলাম, এবারে বোধহয় ওর গৃহগত মন হয়েছে। কিন্তু হায়! স্বভাব যাবে কোথায়।

সেদিন ছিল ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না। চারিদিকে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে। অনেক রাত্রে লেপের তলায় শুয়ে বেশ আরাম বোধ করছিলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। মাঝে রাত্রে একবার যেন ওর গলা শুনেছিলাম। বোধহয় আমাকেই ডেকেছিল। কিন্তু আমি উঠিনি। সকালে উঠে আর ওকে দেখতে পেলাম না। কোথায় চলে গেছে কে জানে। আমি ভাবি আমার উপর অভিমান করেই কি চলে গেল! আমার বেশ রাগ হলো। ভাবলাম যেখানে খুশী ওর যাক। আর ওর কথা ভেবে মন খারাপ করবো না। কিন্তু এবারে সহ্যের সীমা ছাড়ালো। তিন দিন ওর কোনো খবর নেই। মনটা চঞ্চল হলো। মুখে যদিও বলি বেশ হয়েছে গেছে—কিন্তু মনটা কেমন যেন করে। যাই হোক আমার সকল ভাবনার অবসান করে দেখি আজ সে এসেছে। শুনলাম হারা উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াবার জন্য পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে থানায় আটকে রেখেছিল। আজকে সে ছাড়া পেয়েছে। কিন্তু এই তিন দিন ওখানে এমন জ্বালিয়েছে যে

ওরা না ছেড়ে দিয়ে পারেনি। এদিকে আমিও ঠাকুরকে দিনরাত ডেকেছি আর বলেছি, 'ঠাকুর ওকে ফিরিয়ে আনো। এবারে আমি ওকে আর অবহেলা করবো না। এবারে ওকে আমি ভালবাসার চেষ্টা করবো।' যাই হোক আমার প্রার্থনা বোধ করি ভগবান শুনেছিলেন, তাই আবার ওকে ফিরিয়ে আনলেন।

কিন্তু এবারে সে বোধহয় একটু লজ্জা পেলো। আমার দিকে না তাকিয়ে সোজা অন্দর মহলে ঢুকে গেল। যাবার সময় শুধু একটু গলার আওয়াজ দিয়ে জানিয়ে গেল যে সে এসেছে। আমি আবার তার খাবারের জোগাড় করতে গেলাম। এত কাণ্ডের পরও যদি জিজ্ঞাসা করেন আমি তাকে ভালবাসি কি না—আমি বলবো, না—মোটেই ভালবাসি না। তবে চলে গেলে মনটা আমার একটু খারাপ হয়ে যায়। বুঝিবা একটু কষ্টও হয়। কিন্তু ফিরে এলেই আবার সব ভুলে যাই। ভাবছেন যাকে আমি দেখতে পারি না অথচ যার অদর্শনে আমার প্রাণ কাঁদে সে কে? তাহলে আসুন এবার আপনাদের সঙ্গে তার পরিচয়টা করিয়ে দিই। তিনি হচ্ছেন আমার বিরাগভাজন আমাদের শ্রীযুক্ত মার্কাস মহোদয়— জাতিতে গ্রেট ডেন।

লম্বা হবার বিপদ

আমি জন্মেছিলাম কবে এবং কোন সালে তার সন তারিখ কিছুই জানি না। তবে বৃহস্পতিবারের বার বেলায় যে জন্মেছিলাম তা বুঝতে আমার বিলম্ব হয়নি। সৌভাগ্যবশতঃ মা কালো ছেলে দেখে ফেলে দেয়নি। তাই মার কোলেই শুক্লপক্ষের শশীকলার ন্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করেছি। আর একটা কথা বলি, রূপের দিক থেকে আমাকে বিধাতা কার্পণ্য করলেও সেটা অন্যদিক দিয়ে শুধরে নিয়েছিলেন। সেটা হলো সাধারণ লোকের থেকেও আমি বেশ খানিকটা লম্বা এবং

এর জন্যেই পদে পদে আমার বিপদ হয়েছিল। এখন শুনুন আমার সেই বিপদের কাহিনী।—

আমি লম্বা বলে আমার খাটুনিও ছিল অসম্ভব বেশী। কারণ মার যদি দরকার হয় মাচা থেকে লেপ কম্বল নামাবার, অমনি আমার ডাক পড়তো। আবার রবিবার হলেই বাবা বলতেন, "বংশী, একটা ঝাড়ু আন তো, মাকড়সার জাল আর ঝুলে ঘরের চেহারা যা হয়েছে তা আর চোখে দেখা যায় না। যা শিগ্‌গির, ওগুলো সব পরিষ্কার করে দে।" কি আর করি, ঝাঁটা নিয়ে ঝুল ঝাড়তে লেগে গেলাম।

বিকালে একটু বাইরে বেরোবো বলে যেমনি পা বাড়িয়েছি অমনি পদী পিসিমা বল্লে, "বাবা বংশী, একটা কাজ কর না। ওই যে দেখছিস কাঁচা আমের থোলো আগডালে ঝুলছে, ওই দেখ কাঠ ঠোকরা পাখীটা এসে ঠোক্কর দিচ্ছে—ওই আমগুলো পেড়ে দে বাবা। ওগুলো দিয়ে আমের আচার তৈরী করবো।" মনে মনে খুব বিরক্ত হলাম। আমতা আমতা করে বল্লাম, "কাল দিলে হবে না পিসি।" পিসি বল্লে, "ছিঃ বাবা, আগের কাজ আগে করতে হয়। ফেলে রাখতে নেই।" অগত্যা উপায় না দেখে আম পাড়তে লেগে গেলাম। এই রকম ভাবে আমার দিন কেটে যাচ্ছিল। এক এক সময় ভাবি এভাবে আর পারা যায় না। এদের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে এদেশ থেকে পালাতে হবে। অন্যখানে গিয়ে যে চাকরী নেবো সে পথেও কাঁটা। পেটে যে ছাই একফোঁটা বিদ্যেও নেই। তবু একবার ভাগ্যকে যাচাই করে নিলে দোষ কি।

সেদিন ছিল রবিবার। আমার এই ছুটির দিনেই বেশী কাজ পড়ে। সমস্তদিন খাটাখাটনি সেরে খেয়ে দেয়ে সবে মাত্র শুয়েছি, অমনি জানলার কাছ থেকে চাপা গলায় কে যেন নাম ধরে ডাকলো। প্রথমে কোন উত্তরই দিলাম না কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। ক্রমাগত ডাক "বংশীদা···ও বংশীদা। একটিবার শোনো না ভাই।" দুত্তর বলে উঠে বসলাম। তাকিয়ে দেখি জানলার ধারে টগর দাড়িয়ে। বেশ একটু

রেগেই বল্লাম, "অসময়ে আবার জ্বালাতে এলি কেন বল্ তো ? একটু বিশ্রামও আমায় তোরা করতে দিবি না।" একটু হেসে টগর বল্লো, "রাগ করলে বংশীদা, সত্যি একটু দরকার ছিল।" বল্লাম, "এই ভর দুপুরে হঠাৎ কিসের দরকার পড়লো শুনি।" ও একটা টাকা বের করে বল্লো, "মা এই টাকা দিয়েছে ছানা, মুড়কী, পান্তুয়া আর এক প্যাকেট ভালো চা আনতে। খুব তাড়াতাড়ি দরকার কিনা তাই মা বল্লো, 'যা না তোর বংশীদাকে দে, খুব তাড়াতাড়ি ও এনে দেবে। ওর চেয়ে তাড়াতাড়ি আর কেউ যেতে পারবে না। যা লম্বা লম্বা পা ওর।' " মনে মনে খুব একচোট গালাগালি দিয়ে বল্লাম, "তা খুব ভাল করেছো। কিন্তু বলি এই ভর দুপুরে হঠাৎ কার খাবার সখ এত হলো ?" টগর এক-গাল হেসে বল্লে, "আহা, যেন জানেন না।" তারপর ফিসফিস করে বল্লো, "কলকাতার থেকে উনি যে এসেছেন। সেইজন্যেই তো মা এত তাড়া লাগিয়েছে।" ভুলেই গিয়েছিলাম যে গত বছর টগরের বিয়ে হয়েছিল। ওদের বাড়ি আর আমাদের বাড়ি একেবারে পাশাপাশি। ওকে ছোটবোনের মতই দেখি। তাই নির্বিবাদে ওর সব আবদার মেনে নিই। অগত্যা আর কি করি, ছুটলাম ছোট বোনটির আবদার রক্ষা করতে। ঘুষ স্বরূপ টগর একটা সিগারেটও আমার হাতে গুঁজে দিল। বোধহয় ওর স্বামীর পকেট থেকেই নেয়া। যাহোক সিগারেট পেয়ে মনটা খুব খুশী হলো। নিমেষের মধ্যে লম্বা পা দুখানা চালিয়ে দিলাম মিষ্টির দোকানের উদ্দেশ্যে।

এই ক'দিনের মধ্যেই টগরের স্বামী বীরুর সঙ্গে আমার খুব আলাপ হয়ে গেল। বীরু সহরের ছেলে। কথাবার্ত্তায় খুব স্মার্ট। সেদিন টগরই যেচে তার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ায় আমার সঙ্গে বীরুর খুব ভাব জমে গেল। কথায় কথায় একদিন টগর বীরুকে আমার গোপন ইচ্ছাটি জানালো। বীরু খুশী হয়ে বল্লো—"আরে এ তো চমৎকার মতলব। ঠিক আছে, ও আমার সঙ্গে কলকাতায় চলুক ওখানে ওর সব ব্যবস্থা করে দেবো।" তারপর আমার দিকে চেয়ে বল্লো—"কিন্তু

বাড়ির জন্যে মন কেমন করবে না তো?" হেসে মাথা নাড়লাম। বীরু জিজ্ঞাসা করলো—"পড়াশুনা কতদূর করেছো?" জবাব দেবার আগেই টগর বল্লো—"বেশী দূর আর পড়বে কি করে। বেচারা লম্বা হোয়েই যত বিপদ হয়েছে। স্কুলে যখন পড়তো তখন সবাই ভাবতো ওর বয়েস অনেক বেশী। ছেলেরা ওকে খুব ঠাট্টা করতো। মাষ্টাররাও সুনজরে দেখতেন না। বরং পিটিয়ে পিটিয়ে বেচারাকে আরো খানিকটা লম্বা করে দিয়েছেন। কাজেই বংশীদাকে স্কুল ছাড়তে হলো।" বীরু বল্লে—"ঠিক আছে, কলকাতায় গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বীরুদার সঙ্গে কলকাতায় আসার সব ঠিক করে ফেল্লাম। বাড়ীর থেকে প্রথমে অনেক বাধা এসেছিল কিন্তু আমার স্থির সঙ্কল্প দেখে শেষ পর্যন্ত আর কেউ বাধা দেয়নি। মনে মনে ভাবলাম, যাক্, এতদিনে দুঃখের অবসান হলো। কিন্তু বরাতে দুঃখ থাকলে কে তা খণ্ডাবে। ট্রেনে উঠতে গিয়েই তো খেলাম প্রচণ্ড এক ধাক্কা। ব্যথার জায়গায় হাত বুলাতে বুলাতে মাথা নীচু করে ট্রেনে উঠে বসলাম। যথা সময়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। একবার তাকিয়ে দেখে নিলাম আমার প্রিয় গ্রামটিকে। জানি না আবার কবে এর কোলে ফিরে আসবো। তখন কে জানতো আড়ালে বিধাতা হাসছেন।

যথাসময় বীরুদার সঙ্গে কলকাতায় এসে পৌঁছলাম। উনি ওঁর এক দূর সম্পর্কীয় কাকার বাড়ীতে আমার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। মনে মনে বীরুদাকে সহস্র ধন্যবাদ জানালাম। ভাবলাম এই বিরাট সহরে আমাকে নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামাবে না বা কারুর উপহাসের বস্তু হবো না। কিন্তু পদে পদে ভুল আমার ভাঙ্গতে লাগলো।

সেদিন বাজারে গেছি কিছু মাছ কিনবো বলে। মাছের দোকানে গিয়ে দাম জিজ্ঞাসা করাতে সে সভয়ে আমার দিকে তাকিয়ে কি বল্লো বুঝলাম না। মোটকথা এটা বেশ বুঝতে পারলাম সে আমায় দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গেছে। আমি যে দাম দিলাম সে বিনা বাক্যব্যয়ে তা

গ্রহণ করলো দেখলাম। যাক্, মনে মনে একচোট খুব হেসে নিলাম। আর একদিন জুতোর দোকানে গিয়েছি আমার একজোড়া জুতো কিনবো বলে। প্রথমে দোকানের লোক তো আমাকে দেখেই ঘাবড়ে গেছে। তারপর যখন বল্লাম—"দেখি আমার পায়ের একজোড়া জুতো।" তখন লোকটি আমতা আমতা করে বল্লো—"আজ্ঞে অতবড় জুতো তো এ দোকানে নেই।" রাগ করে বেরিয়ে এলাম দোকান থেকে। এর পর একদিন দোকানে ধুতি কিনতে গেলাম। দোকানদার স্পষ্ট জানিয়ে দিল এ সাইজের ধুতি বাজারে নাকি পাওয়া যায় না। কি করি মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখি। একদিন সিনেমা দেখতে গেলাম। বসে ছবি দেখছি এমন সময় পেছনের ভদ্রলোক বলে উঠলেন—দাদা, মাথাটা একটু নীচু করবেন, কিচ্ছু দেখতে পারছি না। কি করি, ভালো ছেলের মতন সমস্তক্ষণ মাথাটা নীচু করে রইলাম, ছবি দেখা আর হলো না।

এর পর সবচেয়ে বিপদ হলো পাড়ার ছেলেরা আমার পেছনে লাগলো। যখনই বেরোতাম তখনই পেছন থেকে সব মন্তব্য করতো—ওই যে লম্বুদা চলেছেন।···কেউ কেউ বলতো ওরে রণ-পা দেখে যা··· ইত্যাদি। মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারতাম না। অথচ সহ্য করতেও হাঁফিয়ে উঠতাম। একদিন রাস্তায় এক জায়গায় খুব ভীড় দেখে দাঁড়ালাম। দেখি এক ভিখারী খুব সুন্দর গান গাইছে। আমিও দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম। এমন সময় হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে থেকে চোর··· চোর···পকেটমার রব উঠলো। দেখি এক ভদ্রলোক ক্রমাগত পকেট হাতড়াচ্ছে আর চিৎকার করছে—আমার মনিব্যাগ কোথায় গেল··· চোর···চোর···পুলিশ। তার পরেই দেখি ভদ্রলোক হঠাৎ এগিয়ে এসে আমার একখানা হাত চেপে ধরে বল্লেন—"এই, শীগ্‌গির আমার ব্যাগ দিয়ে দে···নইলে পুলিশে দেবো। আমার সঙ্গে চালাকি পেয়েছো। ভাবছো আমি কিছু বুঝি না। ভালো চাও তো এক্ষুনি বের করে দাও।" জনতা ততক্ষণে আমায় ঘিরে ধরেছে। সবারই মুখে সন্দেহের

ছায়া। আমি তো হতভম্ব। আমি আমতা আমতা করে বল্লাম—"আজ্ঞে আমি তো কোন ব্যাগ নিইনি।" "চুপ রও"—ভদ্রলোক গর্জ্জন করে উঠলেন, "চেহারা দেখলেই মালুম হয় চোর ছ্যাঁচড় কিনা। এখন ভালোমানুষের মতন ব্যাগ বের করে দাও।" ততক্ষণে পুলিশ এসে গেছে। সবাই আমাকে চোর সনাক্ত করতে ব্যস্ত। অগত্যা বাধ্য হয়ে পুলিশের সঙ্গে থানায় গেলাম। সেখানে পুলিশ ইন্‌সপেক্টারকে অতি কষ্টে নির্দোষ প্রমাণ করে ছাড়া পেলাম। মনে মনে কলকাতা সহরকে প্রণাম জানিয়ে পরদিনই ট্রেনে চেপে বসলাম। কপালে এতও ছিল কোনদিন ভাবিনি। তাই মনে মনে ভগবানকে বল্লাম—ঠাকুর, পরজন্মে আমাকে আর যাই করো অন্ততঃ লম্বা কখনো কোরো না। এর তুল্য অভিশাপ আর নেই।

অশ্রুজল

সৌখিন সমাজের আধুনিকা মেয়ে মিলি। তার উপর আছে পিতৃ-বংশের খ্যাতি। চেহারায় আছে বৈশিষ্ট্য। কাজেই তরুণ মহলে সে এনেছিল চাঞ্চল্য। সাজ পোষাকে ছিল প্রচুর সৌখিনতা, বাক্য-বিন্যাসে মার্জ্জিত আর ব্যবহারে ছিল মধুর। সোসাইটির আকর্ষণীয়া এই মেয়েটি হাল্কা প্রজাপতির মত ঘুরে বেড়াতো। গানের আসর থেকে চায়ের মজলিসে সর্ব্বত্র ছিল তার অবাধ গতি। এই মিলিকে চেনে না কে। মিলির সামান্য কৃপা কটাক্ষ পেলে তরুণেরা ধন্য হতো—তার মুখে হাসি ফোটাতে তারা প্রাণান্ত করতো। এ হেন মিলির জীবনে বৈচিত্র্য এনে দিল বসন্তের একটি মধুর সন্ধ্যা। দক্ষিণের বাতাসে মিলির বিয়ের ফুল ফুটলো। কোথায় মিলিয়ে গেল মিলির কল্পনার সৌধ। আর পাঁচ জন মেয়ের মতোই চিরাচরিত প্রথায় তার বিয়ে হয়ে গেল। দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর ঘটনা কিছু ঘটলো না। অনেকেই হয়তো বিয়েতে এইরূপ নীরব সম্মতিতে বিস্মিত

হয়েছিলেন কিন্তু আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ধনীর পুত্র সন্দীপের রূপ আর অর্থের আকর্ষণই মিলিকে কাছে টেনে আনলে। মিলি গেল স্বামীর ঘরে।

আমি সাধারণ অধ্যাপক। মিলিকে পাওয়া আমার কাছে স্বপ্ন তুল্য। তবু তাকে ভালবেসেছিলাম। অন্ততঃ সংসারে এমন একজন ছিল যার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল এই সংসার নিরর্থক নয়, জীবন মরুভূমি নয়। চলার পথ ক্লান্তিকর নয়। মিলি ছিল আমার ছাত্রী। আমার আদরের ছাত্রী। নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলাম তাকে গড়ে তুলতে। ভেবেছিলাম হয়তো তার মধ্যেই আমি বেঁচে থাকবো। আমার কল্পনার জীবন্ত প্রতীক হবে সে। কিন্তু জনতার মাঝে আমার মিলি হারিয়ে গেল। আমার দৃষ্টি তাই আর মিলিকে খুঁজে পায় না। আজো যখন তার কথা ভাবি চোখ আমার ভরে আসে জলে। মনে হয় ভালবাসাই কি জীবনে সবচেয়ে বড় অপরাধ ?

বিবাহ-বাসরে মিলিকে দেখেছিলাম অপরূপ বেশে। পরনে ছিল লাল টক্‌টকে বেনারসী—গা ভর্ত্তি জড়োয়া গয়না। আর মাথায় ছিল লাল ওড়না। বধূ বেশে সজ্জিতা মিলি একবার মাত্র আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসেছিল। ওর চঞ্চল চোখ দুটির ভাষা বুঝিনি। স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম তার মুখের স্বভাবসিদ্ধ ওই হাসি দেখে। মানুষ কি সবই ভুলে যায়! অতীতের সব কথাই কি আজ বিস্মৃতির গর্ভে! হয়তো তাই। ভুলে যাওয়াটাই হয়তো স্বাভাবিক। তাই হয়তো সাধারণ অধ্যাপকের স্থান হয়নি তার জীবনে। ভুল করে তাকে নিয়েই করেছিলাম তাজমহলের স্বপ্ন। ভালবাসা দিয়ে স্বর্গ রচনা করেছিলাম মনে। কিন্তু নিজের হাতেই সে তার সমাধি রচনা করে গেল। আর মিলি! সে কি আজ সুখী ?···প্রতিষ্ঠা, সম্পদ, সম্মান সে যা চেয়েছিল সবই তো পেয়েছে! হয়তো সে আজ সুখী। কোন কিছুরই অভাব আজ তার নেই।

জীবনকে হয়তো সে আজ ভরিয়ে তুলেছে রূপে, রসে, গানে। আজ হয়তো সে পরিপূর্ণা। তার কি মনে আছে এই সামান্য অধ্যাপকের কথা। তার জীবনের প্রথম পুরুষকে।···সম্ভবতঃ আজ সে সব ভুলে গেছে। ধনীর গৃহে আরাম ও বিলাসের মাঝে ভুলে গেছে এক অক্ষম পুরুষের নীরব কান্না। সে সুখে থাকুক···তার জীবন ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক। কিন্তু আমি কি পেলাম আমার জীবনে? পিছনের ফেলে আসা দিনগুলির পানে তাকিয়ে দেখি পড়ে আছে শুধু অতীতের স্মৃতি। ওটুকুই থাক আমার জীবনের একমাত্র সম্বল। আর তাকে ঘিরে আমার ভালবাসার প্রদীপ জ্বলুক অনন্তকাল। মিলি দূরে চলে গেলেও আমার কাছে সে হারায়নি। সে হারাবে না।

এর পর কেটে গেছে সুদীর্ঘ পাঁচ বছর। সংসারে কত পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। কিন্তু আমার জীবনে কোন পরিবর্ত্তনই আসেনি। আজো ক্লান্তির বোঝা টেনে চলেছি কোন রকমে। এই জীবনে কোথাও কোন বৈচিত্র্য নেই। আনন্দের পরিসমাপ্তি অনেক আগেই ঘটে গেছে। এক এক সময় মনে হয়েছে এভাবে বেঁচে থেকে লাভ কি? কিন্তু আত্মহত্যা নাকি মহাপাপ, কাপুরুষতার লক্ষণ। তবু আমাকে নিয়েই তো সংসার নয়। আর পাঁচজনের দায়িত্ব যখন মাথার উপরে, অতবড় স্বার্থপর কি করে হই। জীবন্মৃত হলেও বেঁচে থেকে সব দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। আত্মীয় স্বজনরা বিয়ের চেষ্টাও করেছিল। আমার নিঃস্পৃহ ভাব দেখে আর কেউ অগ্রসর হয়নি। এমনি করেই গড়িয়ে চলেছিল আমার জীবনের একঘেয়ে দিনগুলি।

একদিন হঠাৎ একখানা চিঠি এসে হাজির। কাগজে দেখে ছেলে পড়ানোর বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি দিয়েছিলাম। তারই উত্তর। দেখা করতে বলেছে। নির্দ্দিষ্ট দিনে ঠিকানা খুঁজে হাজির হলাম। প্রকাণ্ড লোহার গেট পেরিয়ে এগিয়ে গেলাম মেহেদির বেড়া দেওয়া

লাল সুরকির পথ ধরে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বারান্দার দুপাশে ফুটে আছে অজস্র গন্ধরাজ আর চাঁপা ফুল। তারি মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই বেয়ারা এসে দাঁড়ালো। হাতে তার দিয়ে দিলাম শ্লিপ। আমাকে একটা সুসজ্জিত ঘরে বসিয়ে সে ভিতরে চলে গেল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরটি। মেজেতে সুদৃশ্য কার্পেট মোড়া। মধ্যিখানে টেবিল আর আর তার চারপাশে খানকয়েক চেয়ার। একপাশে রাইটিং প্যাড্। টেবিলের পাশে ফুলদানীতে রাখা সাজানো একগোছা গন্ধরাজ। চারদিকে সৌখিন পর্দা আঁটা। ঘরের সাজসজ্জা দেখতে দেখতে বুঝি বা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম নারীকণ্ঠ—নমস্কার······চমকে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখি আমারই সামনে দাঁড়িয়ে মিলি—পাশে তার ছোট্ট ছেলে। আমায় দেখে মিলিও হতভম্ব। অবাক হয়ে চেয়ে আছে আমার দিকে। চোখে তার একরাশ বিস্ময়। আমি মুখ নামিয়ে নিলাম। মাটির দিকে চেয়ে বললাম, "আমায় ক্ষমা কোরো মিলি। আমি জানতাম না এটা তোমাদের বাড়ি। আমি যাচ্ছি।" দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু পরক্ষণেই মিলি বলে উঠলো—"শোনো।" দাঁড়িয়ে গেলাম। ওর দিকে তাকাতেই মাথাটা ও নীচু করে বল্লে—"দোষ আমি করেছি জানি। শাস্তি যদি নিতে হয় তো আমিই নেবো। কিন্তু আমার ছেলে তো কোন দোষ করেনি। আমার অপরাধে ওকে তুমি শাস্তি দিও না।" কি জবাব দেবো বুঝতে পারলাম না। জোর করে চলে আসতেও পারলাম না। ধীরে ধীরে মুখের দিকে তাকালাম। ও বললো, "আমার রঞ্জুর ভার তোমাকেই নিতে হবে। ওকে তুমি মানুষ করে তোলো। এই কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না। ও ছাড়া যে আর আমার কিছু নেই।" কণ্ঠ বুঝি ওর ধরে আসে। চোখে বুঝি বা জলের ছোঁয়া। একি সম্ভব মিলির চোখে জল? না আমি ভুল দেখছি। না না দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয়

দিলে চলবে না। তবুও শেষবারের মতন শক্তি সঞ্চয় করে বলে উঠি—"আমার পক্ষে ওর ভার নেওয়া সম্ভব হবে না মিলি। তোমার অর্থের অভাব নেই। অর্থের বিনিময়ে আমার চেয়ে ঢের ভাল শিক্ষক পাবে। আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো।" বেরিয়ে আসছিলাম দরজা দিয়ে। এমন সময় পাশের ঘর থেকে শুনতে পেলাম বিকৃত কণ্ঠের চিৎকার। চমকে উঠলাম। একি মিলির মুখের দিকে তাকাতে দেখি ওর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমার বিস্ময় ভাব দেখে ম্লান হেসে বললো—"অবাক হচ্ছো, না? আমিও তোমার মতন প্রথম প্রথম অবাক হয়ে যেতাম। তারপর এখন সব সয়ে গেছে।" বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম—"কিন্তু ও ঘরের সবাইকে মনে হচ্ছে অপ্রকৃতিস্থ।" "হ্যাঁ", মিলি উত্তর দিলে। "আমার স্বামী রোজই সন্ধ্যায় বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করেন। আর আমি যোগ দিই না বলে আমায় পুরস্কৃত কোরেছেন প্রচুর। সে সব পুরস্কার আমার শরীরে সাক্ষী স্বরূপ রয়ে গেছে। অবাক হচ্ছো? কিন্তু আমার কোন ক্ষোভ নেই বিজুদা। স্বেচ্ছায় যে ভুল করেছি আজীবন তার প্রায়শ্চিত্ত করে যাবো। নিজের জন্য দুঃখ করি না কিন্তু ওর ভার তুমি না নিলে ওকে আমি বাঁচাবো কি করে। ওকে তুমি গড়ে তোল তোমার মতন করে। তোমার মহৎ অন্তঃকরণের সান্নিধ্যে ওকে তুমি মানুষ করো বিজুদা। তোমার কাছে এই আমার শেষ ভিক্ষা···আর পারো তো আমায় ক্ষমা কোরো···আমায় ক্ষমা কোরো।"···বলতে বলতে দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলে মিলি। স্তম্ভিতের মতন আমি দাঁড়িয়ে নিথর, নিস্পন্দ। মিলি কাঁদছে। নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিলাম পড়ানোর সম্মতি দিয়ে। মিলিকে না পেয়ে আমার হারানোর দুঃখ হয়েছিল খুব। কিন্তু মিলির পেয়ে হারানোর দুঃখ কি এর চেয়ে বেশি না? নিজের মনেই প্রশ্ন করি। আমার কথায় ওর মুখে ফুটে উঠেছিল পরম পরিতৃপ্তি। সেই দিনই খুঁজে পেলাম আমার হারানো সম্পদ। জীবনের সব হারানোর শূন্যতা এতদিনে পূর্ণ হলো ওর এক‌ফোঁটা চোখের জলে।

অন্তরালে

তখন ঘনায়মান সন্ধ্যা—চতুর্দিকে জমাট অন্ধকার। সহরের কোন এক অভিজাত পল্লীতে মিসেস গুপ্তার হাল ফ্যাসানের বাড়ী। তারই সুসজ্জিত ড্রইংরুমটি মুখরিত হয়ে উঠেছে হাসি, গল্পে, গানে। সন্ধ্যার মজলিস সুরের ছন্দে ভরপুর। এ অঞ্চলে মিসেস গুপ্তা হলেন স্বনামধন্যা—তাঁকে কে না জানে?

বালীগঞ্জের অভিজাত পল্লীর অনেকেই এই সময় তাঁর সুদৃশ্য ড্রইং-রুমের কৌচ কেদারাগুলি অলঙ্কৃত করে থাকেন। স্থানটি বহু তরুণ তরুণীর আদর্শের কেন্দ্র স্বরূপও বলা যেতে পারে। কাজেই মিসেস গুপ্তা যে এখানে সর্ব্বজনপ্রিয়া তা বলাই বাহুল্য। তাঁকে সন্তুষ্ট করতে সবাই তৎপর।

সেদিন ছিল একটা ছোট্ট পার্টি। মিসেস রেবা গুপ্তা তাঁর মাল্টিকালার শাড়ীটি পড়ে আসরটিকে রীতিমতন জমকালো করে তুলেছেন। সুদর্শনা মিসেস গুপ্তা হাতের রিষ্টওয়াচটার পানে তাকিয়ে ছোট্ট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন—মিনু, মিঃ ডাট্ এখনও আসছেন না কেন বলতো? শরীর ভাল ছিল না, তাই চায়ে ডাকলাম একটু গল্প শুনবো বলে। তা চায়ের টাইম তো ওভার হয়ে এলো দেখছি। ভদ্রলোক ভীষণ আপন-ভোলা, সময়-জ্ঞান যদি একটু থাকে? মিনু জবাব দেয়—একবার ফোন করে দেখবো না কি, রেবাদি?

না—না, দরকার নেই। আসবেন ঠিকই নিশ্চয়। মলিদের ওখানে হয়তো আটকে পড়েছেন।

মিনু হেসে বলে—রাগ করলে কিন্তু ভারি সুন্দর দেখায় তোমায় রেবাদি।

মিসেস গুপ্তা গম্ভীর হয়ে বলেন—থাক্, তোমাকে আর ফ্ল্যাটারি করতে হবে না।...অগত্যা মিনুকে চুপ করে যেতে হয়। ইতিমধ্যে

সীতা, মিতা ঘরে এসে ঢোকে। দেখতে তারা বেশ সুশ্রীই তবে রুজ পাউডারের দৌলতে তাদের ওরিজিনাল কালারটি কি ঠিক বোঝা গেল না। দুজনের মুখেই একটু দুষ্টুমি ভরা চাপা হাসি। পরিধানে তাদের সাদা জর্জেট-শাড়ী। একজনের চোখে চশমা। গয়না দুজনের কারুর হাতেই নেই। শুধু মণিবন্ধে তাদের রিষ্টওয়াচ আর হাতে ব্যাগ।

মিনু বল্লে—এই যে সীতাদি, মিতাদি এসে গেছেন।—বাব্বা! এত দেরী যে? সীতা বলে—খেলা দেখতে গিয়েছিলাম ভাই। আজ শেষ খেলা ছিল কিনা—তাই একটু দেরী হয়ে গেল। যা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে এসেছি একটুও মেক-আপ করার সময় হয়নি।—ওমা, রেবাদি শুয়ে কেন—কি হয়েছে?

—মাথাটা একটু ধরেছে।

হঠাৎ আবার মাথা ধরলো কেন?—সীতা কৈফিয়তের সুরে জিজ্ঞেস করে।

—এ তো আর সময় বুঝে হয় না ভাই। এস্‌প্রিন খেলাম—কই তবুও তো কমলো না।—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন মিসেস গুপ্তা।

মিতা বলে—ওসব খাবেন না। ওতে হার্ট ডিপ্রেস্‌ড হয়ে যায়।

—হলে আর কি করা যায়। আর তোমাদের সঙ্গে একটু কথা বলতেও ভাল লাগছে।

বেয়ারা ট্রে নিয়ে এসে ঢুকলো। মিসেস গুপ্তা বল্লেন—তোমাদের কি দেবে—চা, কফি, না কোল্ড ড্রিঙ্ক্‌স্‌?

—উই প্রেফার কোল্ড ড্রিঙ্ক্‌স্‌ রেবাদি।

বেয়ারাকে তাই আদেশ দিয়ে মিসেস গুপ্তা কৌচে গা এলিয়ে দিলেন। গল্প গুজব ধীরে ধীরে আগের মতই আবার জমে উঠলো। এমন সময় মিঃ ডাট্‌ এসে ঘরে ঢুকলেন। লম্বা চেহারা—এক কথায় সুপুরুষ বলা যায়। পোষাক-পরিচ্ছদে আর চাল চলনে একেবারে নিখুঁত সাহেব। ওঁকে দেখে মিসেস গুপ্তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ডলি অন্যদিকে বসেছিল। ওঁকে দেখেই মুখটা ফিরিয়ে নিল।

মিন্টু বলে ওঠে—আমরা সকলেই আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আপনি ভীষণ দেরী করেন ?

মিঃ ডাট্ মৃদু হেসে জবাব দেন—রিয়ালি ?

জিজ্ঞেস করুন না সকলকে—মিন্টু চেঁচিয়ে ওঠে।

মিঃ ডাট্ বিলাতি কায়দায় নুয়ে পড়ে নিঃশব্দে অভিবাদন করলেন।

মিতা পাশ থেকে চাপা গলায় বল্লো—ভেরি স্মার্ট বয়, ইজ্‌ন্ট্ হী ?

ঘরের মধ্যে শুধু একটা মৃদুগুঞ্জন শোনা গেল। মিঃ রায়, মিঃ মিটার, মিঃ চক্রবর্ত্তী সকলেই মিঃ ডাট্‌কে নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা সুরু করলেন। অনেকেই টিপ্পুনি কাটলেন—একেই বলে নাকি স্মার্টনেস্, ছোঃ। কি বিশ্রী টাইটা পরেছে, একটুও মানায়নি। He is more a ladies man.

—আবার আপনি অনধিকার চর্চ্চা করছেন মিঃ রায়। জানেন উনি একজন বিখ্যাত Sportsman।—ডলি অসহিষ্ণুর সুরে বলে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে ললিতাও ফোড়ন কেটে ওঠে—বা। বা। মিঃ ডাটের প্রশংসায় তুই যে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলি।

ডলি লজ্জিত হয়ে বলে—কি যে বলেন! সত্যি যা তাই বল্লাম। মুখটা তার লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। ওর অবস্থা দেখে সবাই হেসে ওঠে।

—সকলের মধ্য থেকে চেয়ারটা একটু এগিয়ে এনে মিঃ রায় বল্লেন—আপনারা মিস্ ডলি দত্তকে দোষ দেবেন না। উনি সুনিপুণ খেলোয়াড় মিঃ ডাট্‌কে হৃদয়ের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। যদিও তাঁর চারিধারে ঘিরে রয়েছে সুদর্শনা তরুণীরা। অতএব অযথা ভীড় বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। মাঝখান থেকে আমার এ্যাডভেন্‌চারের গল্পটা বন্ধ করতে হলো।

সবাই সমস্বরে বলে ওঠে—না মিঃ রায়, প্লিজ। বলুন, খুব সুন্দর

লাগছিল শুনতে। তারপর সেই দুর্দ্দিনে পথে ঘাটে লোক নেই। আপনি চলেছেন একা—তারপর কি হলো ? মিঃ রায় সুরু করেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা এগিয়ে চলেছি সেই নির্জন অচেনা পথ ধরে। তারপরে—

হঠাৎ মিসেস গুপ্তার কণ্ঠস্বরে সুর কেটে যায়। তিনি সবাইকে ডেকে বল্লেন—এবার আমরা ড্রইংরুমে গেম্‌স সুরু করছি। পার্টনার ঠিক করা হবে লটারি ক'রে—যার সঙ্গে যার নাম উঠবে। সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

ডলি বল্লো—মিঃ রায়ের গল্পে শুধুই বাধা পড়ছে।

মিতা বলে—আপনি আমাকেই শোনাবেন গল্পটি। শুনবার আগ্রহ আমারই সবচেয়ে বেশী।

মৃদু হেসে মিঃ রায় বলেন—সে হবে একদিন। আজ ভয়ানক টায়ার্ড। এক গ্লাস জল দেবেন ?

মিতা তাড়াতাড়ি এক গ্লাস লেমন স্কোয়াস এনে দিল।

—Thanks, আপনি আবার কষ্ট করতে গেলেন কেন ? —মিঃ রায় মৃদু হেসে বলেন।

মিনু তাড়া দিয়ে বলে—হারি আপ্। খেলা এখুনি সুরু হবে। এবার এমনি পার্টনার choose করা হবে, না লটারি ক'রে হবে ?

মিঃ ডাট্ জবাব দেন—Ask the ladies.

মিসেস গুপ্তা মিঃ ডাট্‌কে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি খেলাতে জয়েন্ করছেন না ?

—না, আমার শরীরটা খুব ভালো feel করছি না। আর তা ছাড়া খেলার ঠিক moodও এখন নেই। আমি বরং এখানে একটু বসি।

—না না, তা কি হয়।—মিসেস গুপ্তা বাধা দিয়ে বলে ওঠেন। আপনারাই বরং খেলুন, আমি একটু বসি। আমার খেলা দেখতে বেশ লাগে।

তখন খেলা সুরু হলো। কাগজ পেন্সিল নিয়ে এধার থেকে ওধার ছুটাছুটি আর পার্টনারকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। একসময় ডলি এসে মিঃ ডাট্‌কে জানাল যে উল্টো করে লেখার দরুণ একটা নাম সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। তখন মিঃ ডাট্‌ কানে কানে তার কি বলে দিলেন। অমনি সকলে সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠলো—ইট্‌ কান্‌ট্‌ বি। মিঃ ডাট্‌ ডলিকে ফেবার দেখাচ্ছেন। তা কিছুতেই হবে না। তখন মিঃ মিটারকে সালিশী মানা হলো। উনি মৃদু হেসে জবাব দিলেন—অন্যায় নিশ্চয়। তবে পার্টনার তো মাত্র এক ঘণ্টার। ভয়ের বিশেষ কিছুই নেই। সবাই হেসে উঠলো।

মিসেস গুপ্তা চুপচাপ বসে আছেন দেখে মিঃ রায় এগিয়ে এসে তাঁর পাশের চেয়ারটিতে বসে পড়লেন। মিসেস গুপ্তা বল্লেন—আপনি খেললেন না?

—না, মিসেস্‌ গুপ্তা। ওসব আমার ভাল লাগে না। তা আপনি এখন একটু ভাল feel করছেন তো?

মিসেস গুপ্তা জবাব দেন—হ্যাঁ, অনেক ভাল লাগছে। তারপর খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বল্লেন—আচ্ছা, গ্রে স্যুট পরা ঐ ভদ্রলোকটি কে দাঁড়িয়ে আছেন? বেশ তো মানিয়েছে গ্রে রংএতে।

—উনি সম্প্রতি আমেরিকা থেকে এসেছেন। আর্টিষ্ট মানুষ, তবে খুব স্মার্ট। নাম অনিরুদ্ধ মিটার। দেখছেন না কত Thirsty eyes ওঁকে ঘিরে রয়েছে। কথাগুলি বলে মিঃ রায় মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য মিসেস গুপ্তা বেয়ারাকে ডেকে দু'কাপ আইসক্রীম অর্ডার দিলেন। তারপর মিঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন—এর মধ্যে কোন সিনেমায় গিয়েছিলেন না কি?

—হ্যাঁঃ, লাইটহাউস আর এলিটের ছবি দুটো দেখেছি। বেশ ভালো লাগলো। বিশেষতঃ আইস্‌ ডান্সটি দেখবার মতো।

দেখেছেন না কি? —উৎসুক হয়ে মিসেস গুপ্তাকে জিজ্ঞাসা করেন মিঃ রায়।

—না। কোথায় আর যাওয়া হলো। এ সপ্তাহে অনেক এনগেজমেণ্ট ছিল। তার উপর মিঃ গুপ্ত এখানে নেই। তাই কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মিসেস গুপ্তা।

—তাই মিঃ গুপ্তকে দেখছি না। বেশ তো, এর মধ্যে তিনি যদি না আসেন চলুন না আমরাই একদিন সবাই মিলে যাই। তারপর কিছুক্ষণ ঘরের অন্যদিকে তাকিয়ে মিঃ রায় একটু উষ্ণস্বরে বল্লেন—মিষ্টার মিটারের কাণ্ড দেখেছেন? এরা কি ভাবে দামী স্যুট-টাই পরাটাই aristocracy—তা নইলে লেডিজদের সঙ্গে আর মেলামেশা চলে না। আমার মনে হয় Plain living and high thinkingই সবচেয়ে ভালো। এই সমস্ত দেখে একেবারে fed up হয়ে গেছি।

—দরকার কি অন্যের সম্বন্ধে আলোচনা করে। বাধা দিয়ে মিসেস গুপ্তা বলে ওঠেন। —ওই দেখুন ভদ্রলোক মিনুর সঙ্গে এইদিকেই আসছেন।

—আচ্ছা, আমি একবার ওই দিকটা রাউণ্ড দিয়ে আসি। মিঃ রায় উঠে চলে যান।

মিনু এসে বলে—রেবাদি, মিঃ অনিরুদ্ধ মিটার আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান—তাই নিয়ে এলাম। মিঃ মিটার—ইনিই হলেন আমাদের রেবাদি—মানে মিসেস গুপ্তা। আর ইনি হলেন মিঃ অনিরুদ্ধ মিটার, আর্টিষ্ট।

একটি ছোট্ট নমস্কার করে মিসেস গুপ্তা বল্লেন—খুব খুসী হলাম পরিচিত হয়ে, বসুন। নিজের পাশের চেয়ারটি এগিয়ে দিলেন। তারপর বেয়ারাকে ডেকে কিছু ড্রিঙ্ক্‌স্ নিয়ে আসবার অর্ডার দিলেন।

মিনু বল্লে—রেবাদির সঙ্গে মিঃ রায় খুব জমিয়ে নিয়েছিলেন। ভদ্রলোক খুব গল্প করতে পারেন।

—উনি কি করেন? মিঃ মিটার জিজ্ঞাসা করলেন।

—তা ঠিক জানি না। তবে পর্য্যটক বলেই তাঁকে জানি।

মিতা ও সীতা মিসেস গুপ্তার পাশে এসে বসলো।—খেলা শেষ তোমাদের ? মিসেস গুপ্তা জিজ্ঞাসা করেন।

—হ্যাঁ রেবাদি, মিঃ ডাটের memory খুব শার্প। একবার মাত্র দেখেই ঢাকা দেওয়া জিনিসগুলির নাম সব ঠিক বললেন। আমাদের কারোরই ঠিক মেলেনি। কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে মিতা হাঁপাতে থাকে।

—মন তো তোমাদের কারুরই ঠিক নেই। মনটা কোথায় আছে বলবো ? সকৌতুকে মিনু বলে।

—বলো না শুনি—সীতা আগ্রহশীল হয়ে ওঠে।

একটু ভেবে মিনু বলে—না থাক। আর বলে কাজ নেই।

এমন সময় মিঃ ডাট্ এসে দাঁড়ালেন। হাতে একটা স্কার্ফ। জিজ্ঞাসা করলেন—এটা কার জিনিস বলুন তো ? অনেকক্ষণ থেকেই আমার হাতে এটা ঘুরছে।

—কারো যখন কোন claim নেই তখন ওটা আপনিই রেখে দিন। কথাটা বলে ডলি হাসতে থাকে।

ট্রে-ভর্ত্তি ঠাণ্ডা গরম পানীয় নিয়ে এসে বেয়ারা দাঁড়ালো। যার যার প্রয়োজন মতন জিনিস তুলে নিল।

মিসেস গুপ্তা মিঃ ডাটের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—আসুন মিঃ ডাট্, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। ইনি হলেন মিঃ মিটার, একজন ভালো আর্টিষ্ট।

মিঃ ডাট্ গম্ভীর ভাবে বল্লেন—আই সি। আপনাকে তো আগে কখনও দেখিনি।

মিনু বললে—উনি Artist। সম্প্রতি ক্যানাডা থেকে এসেছেন। এত তাড়াতাড়ি স্কেচ করছিলেন যে আমাদেরই তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া sportsএও উনি একজন ঝানু লোক। খুব পার্টস আছে বলতে হবে।

—দেখলেন তো, মিনুর এর মধ্যেই সব কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। মিসেস গুপ্তা হেসে বলেন। তারপর মিঃ মিটারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন—আচ্ছা আপনি পোট্রেট করেন, না ল্যাণ্ডস্কেপ্ করেন?

—সব রকমই করে থাকি। মৃদু গলায় জবাব দেন মিঃ মিটার। —আমার একটা অনুরোধ রাখবেন? মিঃ মিটার জিজ্ঞাসা করেন।

—বলুন।

—আপনার একটা ছোট স্কেচ্ নেবো। আপত্তি নেই তো?

—না, না। আপত্তি কিসের। তবে আমার কি ভাল ছবি হবে?

—কেন হবে না। অসুন্দরও তো সুন্দর হয়ে ওঠে রংয়ের তুলিতে। আপনি তো সুন্দরই।

মিঃ ডাট্ একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্যমনস্ক হয়েছিলেন। ডলি, মিতা, সীতা তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালো। তারপর ডলি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলো—কি ভাবছেন মিঃ ডাট?

—ভাবছি কেন Artist হলাম না।

—শেখেননি কেন—ডলি প্রশ্ন করে।

—সময় কোথায়। কাঞ্চনজঙ্ঘার একটা ছবি করেছিলাম। সেই প্রথম আর সেই শেষ। ছোট্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন মিঃ ডাট্।

মিঃ রায় বলেন—চেষ্টা করলে হয়তো আপনিও ভালো আর্টিষ্ট হতে পারতেন।

—তার কোন দরকার নেই।—গম্ভীর ভাবে জবাব দেন মিঃ ডাট্।

মিঃ রায় বল্লেন—আমিও একসময় অনেক চেষ্টা করেছিলাম। বহু জায়গায় ঘুরেছিলাম। কিন্তু শেষে দেখলাম ওসব আমাদের পোষায় না। তাই সব ছেড়ে দিলাম।

—আপনার জীবনে তো অনেক কিছুই ঘটেছে মিঃ রায়! যাবো একদিন আপনার গল্প শুনতে। এখানে তো সব শোনা যাবে না। এক নিঃশ্বাসে বলে ডলি।

—নিশ্চয়ই আসবেন। তবে সে সৌভাগ্য কি আমার হবে?

সীতা বলে—আপনাকে নিয়ে আমরা গর্ব অনুভব করি। কি বল ডলি ?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। সায় দেয় ডলি।—এঁরাই তো দেশের এবং আমাদের গৌরবের বস্তু।

—এই দেখুন আপনার স্কেচ্।—মিঃ মিটার স্কেচ্টা এগিয়ে দেন মিসেস গুপ্তার দিকে।

—রিয়ালি, ওয়াণ্ডারফুল।—সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। মিসেস গুপ্তা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ছবির দিকে।

—আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। একটা appointment আছে। আচ্ছা মিসেস গুপ্তা, আজ চলি। গুড্ ডে।—মিঃ ডাট্ ঝড়ের মতন বেরিয়ে যান।

এমন সময় নীচের পোর্টিকোতে একটা গাড়ী এসে দাঁড়ালো। হর্ণের শব্দে মিসেস গুপ্তা বেরিয়ে আসেন বারান্দায়। গাড়ী থেকে নামলেন মিঃ গুপ্ত। সিঁড়ি দিয়ে সোজা উপরে উঠে আসেন। সামনের হলঘরে একবার থমকে দাঁড়ান। তারপর মিসেস গুপ্তার দিকে চেয়ে বল্লেন—আই অ্যাম্ সরি। অসময়ে তোমাদের ডিস্টার্ব করলাম। Excuse me —বলতে বলতে তিনি ভিতরে চলে যান।

মিসেস গুপ্তা একেবারে নীরব হয়ে যান। সমস্ত হলটা একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যায়। সম্বিত ফিরে আসতে মিসেস গুপ্তা চেয়ে দেখেন হল ফাঁকা। সবাই চলে গেছেন। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন মিসেস গুপ্তা।

মিঃ মিটার তাঁর ড্রইংরুমে সদ্যক্রীত পেঙ্গুইন সিরিজের নভেল পড়ছেন। মুখে তাঁর পাইপ। আসবাবপত্রের বাহুল্য না থাকলেও ঘরখানি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুরুচিসম্পন্ন। একটি শো কেসের মধ্যে নানা রকমের দেশী ও বিদেশী সৌখিন জিনিস সাজানো রয়েছে। কয়েকটি সুন্দর পুতুলও তার মধ্যে স্থান পেয়েছে। কয়েকটি নিজের

হাতে আঁকা পেনটিং দেওয়ালে ঝোলানো আছে। বাড়ির ভিতরে রান্নাঘরে একটি মোড়া পেতে বসে মিসেস মিটার অর্থাৎ রমা দেবী রান্না করছেন। উড়িষ্যাবাসী একটি ছোক্‌রা বেয়ারা—মানে ভৃত্য নীলমণি তাঁকে সাহায্য করছে। বাড়িতে ঠাকুর-চাকর বলতে ওই সবে ধন নীলমণি। তাই সবদিক মানিয়েই তাকে চলতে হয়। সেদিন রমা দেবী কি একটা বিষয় নীলমণিকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, এমন সময় বাইরে কলিং বেল বেজে উঠলো। মিঃ মিটার উঠে দাঁড়ালেন, তারপর রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে নীলমণিকে উদ্দেশ করে বল্‌লেন—"এই নীলু, দেখ তো বাইরে কে লোক এসেছে। আর তোর মেমসাহেবকে বল ছ্যাঁক্‌ ছ্যাঁক্‌ করে রান্না করে কাজ নেই। বড়ার গন্ধে তো ড্রইংরুম ভরে গেল। বাইরের লোকেরা কি মনে করবে?"

"হু, নামাইলে খাইবে কিমন্তি"—আপন মনে বলে নীলমণি।

"যা এক্ষুনি। দরজা খুলে দেখ কে এলো।"—তাড়া লাগান মিঃ মিটার। নীলমণি তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে যায়। বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে এক মুহূর্ত দেখে নিয়ে মিঃ মিটারকে বলে—"কও লোক আঁস্থছি বাবু।"

"অ্যাঁঃ, বলিস কি—মেয়েলোক-টোক আছে নাকি?"—ব্যস্ত হয়ে পড়েন মিঃ মিটার।

"অঁছি বাবু। গুটেক স্থন্দর মাইয়্যা লোক অঁছি পরা।" ঠোঁটের কোণে বুঝি বা একটু হাসিও দেখা যায় নীলমণির। মিঃ মিটার এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। দরজা খুলতেই ছবি, মিতা, সীতা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। কলকণ্ঠে সবাই বলে ওঠে—"বাব্বা, কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি, তবু মিঃ মিটারের আর সাড়া পাওয়া যায় না। বলি মনটা কোথায় পড়েছিল বলুন তো?"

"কি যে বলেন। আপনারা আজ দয়া করে এসেছেন এই আমার পরম সৌভাগ্য। বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য সত্যি আমি দুঃখিত। আশা করি এই ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা করবেন।"

"জানেন, আপনার পেনটিংস্ দেখবার জন্য আজ রেবাদি এখানে আসছেন।" মিঃ মিটারের কথার মাঝখানেই ওরা বলে ওঠে।

"তাই নাকি। তিনিও আসছেন? Really it is nice of her."

"হঠাৎ আপনি এত বিনয়ী হলেন কেন বলুন তো?" ছবি প্রশ্ন করে।

"না—না, তা নয়। মানে গরীবের এই পর্ণ কুটীরে তিনি আসবেন, এতে তাঁর মহত্ত্বই প্রকাশ পায়। ঠিক কিনা বলুন?"

মিতা বলে—"চলুন, আপনার ষ্টুডিও দেখিগে।"—সকলে এসে পাশের ঘরে ঢুকলো। নানা রকমের ছবিতে সাজানো ঘরটি।

"বাঃ, কি সুন্দর এই ল্যাণ্ডস্কেপ্টা, দেখ সীতা—" মিতা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

"সত্যি খুব সুন্দর। আর ফুলগুলো কি সুন্দর হয়েছে। ভারি natural হয়েছে না? দেখে ভারী লোভ লাগে।"

"কেন, মিঃ মিটারকে বল্লেই তো হয়, তোমার একটা পোট্রেট করে দেবেন?" ছবি প্রশ্নবান ছাড়ে।

"আমাদের কি আর সে ভাগ্য হবে। সে সব দিকে রেবাদির লাক্ খুব।"

"বেশ তো, আপনার একটা পোট্রেট না হয় করে দেওয়া যাবে। তাতে আর এমন কি কষ্ট।" সীতার দিকে চেয়ে মিঃ মিটার বলেন।

ছবি দেখা শেষ হলে সবাই আবার ড্রইংরুমে এসে বসলো। এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলেন মিসেস রেবা গুপ্তা। আর তাঁর পেছনে এলেন মিঃ ডাট্ ও মিনু।

"আসতে অনেক দেরী হয়ে গেল মিঃ মিটার? ষ্টুডিও দেখবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলাম না।"

"আসতে তোমার এত দেরী হলো কেন, রেবাদি?"—মিতা বলে

ওঠে। সীতা একটা ছোট্ট চিমটি কেটে মিতাকে চুপ করিয়ে দেয়। তারপর মিঃ ডাটের দিকে একবার কটাক্ষ হেনে মিতার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলো। মিতার ঠোঁটে একটা চাপা হাসি খেলা করে গেল।

"মিঃ ডাট্‌কেও ধরে আনলাম আপনার ছবি দেখতে। এ বিষয়ে ওঁর খুব ইন্‌টারেষ্ট আছে।"

মিঃ ডাট্‌ বিনীত হয়ে বল্লেন—"অসময়ে এসে আপনাদের হয়তো খুব disturb করলাম—Excuse me."

"Certainly not."—মিঃ মিটার কথার মাঝখানে বলে ওঠেন—"আপনারা আসাতে আমি খুব খুশি হয়েছি।"

"আপনাদের কি ড্রিঙ্কস্‌ অফার করতে পারি?"—মিঃ মিটার সৌজন্যতা প্রকাশ করলেন।

"No, thanks—আমরা এইমাত্র খেয়ে আসছি।" মিঃ ডাট্‌ জবাব দিলেন।

"তা কি হয়? হাজার হলেও আপনারা অতিথি। এই বেয়ারা, ইধার আও।" কিন্তু নীলুর কোন সাড়া নেই। মিঃ মিটার এবার কিচেনে চলে আসেন। রমার কাছে গিয়ে বল্লেন—"রমা, নীলুকে একটা কোট পরিয়ে আর মাথায় টুপি পরিয়ে ওঘরে পাঠাবে, বুঝেছো?" তারপর নীলুর দিকে চেয়ে বলেন—"ডাকলে জী হুজুর শুধু বলবি। খবরদার উড়ে ভাষায় কথা বলিস্‌ না—কেমন?" নীলু নীরবে সম্মতি জানায়। তারপর রমাকে বলেন—"তুমি কিছু আলুভাজা আর পেঁয়াজ-বড়া প্লেটে করে পাঠাবে। আর সেই সঙ্গে চা দেবে—কেমন?"

বিরসকণ্ঠে রমা বলে—"সাহেবটি না হয় তোমার বন্ধু হলো। কিন্তু ওই অতগুলো ধিঙ্গি মেয়েও কি তোমার বন্ধু নাকি? আর কি সব ছিরির দেখতে। বলি বিয়ে থা হয়েছে ওদের—না খালি পুরুষদের সঙ্গেই নেচে বেড়ায়।"

"এসব অবান্তর কথার উত্তর দেবার সময় নেই আমার। তুমি এখনো মডার্ণ হতে পারলে না। কাজেই এসব সোসাইটির মর্ম তুমি বুঝবে না। ওই জন্মেই তো ওদের সামনে তোমাকে বের করতেও পারি না।"

"যাক্, আমার দ্বারা ওসব আর হবে না। আর ওদের সামনে বের হতেও চাই না। আমার দূরে থাকাই ভাল। বরং দেখেশুনে একজনকে আধুনিকা স্ত্রী বা বন্ধু করে নিয়ে কাজ চালাও—তাতে বোধ হয় সুবিধা হবে।"

"Don't be silly—যাক্, তাড়াতাড়ি চা-টা পাঠিয়ে দাও।" মিঃ মিটার চলে এলেন ড্রইংরুমে।

"আমরা এইমাত্র আপনার কথাই বলছিলাম, মিঃ মিটার।" মিসেস গুপ্তা বলে ওঠেন। "একা থাকেন—কাজেই কতদিক আপনাকে দেখাশুনা করতে হয়। এদেরও মধ্যে মধ্যে ডাকবেন। এরা আপনার সব ঠিক করে দিয়ে যাবে। আপনি একা—ভারি লজ্জা পাচ্ছি এভাবে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে।"

"কিছু না—কিছু না। এ তো খুব আনন্দের কথা।"

নীলু প্লেট-ভর্তি আলুভাজা ও পেঁয়াজ নিয়ে ঘরে ঢুকলো। মিঃ মিটার উঠে দাঁড়ালেন।

"আমি সার্ভ করি, মিঃ ডাট্ আপনি বসুন। আজ আপনারা আমার গেষ্ট।" খাওয়ার মধ্যে গল্পগুজব চলতে লাগলো। খালি প্লেটের দিকে তাকিয়ে মিঃ মিটার হাঁকলেন—"বেয়ারা, আউর থোরা ফুলারি লে আও।"

"না—না, আর দরকার হবে না।" মিঃ ডাট্ বলে ওঠেন। "আজকের মতন তাহলে উঠি। আমার একটা cocktail party আছে। মিসেস গুপ্তাও যাচ্ছেন তো? টাইমও আর বেশি নেই—চলি।" মিঃ ডাট্ উঠে দাঁড়ান।

"আমারো তো আবার পার্টিতে যেতে হবে। আচ্ছা, আজ

তাহলে চলি মিঃ মিটার। চলুন মিঃ ডাট্।” মিসেস গুপ্তা যাবার জন্য প্রস্তুত হন।

সবাই উঠবার উদ্যোগ করছে এমন সময়ে পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করলেন মিসেস মিটার অর্থাৎ রমা। পরিধানে একটা রঙিন মিলের শাড়ী আর কপালে ছোট্ট একটা কুমকুমের টিপ। পোষাক পরিচ্ছদের বাহুল্য না থাকলেও চেহারার মধ্যে একটা স্নিগ্ধতার আমেজ লাগানো আছে। সকলের বিস্মিত দৃষ্টির মাঝে ছোট্ট নমস্কার জানিয়ে রমা বল্লে—“আমিই মিসেস মিটার। এতক্ষণ রান্নাঘরে আপনাদের চা তৈরি করছিলাম তাই আসতে পারিনি। দেখলাম চলে যাচ্ছেন, তাই এলাম। একটু মিষ্টিমুখ না করে তো যাওয়া হবে না। আজ আপনারা এসেছেন, কত আনন্দ হচ্ছে। চাকরকে বাজারে পাঠিয়েছি, এক্ষুনি এসে পড়বে। আপনারা একটু বরং বসুন—কেমন?” মিসেস মিটার অর্থাৎ রমা দেবীর পরিচ্ছন্ন পরিমার্জিত ব্যবহারে সবাই নিশ্চুপ। মিতা ও সীতার মুখ কেমন যেন বিবর্ণ দেখায়। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মিঃ ডাট্ বল্লেন—“আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুসী হলাম মিসেস মিটার। কিন্তু আমরা জানতাম মিঃ মিটার ব্যচিলার। আপনাকে এ ভাবে কীচেনে আবদ্ধ করে রেখেছেন কেন বুঝলাম না। যাহোক আজ আমরা চলি, বরং আর একদিন এসে আপনার মিষ্টি খেয়ে যাবো, কেমন? নমস্কার।” সবাই একে একে চলে যায়। মিঃ মিটারের মুখে তখন রক্তিম আভা ফুটে উঠেছে—তা রাগে না লজ্জায় বলা কঠিন। উত্তর দেবার ভাষা ভুলে গিয়ে নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলেন মিঃ মিটার।

নিরুপায় মিসেস মিটার হয়তো আবার কিচেনেই পুনঃপ্রবেশ করলেন।

জিজ্ঞাসা ? ?

দার্জিলিংয়ের পুরনো একটি ঘটনা আজ হঠাৎ মনে এলো। অবশ্য অনেক দিনের কথা—সেদিন ছিলো এমনি বাদলার দিন—অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে, কাঁচের শার্সিগুলো বন্ধ করে ফায়ার প্লেসের কাছে বসে একখানা ডিটেকটিভ নভেল পড়ছি। ঠাণ্ডায় হাত-পাগুলো বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মোটা কম্বলটা পায়ে ঢাকা দিলাম, তবুও কি শীত যায় !

বেয়ারা এসে দরজায় নক্ করলে দরজা খুলে দিলাম। সে এসে একখানা চিঠি দিয়ে গেলো—হাতের লেখা আমার ছোট বোন রীণার —সে-ই লিখেছে, "দাদা, আমার বন্ধু জ্যোৎস্না যাচ্ছে, তোমার হোটেলেই ওর থাকবার ব্যবস্থা করে দিও। সম্প্রতি লণ্ডন থেকে এসেছে, কলকাতার গরম সহ্য করতে পারছে না, তাই শৈলাবাসের সঙ্কল্প করেছে। তুমি একটু দেখো যেন কোন অসুবিধা না হয়।"

তখনকার দিনে বিলেত যাওয়া এখনকার মত সহজ ছিল না; কাজেই বিলাত প্রত্যাগতা মহিলারা সৌখিন পর্যায়ের মধ্যে পড়তেন। যাই হোক, রীণার চিঠি পেয়ে একটু রাগও হোলো তার উপর। কারণ, এত শীঘ্র কি করে বন্দোবস্ত করা যায়।

ভদ্রমহিলা কাল এসে পৌঁছবেন, আমার এখানে সব ঘরই প্রায় ভর্তি। আমি থাকতাম সেণ্ট্রাল হোটেলে। এই হোটেলটি ম্যালের কাছে। তাছাড়া দামের দিক থেকেও সুবিধা আছে, খাওয়াও খারাপ নয়। ভাবলাম, দেখি ম্যানেজারকে বলে যদি কিছু বন্দোবস্ত করতে পারি। ম্যানেজার বল্লেন—ঘর তো খালি নেই, একখানা ঘর ছিলো বটে—তাও আজ লোক এসে যাবেন। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক্ করলাম, আমার ঘর বড় আছে, তারই মধ্যিখানে একটা পাতলা পার্টিশান লাগিয়ে নিয়ে বেড রুম করা যাবে এখন। পরে ভদ্রমহিলা পছন্দমত হোটেল খুঁজে নেবেন। এখনকার মত এতেই কাজ চালিয়ে

নিতে হবে, উপায় কি! ম্যানেজার একটা হাল্কা কাঠের পার্টিশান দিয়ে গেলো। একটা সিঙ্গল খাট, আয়না, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি যেটুকু দরকার, সেই মত জিনিষ দিয়ে সাজানো হোলো। একবার মার্কেটে গেলাম, সেখান থেকে কিছু ফুল কিনে নিলাম, আর ভুটিয়াদের চা খাবার ছুটো গেলাস নিলাম। এগুলি দেখতে কতকটা ফুলদানির মত— ফুল সাজালে ভালই দেখাবে। তোয়ালে সাবান ও এটকিনসানের মাথার তেলও একশিশি এনেছিলাম মনে আছে। ঘর সাজানো হোলো। ডিনার খাবার পরে শয্যা নিলাম ঘুমের চেষ্টায়।

নানা রকমের চিন্তা এসে মাথায় জুটলো। মিস্ জ্যোৎস্নার সম্বন্ধে মোটামুটি একপ্রকার ধারণা করে নিলাম। মনে হচ্ছিলো হয়তো বা তিনি খুব সৌখিন হবেন, কে জানে!

একা বেশ ছিলাম, আর তো এভাবে থাকা চলবে না। পাশে থাকবেন সৌখিন মহিলা—তাঁর সঙ্গে আমাকেও একটু সন্ত্রস্ত থাকতে হবে। রীণাটা যত সব ঝঞ্ঝাট বাধায়। ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তা মাথায় এসে জুটলো।

ভোরে উঠেই ঘরখানি বেশ একটু সাজালাম। যেখানে যেটি মানায় সে-টি সেইখানে রাখলাম। মিস্ জ্যোৎস্নার কথা বন্ধুদেরও জানালাম, এবং এসম্বন্ধে অনেক কিছু আলোচনাও হোলো। চোখ বন্ধ করে একবার শ্রীমতী জ্যোৎস্নার মুখখানি ভেবে নিলাম—ফর্সা একটি মুখের মধ্যে জেগে আছে নিবিড় কালো ছুটি চোখ—তাঁর ফর্সা রং আরও উজ্জ্বলতর হয়েছে বিলাতের আবহাওয়ায়। মনটা যে খুসী হোলো, তা বলাই বাহুল্য; তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও একটা ধারণা করে নিলাম। নিশ্চয়ই ফ্রেঞ্চ জরজিয়েট সাড়ী পরবেন—সৌখিন মহিলারা তো তাই পরে থাকেন, নখে লাগানো থাকবে হাল্কা রং—হাতে একটি ভ্যানিটী ব্যাগ, পায়ে হাই হিল স্যু। এ পোষাকের অবশ্য এখন ততটা সমাদর নেই, তবে আগেকার দিনের সৌখিন সমাজে এই সবের বেশী প্রচলন ছিলো।

নানা রকমের চিন্তা এসে মাথায় ঢুকলো, কখন যে ঘুমিয়েছিলাম, জানি না। তবে সকাল থেকেই মনটা চঞ্চল হচ্ছিলো, মনে মনে রীণার ওপর বেশ রাগও হচ্ছিলো ; কেন বাপু, আমার ওপর এই অত্যাচার। বেশ একা আছি—ইচ্ছামত ঘুরিফিরি, কোন ঝঞ্ঝাট নেই। এই এক উৎপাত ঘাড়ে চাপলো। যাক্‌গে, কি আর করা যাবে। বিদেশে ভদ্রমহিলা আসছেন, সঙ্গে কেউ নেই, সত্যি, না দেখলেও তো চলে না। একটু অসুবিধা হলেই বা কি করা যাবে। যথাসম্ভব নিজেকে একটু ঠিকঠাক করে নিলাম। মনে হচ্ছে যেন—হারম্যানের তৈরী স্যুটটাও পরেছিলাম—যাক্‌গে ওসব অবান্তর কথা—হ্যাঁ, তারপরে ষ্টেশনে গেলাম। ঘড়িতে দেখি অনেক আগেই এসে গেছি ; মনটা এত চঞ্চল হচ্ছিলো যে ঘড়িটা যে ফাষ্ট ছিলো, তাও লক্ষ্য করিনি। ঘণ্টা খানেক থাকার পর গাড়ী এসে গেলো। প্রত্যেক কামরা দেখে নিলাম একবার ; কিন্তু কৈ, দেখতে তো পেলাম না ! ভাবলাম, আজকের গাড়ীতে আসেননি। একদল মেয়ে নামলো দেখে এগিয়ে গেলাম, যদি এদের সঙ্গে শ্রীমতী জ্যোৎস্না থাকেন, নাঃ—কোথায় সেই শুভ্রা জ্যোৎস্না ! ! অনেকক্ষণ দাঁড়ালাম, তারপর মন্থর গতিতে এগিয়ে চল্লাম ষ্টেশনের বাইরে। বিশ্রী লাগছিল, আজ লেবংএ রেসে যাবার কথা ছিলো, সব মাটি হয়ে গেলো। একটা সিগারেট ধরালাম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এগিয়ে গেলাম, হঠাৎ শুনতে পেলাম—"এই—ইধার আও। সামলে লে কে।" দূর থেকে একটি ভুটিয়া রমণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেলো—"মিল গিয়া মেমসাব ?" মহিলাটি বল্লেন, "হ্যাঁ।" দেখলাম আমার দিকেই তিনি এগিয়ে এলেন, বল্লেন, "আপনিই কি রীণার ভাই ?" আমি প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্লাম, "হ্যাঁ,—আপনিই কি মিস্ জ্যোৎস্না ?" তিনি বল্লেন, "হ্যাঁ, আমিই মিস্ জ্যোৎস্না।" তাঁর পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে গেলো—ভাবলাম, এই জ্যোৎস্না !! অমাবস্যা নাম হলেই উপযুক্ত নাম হোতো। চেহারার মধ্যে কমনীয়তার

লেশ মাত্র নেই। চুলগুলি বেশ উঁচুতে বাঁধা, মুর্শিদাবাদী ছাপা সাড়ী পরা, হাতে একটি ভ্যানিটী ব্যাগ—চরণে অবশ্য হাই হিল স্যু ছিলো। সঙ্গে একখানা ডবল রিক্‌সা ছিলো—তিনি উঠে বসে আমায় বল্লেন—উঠে পড়ুন, দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন। তখন আমি কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছিলাম, তবুও আমার কল্পনার জ্যোৎস্নাকে এইভাবে দেখবো আশা করিনি। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। এই ভদ্রমহিলার জন্যই এতটা পরিশ্রম করতে হোলো, শুধুই কি নিঃস্বার্থ ভাবেই করেছিলাম। হায়রে !! কি আর করা যাবে, রিক্সাতেই উঠে বস্‌লাম, দ্রুতগতিতে চলেছে রিক্সা। হঠাৎ ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন—কি ভাবছেন বলুন তো ? বল্লাম—নাঃ, বিশেষ কিছু নয়—মানে, আমার হোটেলে আপনার খুবই অসুবিধা হবে। তিনি বল্লেন—আরে—তা কেন হবে আপনি আছেন যখন, অসুবিধা হলে আপনাকে একটু বিরক্ত করবো—আমার কিছু অসুবিধা হবে না। ভেবেছিলাম যদি এঁকে অন্য কোন যায়গায় ব্যবস্থা করে দিতে পারি, তাহলে ঝঞ্ঝাট মিটে যায়। কিন্তু তিনি আবার আমার উপরে যান। হোটেলের রাস্তায় রিক্সা চলতে সুরু করলে—আমি লাফিয়ে নেমে পড়লাম। কারণ, আশপাশের সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয়, তাদের সামনে দিয়ে এই ভদ্রমহিলাকে পাশে নিয়ে যেতে আমার ভীষণ লজ্জা করছিলো—কিন্তু শ্রীমতী জ্যোৎস্নার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি বেশ সপ্রতিভ ভাবেই সুট্‌কেস ইত্যাদি নামিয়ে নিলেন, আমার হাতেও দুএকটা জিনিষ দিয়ে বল্লেন—চলুন। এবার দুজনেই প্রবেশ করলাম হোটেলে। থাকবার সুবন্দোবস্ত দেখে বেশ খুসী হলেন বলেই তো মনে হোলো।

কিন্তু আমার চোখ ফেটে জল আসছিলো। সৌখিন মহিলার উপযুক্ত ঘর সাজিয়েছিলাম—এই ঘরখানি যথাসাধ্য সাজাতে এবং কোথায় কি রাখবো, সেই প্ল্যান করতে বেশ চিন্তা করতে হয়েছিলো। এই মহিলাটির মধ্যে যা চেয়েছিলাম, তা আর পেলাম কই।

যাই হোক, তাঁর মুখ হাত ধোবার জন্য আমারই বাথরুম ছেড়ে দিতে হোলো। চায়ের জন্য "বয়"কে বলে দিলাম। ইজিচেয়ারে বসে একটি সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম—এই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে, এখন কি করা যায়। রাগ হোলো রীণাটার উপর—কেন, তার কি অন্য বন্ধু ছিল না যে, আমার ছুটিটা মাটি করবার জন্য এই অমাবস্যা বন্ধুটিকে আমার ঘাড়ে চাপালে। ভাবলাম, তাকে বেশ একটা কড়া চিঠি লিখে দেবো। আজ ডিনারে দুচারজন বন্ধুদের ডেকেছিলাম জ্যোৎস্নার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো বলে। সব প্ল্যানই নষ্ট হয়ে গেলো—কি আর করা যাবে!

আজ এক সপ্তাহ হোলো শ্রীমতী জ্যোৎস্না এই হোটেলেই আছেন পরম নিশ্চিন্তে, অন্য হোটেলে যাবার তাঁর মতলব নেই। প্রথমে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে খুবই লজ্জা হোতো; কারণ, বন্ধুরা সকলে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে থাকতো আমাদের মুখের পানে। তাদের মুখে ফুটে উঠতো চাপা হাসি। তা আমি বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারতাম। এখন কিন্তু আমার অনেকটা সহ্য হয়ে এসেছে জ্যোৎস্নাকে। তিনিও তাঁর কাছ থেকে এক সেকেণ্ডের জন্য আমাকে তফাত করেন না। তা ছাড়া আমার জিনিষপত্র এখন আর আগের মত এলোমেলোভাবে পড়ে থাকে না। যথাস্থানেই পরিপাটীভাবে গোছানো থাকে। তিনি আমাকে খুবই দেখাশোনা করেন। আমাকে যে বেশ পছন্দ করেন, তা বেশ বুঝতে পারি। কাজেই আমার মনটাও তাঁর প্রতি একটু কোমল হয়েছিল; কাজেই আমার আর তাঁকে আগের মতো মনে হয় না কেন বলুন তো? আমি মনে মনে তাঁর একটি নতুন নামও দিয়েছি 'শ্যামলী', আমাদের বাঙ্গলা দেশে শ্যামা মেয়েই বেশী—ফর্সা ক'টাই বা আর চোখে পড়ে।

চোখ! সে নাই বা হোলো মৃগনয়না—তবুও তার চাহনীর মধ্যে কেমন যেন আকর্ষণী শক্তি আছে। তাকে নিয়ে বেশ এখন ঘুরে ফিরে বেড়াই। এর মধ্যে তার জন্য কিনে একটা প্রেজেণ্টও দিয়ে ফেলেছি—

কি জানেন ? পদ্মরাগমণির একটা পেনডেণ্ট—আর একটা কথা কি মনে হয় জানেন—ও চলে গেলে বেশ কষ্ট হবে। এবং ওর যাবার কথা ভাবতেও খারাপ লাগে। আচ্ছা, বলুন তো, এর নাম কি অনুরাগ ?

রাগ থেকেই কি অনুরাগের উৎপত্তি ?

দোটানা

বাইরে অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। আকাশে পুঞ্জীভূত কালো মেঘে ঢেকে ফেলেছে চারিদিক। অবিচ্ছিন্ন ঝোড়ো হাওয়া বইছে, তারি ছোঁয়া লেগে রুমার পড়ার ঘরের জিনিষপত্র দিচ্ছে ওলট-পালোট ক'রে, তারই কিছুটা বুঝি লেগেছে রুমার বিরহী মনে, সে বসে আছে বাইরের পানে তাকিয়ে, হাতে একটী খাতা-পেন্‌সিল, লিখেছে কবিতা ঃ

দিনগুলি মোর যায় যে কেটে
একলা চেয়ে পথের পানে,
বাদল বায়ে যায় শুনায়ে
কি যে কথা সেই তা জানে।

চার লাইন লিখে রুমা দুবার পড়ে নেয়,—পরের লাইনের কথা আর মনে আসে না, তাই সে তাকিয়ে থাকে বর্ষণমুখর আকাশের পানে। হুঁ—এবার ঠিক হবে,—

যখন আমি একা জাগি,
মেঘের পানে তাকিয়ে থাকি।
আকাশে যে মাদল বাজে,
বাদল সাঁঝে সুর মিলায়ে॥

বাঃ, বেশ মিল হয়েছে। তারপর কি লেখা যায় এবার ? রুমা কিছুক্ষণ ভাবে—দূর ছাই, আর তো কিছু মনে আসে না কি লিখি যে,—নাঃ, এসব কবিতা লেখা আমার দ্বারা হবে না, এ আমার মাথায় আসে না ; এ শুধু পারতেন রবীন্দ্রনাথ, কলম ধরলেই অবিশ্রান্ত কথার ঝরণা ঝরে

পড়্‌তো! আমার শুধু চেয়ে থাকাই সার; ভাব আসে তো ভাষা থাকে না—আর ভাষা যদি বা হয় তো ভাব ফোটে না! যাক্‌গে, আর পারি না। বন্ধ সার্শির কাছে উঠে আসে সে চেয়ার ছেড়ে। কালো মেঘে চারিধারে বৃষ্টিধারা ঝর্‌ছে, বাইরে দুর্যোগ, কাছের মানুষ দেখা যায় না, শুধু গুরুগুরু গর্জনে বিজলী চম্‌কে ওঠে। এই বজ্রের ধ্বনিতে বুকে কাঁপন ধরে মানুষের, রুমা পথ দেখতে পায় এই ক্ষণিকের আলোতে। এমনি দুর্যোগ দেখলেই রুমার কবিত্ব জেগে ওঠে, আকাশ কুসুমের স্বপ্ন দেখে সে। কতক্ষণ যে এইভাবে দাঁড়িয়েছিল তার খেয়াল নেই, মনে হ'লো বাইরে কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে; রুমার ভয় লাগে!

এই দুর্যোগে কে আবার আস্‌বে। বাতাস হবে বোধহয়! কিন্তু তা নয় তো, কে যেন ডাক্‌ছে মনে হচ্ছে। দুরুদুরু বক্ষে রুমা এগিয়ে আসে দরজার সাম্‌নে। দরজাটা অল্প একটু খুলে দেখে, সম্পূর্ণ খোলার সাহস ছিল না।

কি জানি—দিনকাল খারাপ!

বাইরে থেকে মালতী বলে—এই রুমা, দরজা খোল। আচ্ছা ভীতু মেয়ে যা হোক, বাবাঃ, কখন থেকে ডাক্‌ছি, তা মেয়ের খেয়াল নেই। দুজনেই হাসে।

মালতী বলে—কি করছিস ঘরের মধ্যে একা বসে?

রুমা—কি কর্‌বো বাইরে যাবার তো উপায় নেই, তাই ঘরে বসেছিলাম।

—কেন, মাসীমা কোথায়?

—মার কথা তো জানিস। মা এখন বর্ষার উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা কর্‌ছেন! খিচুড়ি, ইলিশমাছ ভাজা ইত্যাদির মধ্যে দিয়েই তো মা কবিত্ব উপভোগ করেন বর্ষার দিনে!

মালতী বলে—রুমা দেবীর বক্ষে বুঝি দোলা লাগে এই ঝড়ের রাতে? দাঁড়া, আমার রেইন কোটটা আগে খুলে রাখি।

রুমা জিজ্ঞেস করে—এমন দিনে মানুষ বেরোয় নাকি, কোথায় যাওয়া হয়েছিল? খেলার মাঠে নিশ্চয়ই?

—হুঁঃ, তোর তো এসবে ইন্‌টারেষ্ট নেই, খালি ঘরের মধ্যে বসে রঙিন্ স্বপ্ন দেখা, আর কবিতা লেখা। আজ বর্ষা, কাল শীত, পরশু বসন্ত, কোন ঋতুই তোর চোখের সাম্‌নে দিয়ে এমনি চলে যাবে না। বাবাঃ, তোর ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভাব্‌লে ভয় লাগে!

—কেন, তোর ভয় লাগে কেন?

মালতী—কেন আবার! ধর, তোর স্বামী যদি হন আসল গণ্ড,—তোর কবিতার রস গ্রহণ কর্‌তে যদি না পারেন। ধর, যদি বর্ষার ঘন কালো মেঘ দেখে তোর হৃদয় ময়ূরের মত নৃত্য ক'রে ওঠে, ছাদে গিয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে থাকিস। আর—কর্ত্তা ভাবেন, কেমন ক'রে জল কাদা বাঁচিয়ে তাড়াতাড়ি আফিসে যাওয়া যায়, আর ঝি এসে বল্‌বে—এক কাঁড়ী ভিজে কাপড় কোথায় শুকোতে দেবো মা? ঠাকুর এসে বল্‌বে—বৃষ্টিতে মাছ আসেনি বাজারে, কি রান্না হবে মা; তখন তোর কবিত্ব থাক্‌বে কোথায় শুনি?

রুমা—তোর যত সব বাজে ভাবনা। কে বিয়ে কর্‌ছে তার ঠিক নেই, বেশ আছি,—দরকার নেই ওসব ঝঞ্ঝাটে!

—তারপর কি খবর বল?

—আজ কার সঙ্গে দেখা হ'লো ফুটবল গ্রাউণ্ডে? রেজাল্ট অবশ্য আমি ঘরে বসেই রেডিও মারফৎ শুনেছি। তা ছাড়াও আমি জানি বৃষ্টি হ'লেই মোহনবাগান গোল দেবে, আর রোদ হলেই ইষ্টবেঙ্গল—দেখিস পরীক্ষা করে, ঠিক বলছি কিনা?

মালতী—তাই নাকি? আচ্ছা রুমা, আজ গেলি না কেন খেলা দেখতে?

রুমা—এই বাদ্‌লায় মা আমাকে একা দিচ্ছে যেতে! চেষ্টা তো করেছিলাম।

মালতী—আজ দেখলাম সেই famous সুন্দরী মিতাকে, with her husband, বেশ একটু গর্ব্ব আছে সুন্দরী ব'লে, না ?

রুমা—কি জানি ভাই, হয়তো থাক্‌তেও পারে—আশ্চর্য নয়তো কিছু, সত্যিই ভা—রি সুন্দর দেখতে !

মালতী—আজ নিতাদি, বিলিদি, ওদের সঙ্গেও দেখা হ'লো। আর কার সঙ্গে দেখা হ'লো জানিস ? তোর সেই "admirer" ভদ্র-লোকটীর সঙ্গে !

রুমা—বিশ্বের ন্যাকা লোক—কি বল্লে আমার কথা ?

মালতী—বিশেষ কিছু না, তবে একটু বেশী খোঁজখবর নিচ্ছিলো। যাই বলিস, সে বেচারার তোর উপর একটু বেশ এট্রাক্‌সান্ আছে। কিন্তু তুই এমন অদ্ভুত ব্যবহার করিস তার সঙ্গে। যাই বলিস ভাই, আমাদের সেদিন খুব সাহায্য করেছিল।

রুমা—কোনদিন বল্ তো ?

মালতী—সেই যে আমরা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম—মাঝ্-রাস্তায় সে-কি-ভীষণ ঝড় বৃষ্টি এলো, মনে আছে ? Purseও সঙ্গে ছিল না, তাড়াতাড়িতে ফেলে গিয়েছিলাম। তোর মনে নেই ? কি ভীষণ লজ্জা পেয়েছিলাম সেই দিন। ব্যাপার দেখে ভদ্রলোকটী আমাদের এখানে পৌঁছে দেন।

রুমা—হুঁঃ, মনে নেই আবার, আলাপ শুরু করেই বল্লেন, তিনি ছোট বেলায় আমার সঙ্গে স্কুলে পড়েছিলেন—তার কতদিন পরে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তাই তো তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন। আশ্চর্য ! আমার কিন্তু কিছু মনে ছিল না।

মালতী—দেখ তো রুমা বৃষ্টি পড়্‌ছে কিনা, একটু কমেছে মনে হচ্ছে না ? এবার যাই—মা ভীষণ ভাববেন। তার উপর ছোটমামা এসে তো সব সময় উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন,—কি করা উচিত এবং কি করা আমার ঠিক্ নয়। আগেকার দিনের লোক তো, পুরনো দিনের রীতিনীতি ভাল লাগে, এ যুগের কিছুই তাঁর ভাল লাগে না—মহামুস্কিল !

রুমা—তা হলে বেশ জব্দ এখন, কেমন? একটু বোস্ না, বেশ লাগ্‌ছে গল্প কর্‌তে। আচ্ছা মালতী, কেমন লাগে তোর এই ভদ্রলোকটীকে?

মালতী—কোনটী? সেই ন্যাকা ভদ্রলোকটী নাকি? তা—ভালই লাগে, ছেলেদের যে সকল গুণ থাকা দরকার সবই আছে, নেই প্রচুর অর্থ। তবে নিজে তো বেশ উপায় করে, কথাবার্ত্তাও বেশ ভাল,—তোর কেমন লাগে?

রুমা—চুপ কর্, মা আস্‌ছে! রুমা তার কবিতাটী নিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

মালতী—কই দেখি কি লিখলি? কবিতা লেখা হচ্ছে বুঝি? দে আমার হাতে। বাঃ-রে, বেশ হয়েছে তো! সত্যিই দেখছি তুই কবি হয়ে গেছিস্! দাঁড়া, তার পরের লাইনটী দেখি,

যখন আমি একা জাগি,
মেঘের পানে তাকিয়ে থাকি,
আকাশে যে মাদল বাজে
বাদল সাঁঝে সুর মিলায়ে॥

সত্যি! ছন্দটা বেশ ভাল হয়েছে।

—আকাশে যে মাদল বাজে
বাদল সাঁঝে সুর মিলায়ে॥

তারপর কি হবে?

রুমা—এখনও শেষ হয়নি, ভেবে লিখতে হবে তো। সবটা লেখা হোক্—তারপর শোনাবো এখন।

মালতী—আমি এসেই বাধা দিলাম বুঝি?

রুমা—না, না, তুই এসে তো ভালই করেছিস্, একটু গল্প করা যাক্।

রুমার মা এসে ঘরে ঢুক্‌লেন, বল্‌লেন—মালতী এসেছো? ভালই হ'লো, রুমা তো ম্যাচ দেখতে যেতে পারেনি বলে রাগ করেছে

আমার উপর। বল তো মা, এই দুর্যোগে কখনও বেরোনো যায়? চারদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি আস্‌ছে, কি ক'রে বেরোতে দেব ওকে। তা—তুমিও কেন বেরিয়েছিলে এই দুর্যোগে? ও, খেলা দেখ্‌তে বুঝি? বোসো, গল্প করো তোমরা, আমি সাঁতলাভাজা করেছি—পাঠিয়ে দি। মালতী, তুমি আজ রাত্রে এখানে খেয়ে যাবে, তোমার মেসোমশাই পৌঁছে দেবেন তোমাকে।

রুমা বল্লে—হ্যাঁ মালতী, সেই ভাল হবে, বাড়ীতে জানিয়ে দে একটু ফোন করে, মা তো ছাড়বেন না। আজ বর্ষার উপযোগী নানা রকমের রান্না হয়েছে, তা আমরা উপভোগ কর্‌লেই মা খুশী হবেন।

মা বল্লেন—তোমরা বোসো, আমি যাই একটু রান্না ঘরে।

মালতী বল্লে—আমি থাক্‌তে পারি একটা 'কণ্ডিসানে'।

রুমা—কি বল্‌ না?

মালতী—তোর একটা গান শোনাতে হবে। গাইবি তো?

রুমা—মেয়ের সখ দেখো একবার। আগে ভাল ক'রে সাধ্য সাধনা কর, তারপর বল্‌বো। গলা খারাপ, ঠাণ্ডা লেগেছে, ডাক্তারের অর্ডার নেই ইত্যাদি অভিযোগের পর—দু চার লাইন শুন্‌তে পারিস।

মালতী—করজোড়ে আমি তোমায় বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি, দয়া করে একটী গান শুনিয়ে আমার হৃদয়ের তৃষ্ণা দূর করো। কেমন এবার হ'লো তো?

রুমা হেসে বল্লে—আচ্ছা গো আচ্ছা, আর বিনয়ে কাজ নেই। কোন গানটা বল্‌ না, মনেও আসে না একটা কাজের সময়।

মালতী—সেই গানটা কর্‌ না—

"দুটো মিষ্টি কথা শুন্‌তে এলাম
বিষ্টি ঝরা রাতে
আর কিছু নয় কিছু সময়
কাটিয়ে যাব সাথে।"

রুমা—ইস্, তুই যে বেশ কবি বনে গেছিস দেখছি! আচ্ছা গাচ্ছি। আমার সঙ্গে ধর, সবটা মনে নেই আমার। সত্যি গলার অবস্থাও ঠিক্ নেই।……দুজনে গান শুরু কর্‌লে।

বেয়ারা এসে জানালে—বাহার মে এক সাব্ আয়া হ্যায়।

রুমা বল্লে—কিস্‌কো মিল্‌নে মাঙ্গতা?

বেয়ারা—মিস্ সাব—আপকো মিল্‌নে মাঙ্গতা, এহি নাম লিখ্ দিয়া।

রুমা কার্ডখানা হাতে নিয়ে বল্লে—তরুণ হ্যাজ্ কাম, মালতী!

আচ্ছা, সাবকো ইধার লেয়াও।

বেয়ারার সাথে প্রবেশ কর্‌লে তরুণ।

রুমা—এই যে তরুণবাবু, কি খবর আপনার, বহুদিন তো দর্শন-লাভ ঘটেনি, ভাবলাম বুঝি ভুলে গেছেন……মুখের পানে তাকিয়ে হাস্‌লে রুমা।

তরুণ—একি! আমি আস্‌তেই গান বন্ধ কর্‌লেন কেন? বেশ তো সময়োপযোগী গানটা হচ্ছিল, আমি এসে রসভঙ্গ কর্‌লাম। ধরুন গানটা, সম্পূর্ণ শোনা হলো না যে।

রুমা কৌতুকের হাসি চেপে বল্লে—আচ্ছা বলুন তো আপনি এমন দুর্যোগে এখানে কেন এলেন! পথ ভুলে না কি?

তরুণ—কেন বলুন তো? এসে বুঝি বিরক্ত কর্‌লাম আপনাকে?

মালতী—না, না, তরুণবাবু, রুমার কথা শুনে লজ্জা পাবেন না। আমি আপনার দিকে আছি। বসুন, ব্যাপার কি বলুন তো? রুমার দরজার কাছে এসেই খুব জোরে বৃষ্টি নাম্‌লো, তখন আর বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজে লাভ কি বলুন?

লজ্জিত মুখে তরুণ বলে—ঠিক্ তা নয়, তবে কতকটা সত্যি বটে। রুমার বইগুলো ফিরিয়ে দিতে এসেছিলাম, অনেক দেরী হয়ে গেলো, কি ভাবছেন আমাকে জানি না।

রুমা—এসেছেন ভালই তো হয়েছে,—আমরা খুব খুশী হয়েছি।

মালতীকে অত কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন কেন? ওকে চেনেন না আপনি?—ডেঞ্জারাস্ মেয়ে!

মালতী—এই তো আপনাকে রুমার কত খবর দিলাম। রুমা বেশ ভাল আছে। আরও যা বলেছিলাম—তা আর প্রকাশের দরকার নেই, কি বলেন? দেখুন—রুমার মুখখানা, খুশীতে ভরে গেছে। কেমন মিষ্টি দেখাচ্ছে দেখুন?

...তরুণ নিঃশব্দে হাসে, ভাষার দিক থেকে কোন উত্তর না পেলেও মালতী তরুণের মুখের যে ভাবটী দেখতে পায়, তাইতে সে মনের রূপটী সুস্পষ্ট বোঝে। বলে—আসেন না কেন এখানে? রুমা বেচারা একা থাকে, একটা ভাই বোনও নেই যে ঝগ্‌ড়া করে খানিকটা সময় কাটায়। কবি মানুষ তো—জানালার ধারে ব'সে কবিতাই লিখে যাচ্ছে। এই আঁধার বর্ষণ বেলায় একা বসে থাকা, হায়! সে কি কঠিন! কি বলেন তরুণবাবু? ওর মন এখন ছুটে চলেছে কোন এক নির্দিষ্ট সংকেত স্থানে, বুঝ্‌লেন তো ব্যাপারটী? যদিও আমি কবি নই, তবে কবির সহচরী বল্‌তে পারেন। আপনিও কবিত্বের রস বেশ গ্রহণ করতে পারেন, কবি-মনের পরিচয় পেলাম আজ।

তরুণ হেসে বল্লে—কেমন ক'রে পেলেন বলুন তো?

মালতী—তবে একটু কবিত্ব ক'রেই বলি; আজ "পথ ভুলিবার বেলা—মন হারাবার খেলা!" দূর হতে দূরে অজানা হতে অজানায় মনের অভিসারে, এই বাদলার দিনে মন বাধা মান্‌ছে না,—বলুন ঠিক কিনা?

তরুণ বলে—বাঃ, বাঃ, আপনি দেখছি সাংঘাতিক কবি,—এমন প্রতিভা আছে আপনার তা তো জানতাম না, আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনি কবিতা লেখেন নাকি? একটা ছোট্ট দেখে শোনান দেখি!

মালতী বলে—কি বল্‌ছেন আপনি, আমার মত একটী নীরস

লোককে কবি ভেবেছেন ? কবে বসন্ত চলে গ্যাছে জীবন থেকে, বয়স হচ্ছে তো।

রুমা—না, না তরুণবাবু, please দেখবেন না। আপনি পণ্ডিত মানুষ, এসব আপনার দেখবার উপযুক্ত নয়,—এতে ভাবও নেই ভাষাও নেই, শুধুই কালির আঁচড় !

তরুণ—দেখুন, কবি বলেছেন, কাব্যের যে প্রেরণা মানুষের মনে আসে সে, অনুভূতি বুদ্ধির পথ ধরে চলে না। ভাষায় এর স্বরূপ বোঝানো যায় না। অনুভূতি প্রকৃতির মতই মূক হয়ে আসে। কবির মন একান্তই নিজের, লৌকিক নয়, সামাজিক নয় ; একেবারে নিজস্ব, কোন বাধা মানে না।

মালতী—বাঃ, আপনার মত সমঝ্‌দার যদি মেলে তবে রুমার কল্পনা আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌বে। তা···আপনিই না হয় অসমাপ্ত লাইন কটা করে দিন।

রুমা—তোরা একটু গল্প কর মালতী, আমি এখুনি আস্‌ছি।

মালতী—গল্প কর্‌ছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি আস্‌বে। কোন কাজে যাওয়া হচ্ছে শুনি ? ওঃ, বুঝেছি, আচ্ছা যাও।

তরুণ—(বিস্মিতভাবে)—ব্যাপার কি ? এসব হেঁয়ালী তো বুঝ্‌তে পারছি না !

মালতী—(হেসে) ক্রমশঃ প্রকাশ হবে। কি খবর বলুন—তরুণ বাবু ?

তরুণ—কিসের খবর জান্‌তে চান বলুন ? খবর তো অনেক আছে,—খেলার খবর, সভাসমিতি, নাচ গান, সিনেমা, পার্টি, হরেক রকম খবর। কোনটী বল্‌বো, তাই বলুন ?

মালতী—সেদিন নিউ এম্পায়ারে মঞ্জুর নাচ কেমন দেখলেন ? যাননি দেখতে ?

তরুণ—হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। আপনারাও নিশ্চয়ই গিয়েছিলেন ? কিন্তু ভীড়ের মধ্যে আপনাদের খুঁজে পেলাম না। আপনার কেমন লাগ্‌লো ?

মালতী—ওর নাচে দক্ষিণী মুদ্রার প্রভাব আছে খুব বেশী।

তরুণ—ভাল লাগে, তবে গুজরাটী বা মণিপুরী নাচের চালটী আমার বেশী ভাল লাগে। তবে এও ভাল। নাচের মধ্যে যে কাহিনীটী আছে তার রূপ প্রকাশ পায় দেহভঙ্গিমার মধ্যে, তার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় মনের কথাটি চোখের দৃষ্টিতে, আঙুলের মুদ্রায়, পায়ের ছন্দে,—নয় কি?

মালতী—যাই বলুন না কেন, তাই বলে জিমন্যাষ্টিককে নৃত্য বল্‌বো না। তাছাড়া ভা—রি অহঙ্কার ওর, রেবার নাচ আমার অ—নে—ক ভাল লাগে।

তরুণ হাত ঘড়িটার পানে তাকিয়ে বল্লে—ওঃ, অনেক দেরী হয়ে গেল! ৭টা বেজে গেল, এবার ওঠা যাক্! রুমাকে একটু জানিয়ে দেবেন, আমার অন্য এক জায়গায় যাবার কথা আছে, তাই বস্‌তে পারলাম না, আর একদিন আস্‌বো।

মালতী—দাঁড়ান একটু, কতদিন পরে এলেন, এমনি চলে যাবেন? রুমা দুঃখ পাবে যে!

ঠিক এই সময় রুমা প্রবেশ কর্‌লে ঘরে। বেয়ারার হাতে চায়ের সরঞ্জাম, রুমা নিজের হাতে মিষ্টির থালা সাজিয়ে এনেছে।

মালতী—এই যে রুমা এসেছে। দেখ, তরুণবাবু এক্ষুনি চলে যেতে চাচ্ছিলেন—আমি ধরে রেখেছি, এবার তরুণবাবু বোঝাপড়া করুন, আমি আস্‌ছি একটু মাসীমার কাছ থেকে।

রুমা বল্লে—চা খেয়ে যাস্, বস্ না একটু।...তারপর তরুণের পানে তাকিয়ে বল্লে—আপনার যাবার সময় এত 'পাঙ্‌চুয়্যালিটী', আমি আশা করিনি, তা হলে না এলেই পারতেন!

তরুণ—কেন আস্‌বো না? এমন বাদ্‌লা দিনে বন্ধু বান্ধবীর বাড়ীতে না যাওয়াটা তো আমি অপরাধ বলে গণ্য করি।

রুমা—তা আসেন কোথায়? আচ্ছা, একটু চা খান। তার পরে ঝগ্‌ড়া কর্‌বো। অবশ্য এটা চায়ের সময় নয়, তবুও বাদ্‌লার

দিনে ভালই লাগ্‌বে। ঘরের তৈরী চপ্ একটা খান, মা নিজেই সব তৈরী করেছিলেন, আমি একটা ভেজে আনলাম।

মালতী—তবেই হয়েছে, তোমার হাতের চপ্ তো? একদিন খেয়েছিলাম মনে আছে!

রুমা—আচ্ছা, সেদিন না হয় খারাপ হয়েছিলো। আজ দেখ না একটু টেষ্ট ক'রে। না খেয়েই নিন্দে কর্‌ছিস! তারপর খবর কি বলুন তরুণবাবু?

তরুণ—হ্যাঁ, এতক্ষণ তো একটা খবর নিয়ে আমাদের আলোচনা হচ্ছিল। আপনি কি খবর জান্‌তে চান?

মালতী—ও জান্‌তে চায় আপনার খবর!

তরুণ—আমার খবর, হ্যাঁ, একটা খবর আছে সেই মার্চেন্ট অফিসের কাজটা সম্ভবতঃ হয়ে যাবে, ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে, startingও ভাল।

মালতী—দেখুন তো এমন খবরটা আপনি চেপে রেখেছিলেন। কন্‌গ্রাচুলেশান্ জানাচ্ছি!

রুমা—কিন্তু, এখন থেকেই পড়া ছেড়ে দেবেন?

তরুণ—না, পড়াও চল্‌বে, পরীক্ষার তো অনেক দেরী আছে, দেখি কাজটা আমার স্ট্যেটেব্‌ল্ হবে কিনা। তারপর ভেবে দেখে যা হয় করা যাবে।

রুমা—এতে আপনার কি খুব পরিশ্রম হবে না?

তরুণ—তা কি করা যাবে বলুন। পয়সা না থাক্‌লে আপনাদের এখানে আমার স্থান হবে না।

রুমা একান্ত উদাসীন ভাবে তরুণের মুখের পানে তাকিয়ে বলে—এ ধারণা আপনার কতদিন থেকে হলো?

তরুণ—তা হলো কিছুদিন থেকে। বুঝলাম জীবনযাত্রার মান বাড়াতে হলে চাই অর্থ, তার জন্যে পরিশ্রম কর্‌তে হবে, তা না হলে তো এমনি থেকে পয়সা আস্‌বে না।

মালতী—সত্যি, আপনার এই তরুণ বয়সে কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি, আধুনিক যুগকে আপনি ঠিকমত জেনেছেন।

মালতীর মন্তব্যে রুমা আরক্ত মুখখানি নামালো। ঝি এসে মালতীকে জানালো মা ভেতরে ডাকছেন।

ঝির সঙ্গে মালতী ভেতরে গেল।

তরুণ রুমাকে বল্লে—একদিন আমায় আস্‌তে বলেছিলেন, হয়তো আস্‌তাম, কিন্তু এই ঝড় বাদলে কেন এলাম বলুন তো?

রুমা কপট বিস্ময়ে বলে—আমি কেমন করে জান্‌বো? কিছুই জানি না।

তরুণ—কিন্তু আমার মন বলে আপনি জানেন।

রুমা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিমায় বলে—Thought read কর্‌তে পারেন দেখছি।

তরুণ বলে—দেখছেন তো, আপনার মনের গোপন কথা আমি জান্‌তে পারি।

রুমা—যান্, আপনি ভীষণ চালাক, মনের কথা সব বুঝতে পারেন!

তরুণ—আরে, রাগ করেন কেন, এ আমার চালাকি নয়, বরং বল্‌তে পারেন অনুভূতি,—এ বোঝা যায়; অন্ততঃ ভাবতেও ভাল লাগে!

রুমা—বাঃ বাঃ, কবিতা লেখেন নাকি আপনি? কবিদের তো কল্পনাই মূলধন!

—শোন রুমা, আমি ভাব্‌ছি তোমার বাবার কাছে আমাদের বিয়ের কথাটা প্রপোজ কর্‌বো, কিন্তু সাহস হয় না।···তোমাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য আছে অনেক···তবে, তোমার দিক থেকে আপত্তি হবে না তো?—ব'লে তরুণ রুমার দিকে উত্তরের জন্য তাকিয়ে থাকে।

রুমা হেসে বলে—যা সহজলভ্য সেইটাই তো ভাল।

ঘড়িতে ৮॥টা বেজে গেল। আজ চলি রুমা—তরুণ বল্লে।

—আবার কবে আস্‌বেন ? রুমা বল্লে।

স্বভাবসুলভ স্মিতহাস্যের দ্বারা তরুণ রুমাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লে—আস্‌বো শীঘ্রই।

তরুণ তাড়াতাড়ি নেমে গেল পথের দিকে।

* * *

ঢাকা বারান্দায় কয়েকটী বেতের চেয়ার টেবিল রাখা আছে। এক গোছা রজনীগন্ধা আছে বড় একটী ফুলদানীতে। শচীন দে—ব্যারিষ্টার বসে আছেন একটী চেয়ার দখল ক'রে। পাশে বসে মিসেস দে অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী মল্লিকা দেবী নিটিং কর্‌ছেন।

মিঃ দে বল্‌লেন—"Next week-এ আমাকে বোধ হচ্ছে পুরীতে যেতে হবে কাজে।"

মল্লিকা দেবী নিটিংটা কোলের উপর রেখে স্বামীর মুখের পানে তাকিয়ে একটু হেসে বল্‌লেন—"আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।"

মিঃ দে বললেন—"সে কি করে হবে ? আমি দু দিনের জন্য কাজে যাচ্ছি, clientরা নিয়ে যাচ্ছে, তারাই খরচ দেবে।"...তারপর হেসে বল্লেন—"পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নইলে খরচ বাড়ে।"

মল্লিকা দেবী কপট রাগ দেখিয়ে বল্‌লেন—"সে সব আমি ঠিক করে নেব এখন। তুমি একটা ভাল হোটেলে টেলিগ্রাম করে দাও, আমাদের সব বন্দোবস্ত করে রাখ্‌বে। কোন তীর্থে তো নিয়ে যাও না। তুমি সাহেব মানুষ, দার্জিলিং, নৈনিতাল, মুসৌরী ছাড়া তো অন্য জায়গায় যাবে না। যদি বা একবার যোগাযোগ হয়েছে—তা আমি ছাড়ছি না বলে দিলুম। কেমন, রাজি আছো তো ?"

মিঃ দে বল্লেন—"উপায় যখন নেই, তখন সন্ধি কর্‌তেই হবে।"

"তাহলে সামনের শুক্রবার ভাল দিন আছে, সেই দিনই বেরিয়ে পড়া ভাল। গোছাবার তো কিছু নেই ; শুধু একটী ছোট সুটকেস সঙ্গে নিলেই হয়ে যাবে।"

"কিন্তু গিন্নি, পুরীতে সমুদ্র-স্নানটাই আসল attraction ;

স্নানের পোষাকটা নিতে ভুল না যেন”—মিঃ দে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মিসেস দে-র পানে তাকিয়ে হাসলেন।

“কি যে ছেলেমানুষী করো! পাশের ঘরে মেয়ে বসে আছে, লজ্জা করে না?”

মিঃ দে কথা পাল্‌টিয়ে নিয়ে বল্‌লেন—“আচ্ছা, আজ তরুণ এসেছিল? পথে দেখলাম তাকে!”

মল্লিকা দেবী বল্‌লেন—“হ্যাঁ, এসেছিল কিছুক্ষণ আগে, চলে গেছে। ওর নাকি কোন মার্চেণ্ট অফিসে কাজ হয়েছে শুনলাম।”

শচীন—“তরুণ ছেলেটী ভাল। মার্চেণ্ট অফিসে কাজ হয়েছে জেনে খুশী হলাম। ওখানে ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে। আর, রুমাও পছন্দ করে ওকে।”

মল্লিকা—“হুঁঃ, রুমাও পছন্দ করে, আর তার বাবাও কম পছন্দ করেন না—তা আমি বেশ বুঝি। কিন্তু সে হবে না। আমার ঐ একটা মেয়ে। আমাদেরও তো ইচ্ছা করে উপযুক্ত জামাই কর্‌তে। কলকাতায় থাক্‌তে গেলে যেগুলি না হ’লে আমাদের সোসাইটীতে চলে না—সেগুলি কি তরুণের আছে? শুধু ছেলে ভাল হলেই তো সব হোল না!”

মিঃ দে চুপ করে থাকেন, কিছু বলেন না।

রুমা এসে বল্লে—“মা, মালতীর তোমার রান্না ভীষণ পছন্দ হয়েছে, সে বলেছে একদিন এসে তোমার কাছে মাংস রান্না শিখে যাবে। সাম্‌নের সপ্তাহে আমরা পিক্‌নিক্ কর্‌বো ডায়মণ্ডহারবারে। আমাকেও একটা ভাল রান্না শিখিয়ে দিও। আমরা প্রত্যেকে একটা করে নতুন রকমের রান্না সঙ্গে নিয়ে যাব।”

মিঃ দে হেসে বলেন—“এই সব আয়োজন হচ্ছে বুঝি তরুণের কাজ হয়েছে বলে?”

রুমা লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকে ওঁর দিকে তাকিয়ে।

মিঃ দে বলেন—“রুমা-মা, আমাকে পুরী যেতে হচ্ছে একটা

কাজেতে। আর তোমার মাও চলেছেন—পুণ্যার্জন করতে। চল, একবার ঘুরেই আসা যাক্। দু চার দিনের জন্য পুরীতে ভালই লাগ্‌বে।”

রুমা—“সত্যি আপনি যাচ্ছেন? আমার খুব ভাল লাগে সমুদ্র দেখতে। কবে যাচ্ছেন?”

মিঃ দে—“আগামী শুক্রবারেই যাচ্ছি, তোমরা তৈরী হয়ে নিও। সঙ্গে শুধু কাপড় নিয়ে গেলেই হবে, আর সব হোটেল থেকেই পাওয়া যাবে। তোমার পিক্‌নিক্ আর হোল না এর মধ্যে।”

রুমা বলে—“তার জন্যে কিছু হবে না। দিন তো কিছু স্থির হয়নি। এসেই করা যাবে এখন। আচ্ছা, সত্যি আমরা যাচ্ছি তো?”

মল্লিকা—“সত্যি নয়তো কি? যখন সুযোগ পাওয়া গেছে আমি ছাড়ছি না!”

রুমা—“বাবা, তরুণবাবু বল্‌ছিলেন আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসবেন একদিন।”

মিঃ দে—“বেশ তো, একদিন চায়ে ডাকলেই হবে।”

মল্লিকা—“সাম্‌নেই একটা ছুটী আস্‌ছে, ফিরে এসে ওদের ডাক্‌বো, কি বলো?”

রুমা—“সেই ভাল।” রুমা ঘর থেকে চলে যায়।

মিঃ দে চিন্তিত মুখে বসে থাকেন। “কি ভাবছো বল তো” —মল্লিকা দেবী জিজ্ঞেস কর্‌লেন।

“ভাবছিলাম—তরুণ ছেলেটী সব দিক থেকে রুমার উপযুক্ত, দেখতে শুনতেও ভাল। বিয়ে হলে এরা দুজনেই সুখী হতো! আমাদেরও তো একটা মেয়ে, কাছেই থাক্‌বে। ওকে শ্বশুর বাড়ীতে পাঠালে আমরা থাক্‌বো কি নিয়ে! তুমি একটু ভাল করে ভেবে দেখ বরং!”

মিসেস দে বল্লেন—“আমার ঐ একটা মেয়ে, তার বিয়ে দেবো তরুণের মত ছেলের সঙ্গে? কলকাতায় একটা ঘর বাড়ী নেই;

এখনো তো সে ষ্টুডেণ্ট্‌ ! উপায়ও কিছু করে না। কি করে যে তুমি ওর কথা বলো তা জানি না বাপু। রুমির বিয়ে দিয়ে একটু সাধ আহ্লাদও করতে দেবে না আমায়? বিন্দি ঠাকুরঝি একটী ভাল সম্বন্ধও এনেছে—সে আসবে তোমার কাছে। ছেলে যেন রাজপুত্র, মস্ত বড় লোক তারা।"

মিঃ দে—"সব তো বুঝলাম গিন্নি; কিন্তু রুমির মনের ইচ্ছাটা কি তুমি বুঝতে পারো না? আমাদের যা আছে ওদের অভাব হবে না—একটা মেয়ে তোমার, ছেড়ে থাকতে পারবে কি তুমি?"

মল্লিকা—"তুমি আর মেয়েকে নাচিও না, আমার রুমির মত মেয়ের কি ভালো পাত্রের অভাব হবে? শুধু বিয়ে দিলেই হয় না। সকল দিক ভাবতে হয়। এ বিষয়ে আমার বুদ্ধিটুকু নিও।"

মিঃ দে আর কিছু বলেন না। নীরবে তাকিয়ে থাকেন। মনে মনে কি যেন ভাবতে থাকেন।

চৌকিটা বারাণ্ডার সামনে রেখে কাগজ পেন্‌সিল নিয়ে কি যেন আঁকছে তরুণ।

ঢোকবার পথে রুমা এসে দাঁড়ায়—তরুণের কাঁধের পাশ থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে—"ওমা, এসব কি? কি ফুলপাতা আঁকছেন—আমি ভাবলাম বুঝি কারো ছবি আঁকছেন। বাঃ—কি মনোযোগ!! মানুষ এসে দাঁড়ালেও হুঁস হয় না।"

তরুণ মুখ তুলে রুমার পানে তাকায়, বলে—"তুমি এসেছো তা অনুভব করছিলাম। ভয় হয় যদি পালিয়ে যাও তাকালে। তা হঠাৎ যে এখানে? কি মনে করে?"

"কেন, আসতে নেই নাকি?"

তরুণ বলে—"না, না; তা নয়। ভুল বুঝো না আবার। আচ্ছা, আর ঝগড়ায় কাজ নেই—চলো ঘরে। একটা মুখ এঁকেছি দেখবে চলো।"

রুমা—"কার মুখ এঁকেছেন ?"

তরুণ—"তা কি করে বলবো ! দেখি চিনতে পারো কি না।"

তারপর ঘরের কোণ থেকে ছবিটী বার করে আনে তরুণ, ঢাকা-টা খুলে ফেলে বলে—"দেখো তো চিনতে পারো কি না ?"

রুমা হেসে বলে—"চেনা কঠিন নয়, তবে অসুন্দরকে বেশী সুন্দর করেছেন।" লজ্জিত মুখে সে তাকিয়ে থাকে ছবির পানে।

তরুণ—"একটু বসবে, ছবিটা শেষ করে নিই।"

রুমা—"আচ্ছা, সে হবে এখন—আজ এলাম আপনার কাছে বিদায় নিতে।"

তরুণ বিস্মিত ভাবে বলে—"তার মানে ?"

রুমা বলে—"পুরীতে যাচ্ছি।"

তরুণ—"হঠাৎ যাচ্ছো যে !"

"বাবা যাচ্ছেন কাজে, মা যাচ্ছে পুণ্য অর্জন করতে। আর আমি যাচ্ছি সমুদ্র-স্নানের লোভে।" রুমা হেসে ওঠে।

তরুণ—"সমুদ্র তীরে তোমার কবিত্বের খোরাক অনেক মিলবে। তার উপরে এই পূর্ণিমার রাত্রি ! বালুকা-বেলায় বসে ঝিনুকের মালা গাঁথবে। দেখো, মনটা যেন ফেলে এসো না ওখানে।"

রুমা হেসে বলে—"মন আমার সঙ্গেই থাকে। আচ্ছা, আপনি হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে কি চিন্তা করছেন বলুন তো ?"

তরুণ—"ভাবছি, ছবিটা আমার মাঝপথেই বাধা পড়লো ; কবে যাচ্ছো তোমরা ?"

রুমা—"কালই যাচ্ছি, শীঘ্র ফিরে আসবো, তারপরে পিক্‌নিক্ হবে ; আর—বাবা আপনাকে চা'য়েতে ডাকবেন—বুঝেছেন ?"

তরুণ উৎসাহে বলে ওঠে—"হ্যাঁ, বুঝেছি—তবে অনুমতি পাবো তো ?"

রুমা সলজ্জ দৃষ্টি নামিয়ে বলে—"তা আমি কি জানি।"

তরুণ বলে—"কেন বলছি তা বুঝেছো নিশ্চয়ই।"

রুমা ধীরে ধীরে বলে—"আমার মত নেই ভাবছেন তো? ওসব ভাববেন না। অমত কারুর হবে না।"

তরুণ—"আমি তো সব দিক থেকে তোমার উপযুক্ত নই। আমার তিন মহলা বাড়ীও নেই আর নতুন মডেলের গাড়ীও নেই। সেইজন্মেই তো ভাবি, তোমাকে শেষে কষ্ট পেতে না হয়। এইসব কারণেই মনে হয় তোমার বাবা মার সম্মতি যদিও বা পাওয়া যায় তা আন্তরিক হবে না।"

রুমা—"আচ্ছা, আজ যাই। বাবা অপেক্ষা করছেন, দোকানে যেতে হবে।"

তরুণ বলে—"ষ্টেশনে যাবার অনুমতি পাবো কি?"

রুমা বলে—"যাবার সময় মন খারাপ করে দিতে নাই বা গেলেন! আচ্ছা, আজ তবে আসি।" ধীরে ধীরে রুমা চলে যায়। তরুণ একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে থাকে। কেন জানি না, ওর বুক থেকে বেরিয়ে আসে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস।

রুমারা ক'দিন হল পুরীতে এসেছে। এখানে ওর মন্দ লাগছে না। নতুন জায়গার প্রতিটী জিনিষই ভাল লাগে তার। স্বচ্ছ নীল আকাশের কি মাদকতা। হাল্কা মেঘের কি সহজ গতি, সোনার রঙে আকাশ মাখানো। তার পরেই নেমে আসে সন্ধ্যার ম্লান আলো—কি অপরূপ বর্ণসম্ভার! চোখ ফেরানো যায় না। রুমা সমুদ্র-কিনারে দাঁড়িয়ে সেই অপরূপ শোভা দেখছিল, কিছুক্ষণ পরে তার সম্বিৎ ফিরে আসে,—দেখতে পেল পাশে দাঁড়িয়ে একটী মেয়ে। বয়স তার রুমার মতই, দেখতে বেশ সুশ্রী। রুমা ফিরে তাকায় তার পানে। মেয়েটী একটু হেসে রুমাকে বলে—"আমি আপনাদের পাশের ঘরেই থাকি, ভারি ইচ্ছা করে আলাপ কর্‌তে আপনার সঙ্গে, কিন্তু সাহস পাই না। আজ আর থাক্‌তে পারলাম না, এলাম আলাপ কর্‌তে। আচ্ছা, আজ চলি, যদি বিরক্ত না হন তো আবার আস্‌বো, কি বলেন?"

রুমা বলে ওঠে—"নিশ্চয়ই আস্‌বেন, এখানে একা সঙ্গীহারা হয়ে পড়েছি, আপনার সাহচর্য্য পেলে খুশীই হবো। আপনি বুঝি পাশের ঘরে থাকেন। নামটী কি ভাই?"

"নাম আমার 'মঞ্জুষা', মঞ্জু বলেই সবাই ডাকেন, শুধু আমার দাদা ডাকেন মৌ বলে। দাদার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেবো। দেখবেন, ভারি মজার লোক, আবার ভীষণ আমুদে। ঐ যে আস্‌ছেন দেখছি এ ধারেই। আচ্ছা ভাই এখন যাই, একটু বেড়িয়ে আসি, আবার ডিনারের সময় দেখা হবে। হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে আপনি বলা ভাল শোনায় না, তুমি কথাটা ভা-রি মিষ্টি লাগে, বুঝেছেন। আচ্ছা চল্লাম এখন।"

সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়ায় রুমা। ঝিনুক কুড়িয়ে থলের মধ্যে ভর্ত্তি করে, তারপর ছোট্ট মেয়ের মত ঢেউয়ের সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করে—যতক্ষণ না ক্লান্ত হয়—মা বাবা খুশী হন এই চপলতা দেখে।

মঞ্জুষা তার দাদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। ডিনার শেষ হবার পরে—লবিতে সকলে এসে বসেছেন। রুমার মা ও রুমা এসে বসে, শচীনবাবু হোটেলের সাম্‌নে পায়চারী কর্‌তে থাকেন। কারণ "after dinner walk a mile."—তারপরে রেষ্ট নেওয়া তাঁর নিত্যকার অভ্যাস।

মঞ্জুষা বলে—"এই আমার দাদা। এর সঙ্গে আলাপ করেই এর পরিচয় পাবে, বেশী কিছু বলবার দরকার নেই।"

তারপর দাদাকে বলে—"এ হচ্ছে আমার নতুন বন্ধু 'রুমা', আজ আলাপ হয়েছে।" ছোট্ট একটী নমস্কার জানিয়ে ঈষৎ হেসে তিনি বলেন—"Very pleased to meet you."

মঞ্জুষা তার পাশের চেয়ারে বসায় রুমাকে। বেশ খানিকটা গল্প জমে ওঠে। রুমা লক্ষ্য করে, দ্রুত তালে গল্প করবার ক্ষমতা ভদ্রলোকের আছে। সুদর্শন চেহারা, সাজপোষাকে সৌখিন। টিপিক্যাল

আমেরিকান ষ্টাইলের। চেহারার মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে—চোখ এবং হাসি চঞ্চল। কথার জবাব সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায়। চলার গতিও বেশ দ্রুত। হাতে একটী হীরের আঁংটী, আলো লেগে ঝলমল কর্‌ছে। যা দেখে মেয়েদের মায়ের মন খুশীতে ভরে ওঠে, তার সবগুলিই আছে এই ভদ্রলোকটীর, অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় ষ্টাইলিষ্ট এবং ধনী। ফ্যাশানের আবরণে আপাদ্‌মস্তক ঢাকা।

অন্যদের সাথে কথা বল্‌ছিলেন। আলাপ জমাবার জন্যে এগিয়ে এসে বস্‌লেন। চোখে ভাবগর্ভ চাহনি, মুখে হাসি। রুমার অস্বস্তি লাগে। মার পানে চেয়ে দেখে, মার মুখ খুশীতে ভরে এসেছে। যেমন মায়েদের সাধারণতঃ হয়ে থাকে। রুমা দেখলে, প্রথম পরিচয়েই তার মা এই ভদ্রলোকটীর সঙ্গে বেশ সহজ ভাবেই আলাপ জমিয়ে নিয়েছেন।

মঞ্জু বল্লে—"দাদা, তোমার নামটী বল্লে না তো, রুমা জান্‌তে চায় যে!" রুমা কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে ছোট্ট একটী ঠেলা দেয় মঞ্জুকে।

"ও···হো··· দেখুন, একেবারে নামই জানাতে ভুল হলো···আমার নাম রঞ্জন। আমাকে শুধু রঞ্জন বলে ডাকলেই খুশী হব।"

রুমার সঙ্গে রঞ্জনের ব্যবহার দেখে অন্য দু' একটী মেয়ের মনে একটু ঈর্ষার ভাব আসে, যদিও সামনে ঔদাসীন্য দেখাচ্ছিলো। গানের জন্যে সকলে অনুরোধ করা সত্ত্বেও সেদিন রুমার গান শোনা কারও ভাগ্যে ঘটেনি। কথায় কথায় সবাই জান্‌তে পারে রুমারই পড়ার সখ সব থেকে বেশী। কবিতাও খুব ভালবাসে। রঞ্জন "ডন"এর এবং "ওয়ার্ডসওয়ার্থের" কবিতা থেকে কয়েকটী লাইন আবৃত্তি কর্‌তে সুরু করে দেয়। আবার তখনই ক্রিটিসাইজ করে যায় নির্বিবাদে। তার নিজের যে লেখাগুলি ভাল লাগে সেই কবিদের সপক্ষে আলোচনা করে। তার মতে এই সব কবিতাগুলি পড়ে রাখা একান্ত আবশ্যক। বাংলা কথা খুব কম বলে—ইংরাজীতেই যেন বেশী দখল। তবে, সত্যিই তার কথা বলার একটা স্টাইল আছে। কথায় কথায়

রাত হয়ে যায়। সেদিনের মত আলাপ আলোচনা সেইখানেই থেমে যায়।

এই ভাবেই কাটে ক'দিন খুব হৈচৈ ক'রে। হোটেলেরই কয়েকটী ছেলে মেয়ে মিলে কোনারকে যায় পিক্‌নিক্ কর্‌তে। সেই দলের মধ্যে রুমাও থাকে, বলা বাহুল্য, রঞ্জনই দলের প্রধান পাণ্ডা! কখনও বা সমুদ্র-কিনারে বালুচরে বসে, চাঁদের আলো উপভোগ করে, গ্রামোফোন চালায়, ছবি তোলে, একটা কিছু নিয়ে থাকেই।

গল্প হাসির মধ্য দিয়ে সময় কেটে যায় তাদের।

কোনদিন নুলিয়াদের sports হয় রঞ্জনদের উদ্যোগে, আবার কোনদিন বসে গানের জলসা। এইভাবে আসর বেশ জ'মে ওঠে। রুমার সঙ্গে মঞ্জুষার বেশ আলাপ জমে যায়। সেই সূত্রে পাশাপাশি দুখানি ঘরের মধ্যে বেশ একটু হৃদ্যতাও হয়। রঞ্জনের নানা রকমের দামি উপহারও জমছে রুমার ঘরে। শতবার বাধা দিলেও রঞ্জন সে বাধা মানে না। উপায় কি? রুমার কিন্তু এসব মোটেই ভাল লাগে না—এ যেন বেশী বাড়াবাড়ি। সে ভাবে, দুদিন পরেই তো ফিরে যাবে। তখন ভদ্রলোকের হাত থেকে সে মুক্তি পাবে। এক এক সময়ে অসহ্য হয়ে ওঠে রুমার। কিন্তু মায়ের ভয়ে কিছু বল্‌তে পারে না। দোকানে গেলেই এক গাদা দামি জিনিষ কিনে গাড়ীতে উঠিয়ে দেবে। 'না' বলবার যো নেই, না নিলেই নয়। মা বলেন—পয়সা আছে ওদের অনেক, সখ ক'রে কিছু দিলে অমন বেজার হোস্ কেন। বড়লোকের ছেলে, নজর উঁচু। রুমা নীরব হ'য়ে যায়। মা বাবার সে একটী মাত্র মেয়ে, সে ছাড়া তাঁদের আর কেই বা আছে। সেইজন্য সাধ্যমত মা বাবাকে খুশী রাখতে চেষ্টা করে। এর জন্য তাকে অশান্তি ভোগ করতেও হয় অনেক সময়।

সমুদ্রের ধারে বসে আছে রুমা, sea green শাড়ীর আঁচলটা বেশ শক্ত ক'রে কোমরে জড়িয়ে নিয়েছে, চোখে গাঢ় সবুজ রংয়ের গগ্‌লস্। চেয়ে আছে সমুদ্রের পানে। আকাশের নীল পর্দার মধ্য দিয়ে প্রদীপ্ত

সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়েছে সমুদ্রের মধ্যে। সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাস উঠছে ফুলে ফুলে, ফেনিল ঢেউগুলি এসে আছড়ে পড়ছে তার পায়ের কাছে। আন্‌মনা রুমা বসে কি ভাবছে কে জানে।

একটু পরে রঞ্জন এসে ওর পাশে দাঁড়ায়। কিন্তু রুমা টের পায় না। রঞ্জন বলে—"আপনি এখানে বসে আছেন আর ওদিকে আমরা খুঁজে খুঁজে হয়রান। কি ভাবছেন বলুন তো?"

রুমা লজ্জিত হয়ে পড়ে, বলে—"কি আর ভাববো। এই একটু সমুদ্রের শোভা দেখছিলাম। কই মঞ্জু এলো না?"

"এক্ষুনি আসছে।" আর কোন কথা না বলে রঞ্জন বসে পড়ে রুমার পাশে। দুজনেই চুপ। সামনে দুরন্ত নীল সমুদ্রের মাতামাতি। দূরে বহুদূরে দিক্ চক্রবালের শেষ সীমানায় বিদায়ী সূর্যের লাল আলপনা। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেইদিকেই তাকিয়ে থাকে দুজনে। একসময় রঞ্জন ডাকে—"রুমা।"

রুমা কোন উত্তর দেয় না। নীরব থাকে। রঞ্জন ওর একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নেয়। তারপর বলে—"রুমা, আমার জীবন-পথে সঙ্গিনী হিসাবে তোমাকে কি পাবো না?"

রুমা মুখ তুলে তাকায় ওর দিকে। বলে—"আমাকে না বলে বাবা মাকেই বলবেন। যা করবার তাঁরাই করবেন।"

"তবু তোমার সম্মতি না পেলে তাঁদের সম্মতি যে নিরর্থক, রুমা।" রঞ্জনের কণ্ঠে ব্যাকুলতা।

ম্লান হাসি ছড়িয়ে পড়ে রুমার মুখে, বলে—"আপনি বোধহয় জানেন না বাংলাদেশের মেয়েদের নিজস্ব কোন মত থাকতে পারে না। আর থাকাও উচিত নয়, তাই নয় কি?" ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নেয় রুমা। চোখের কোণায় জমে ওঠে ছল্‌ছলে জল। রঞ্জন বুঝতে না পেরে চুপ করে যায়। রুমা উঠে দাঁড়ায়, তারপর রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলে—"আপনার নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই রঞ্জনবাবু। ভাগ্যদেবতা বোধহয় আপনার প্রতি অধিক

সুপ্রসন্ন। সংসারে রূপ আর অর্থ যাদের নেই তারা সত্যিই অভাগা।” বলতে বলতে রুমা চলে যায়। ওর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে রঞ্জন। রুমার হেঁয়ালী ভরা কথাগুলি ওকে ভাবিয়ে তোলে।

তরুণ তার ষ্টাডি-রুমে একমনে ছবি এঁকে চলেছে। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই তার তুলি থেমে যায়। মনে পড়ে রুমার কথা। এতদিন হলো ওদের কোন খবর নেই। পুরী থেকে ওরা সবাই ফিরেছে সে-খবর তরুণ পেয়েছে। কিন্তু রুমা কি একবারও এর মধ্যে আসতে পারলো না। তাই অভিমান করে তরুণও ওদের বাড়ী আর যায়নি। কিন্তু রুমাকে এই দীর্ঘদিন না দেখে তরুণ অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু জোর করে তখনি মনকে শান্ত করে। ভাবে, বড়লোকের মেয়ে সে। গরীবের ঘরে তাকে সব সময় কামনা করা অন্যায়। হাতের তুলি ঈজেলের পাশে নামিয়ে রেখে তরুণ ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দেয়। চোখ দুটি তার আপনা থেকেই বুজে আসে। রুমার মুখখানা বার বার ভেসে ওঠে। সে ভাবে, ভালোবাসার বিনিময়ে কি ভালোবাসা পাওয়া যায় না। তার অর্থ, চোখ ঝল্‌সানো রূপ নেই বটে। কিন্তু তার এই বুকভরা ভালোবাসা, এই স্নেহ, এরও কি কোন মূল্য নেই? মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কি অর্থে, রূপে মনুষ্যত্ব কি একেবারে মূল্যহীন? চিন্তার স্রোতে নিজেকে হারিয়ে ফেলে তরুণ। ভাবনা, চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে তার মন। এমন সময় চাকরের ডাকে চোখ খুলে দেখে হাতে তার দুখানি চিঠি। চিঠি দুটি দিয়ে চাকর চলে যায়। তরুণ দেখে একখানা সুদৃশ্য খাম, ওপরে লেখা শুভ-বিবাহ। আর একখানা মেয়েলি হাতে লেখা তার নিজের নাম। প্রথমে বিয়ের চিঠিটাই সে খোলে। কিন্তু পড়ে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। রুমার বিয়ে বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার রঞ্জনের সঙ্গে। রঞ্জন! যাকে তরুণ ভালো করেই চেনে। যার জীবনে একাধিক নারীর সমাগম ঘটেছিল। আর ভাবতে পারে না তরুণ। বুকের ভিতরটা তার মোচড় দিয়ে ওঠে। চিঠিটা টুকরো টুকরো করে

ছিঁড়ে ফেলে। মনে ভাবে, রুমাও তাকে ছলনা করলো। তার ভালোবাসার এই দাম দিল। রুমা…তার রুমা…তাকেও সে পেল না। দুহাত দিয়ে সে তার মাথাটা চেপে ধরে, নিজেকে সে বুঝি আর সামলাতে পারে না। কিন্তু কেন? কেন সে পেল না রুমাকে। রুমা তো তাকে কোনদিনও কিছু বলেনি। কেন? হঠাৎ তরুণের চোখ পড়ে খামে লেখা আর একটা চিঠির উপর। খাম ছিঁড়ে চিঠি পড়ে তরুণ। কিন্তু চোখের জলে সবই ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। নিজেকে কোনরকমে শান্ত করে অবশেষে পড়ে ফেলে চিঠিটা। রুমার চিঠি। রুমা লিখেছে—

—সম্বোধনের আজ কোন দাবী নেই। কারণ সে অধিকারও আমি হারিয়েছি। জীবনে অনেক কিছুই আশা করেছিলাম, মনের রঙ্‌ মিশিয়ে কল্পনাকে বাস্তব করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারলাম না। মিথ্যার খোলসকেই সংসারে যারা সত্য বলে গ্রহণ করে তাদের সঙ্গেই নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে দিলাম। জানি না এর শেষ পরিণতি কোথায়। মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে তোমার ভালবাসাকে আর ছোট করবো না। যাবার বেলায় তাই দূর থেকেই তোমায় প্রণাম জানাই। আশীর্ব্বাদ কোরো না, তার চেয়ে যদি পারো তো আমায় তুমি ক্ষমা কোরো…ক্ষমা কোরো।

‥ইতি অভাগী রুমা।

চিঠিটা রেখে দেয় তরুণ। জীবন তার আজ বিরাট শূন্যতায় ভরা। তবু ভাবে, রুমাকে কি সত্যিই সে পায়নি?

কথা ও কাহিনী

একটি স্মরণীয় ঘটনা

সংসারে এমন অনেক সময় অনেক তুচ্ছ ঘটনা ঘটে যা মনে গভীর ভাবে ছাপ রেখে যায়। জীবনে পথ চলতে কত লোকের সংস্পর্শে আমরা আসি, কত ছোট বড় ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটে, কিন্তু কালের

স্রোতে ভীড়ের মাঝে বুদ্‌বুদের মতোই সব মিলিয়ে যায়। তবুও এদের মাঝে পথ চল্‌তি দু'একটি ঘটনা মানুষের মনে অম্লান হয়ে বিরাজ করে যার সুরভি ও মহিমায় মানুষ হয় সুন্দর, নির্ম্মল ও পবিত্র।

কিছুদিন আগে এমনি এক লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, যার কথা আজো আমি ভুলিনি—হয়তো বা ভুলতেও কখনও পারবো না। তার সঙ্গে দেখা আমার হয়েছিল চৌরঙ্গীতে। ফির্‌পো হোটেল থেকে বেরিয়েই সামনে যে ষ্টল্ সেখানে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম সুন্দর কয়েকটি ম্যাগাজিন। এমন সময় সে সামনে এসে দাঁড়ালো। মাথায় ছিল তার ঝুড়ি-ভর্ত্তি কাপড়ের পুতুল। সে ছিল এক ফেরিওয়ালা। পুতুলগুলি ছিল নানা রকমের। নানান দেশের মানুষ তারা, নানান পোষাক পরা। বিচিত্র তাদের ভাব ভঙ্গি। তাদের মৌন ভাষা যেন বলছে, আমরা সব এক, তাই আমরা একসঙ্গেই মিলিত হয়েছি। বাইরের বেশ ভূষা স্বতন্ত্র হলেও অন্তরে আমরা এক। আমরা যে একই মায়ের সন্তান। আজকের এই বর্ণ বৈষম্যের যুগে সকল পার্থক্য ভুলে সবাই যদি এমনি ভাবে এক হতো, তাহলে……। 'মা'…চমকে উঠলাম ফেরিওয়ালার কণ্ঠস্বরে। অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি কয়েকটা সুন্দর পুতুল বেছে নিয়ে ওকে একটা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে চলে এলাম। ওর চার পাশে তখন ভীড় জমতে আরম্ভ করেছে। সুন্দর পুতুল দেখে পথচারীরা আকৃষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। অনেকে কিনেও নিচ্ছে। গাড়ীতে বসে রওনা হবো এমন সময় দেখি ওই লোকটি ছুটতে ছুটতে গাড়ীর দিকে আসছে। আমাকে দেখে আমার হাতে দুটি টাকা ফেরত দিয়ে সে বল্‌লে—"মা, আপনি আমায় দুটি টাকা বেশি দিয়ে এসেছেন, ভীড়ের মধ্যে ঠিক হিসাব করতে পারিনি। ভাগ্যেই আপনার দেখা পেলাম।" আনন্দে ওর ঘর্ম্মাক্ত মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চোখের কোণে সাফল্যের হাসি। বল্‌লাম—"ওই দুটি টাকা তুমি নাও। ওটা তোমার বখ্‌শিষ।" ধীর গলায় সে উত্তর দিলো—"মা, আমরা গরীব। আমরা খেটে দিন আনি দিন খাই। পরিশ্রম

করে যে টাকা পাই তাতেই কোন রকমে সংসার চালিয়ে যাই। এমনি দয়ার দান নিতে মনে বড় লাগে। ওতে মন ছোট হয়ে যায়, মা।” আমি চেয়ে থাকি ওর দিকে। ও আস্তে আস্তে বলে যায়—“সংসারে আমার রুগ্ন মা আর অনেকগুলো ছোট ছোট ভাই বোন আছে। পুতুল বিক্রী করে কোন রকমে দিন চলে যায়। আপনারা রাজরাণী—আমাদের দেখে করুণা হয়। তাই দয়া করে বখ্‌শিষ দেন। আমরা গরীব হলেও আমরা তো মানুষ, মা। আপনি দেবী, টাকার চেয়েও আপনার আশীর্ব্বাদ অনেক বড় আমাদের কাছে। আপনি সেই আশীর্ব্বাদই করে যান মা—আমরা বড় গরীব…আমরা বড় হতভাগা…। বলতে বলতে চলে যায় লোকটা। মুখ ফিরিয়ে নিলেও দেখছিলাম ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল তার উপচে পড়ছিল। আমারও চোখের পাতা শুষ্ক থাকেনি। মনে ভাবলাম, নিঃস্ব হয়েও ও কত পূর্ণ—অন্তরে কত মহৎ। তবু ওরা থাকবে সবার নীচে—সমাজের ঘৃণা আর উপেক্ষার তলায়। কেন এই প্রভেদ কে বলবে!…গাড়ী তখন চলতে সুরু করেছে।

স্মৃতি

বসন্তের এক অলস দ্বিপ্রহর। পথের ধারের গাছটা ভরে আছে অজস্র রাঙা ফুলে। মঞ্জরিত আম্রশাখার চারিধার ঘিরে শুরু হয়েছে ভ্রমরের গুঞ্জন। পথ নিস্তব্ধ। শুধু হালকা হাওয়ায় ভেসে আসে কোকিলের সুমিষ্ট ডাক—কুউ…কু…উ…।

জানলার ধারে চুপ করে বাসন্তী দাঁড়িয়ে ছিল। জানলা-পথবাহী দৃষ্টি তার নীলাকাশের মাঝে সমাহিত। তার কালো চোখ দুটিতে ছলছলে জল। মনে তার বিরাট শূন্যতা। এই সময় নির্জ্জন পথের দিকে চেয়ে থাকতে বেশ ভালো লাগে তার। নিজেকে বুঝি বা সে হারিয়ে ফেলে ফেলে-আসা দিনগুলির অন্তরালে। যেখানে মিলিয়ে

আছে তার জীবনের এক বিশেষ অধ্যায়। যার স্মৃতিটুকু আজো উজ্জ্বল হয়ে আছে তার অন্তরের মণিকোঠায়। আজ বসন্তের উতলা বাতাসে বুঝি বা মনে পড়ে যায় সেই অশ্রুসজল দিনগুলির কথা।··

বাসন্তীর বিয়ে হয়েছিলো খুব অল্পবয়সে। সেদিন বুঝি বসন্তের এমনি এক শুভলগ্নে স্বামীর পাশে এসে সে দাঁড়িয়েছিল। সেদিন থেকেই সুরু হয়েছিল তার বিবাহিত জীবনের ইতিহাস। স্বামী ছিল তার নিতান্তই ভালো মানুষ। সরল, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন ছিল তার মন। বাসন্তীর উপর ছিল তার একান্ত নির্ভর। বাইরের জগত নিয়েই সে থাকতো ব্যস্ত। বাসন্তীই ছিল ঘরের গৃহিণী। সংসারের সমস্ত কিছুই দেখতে হতো তাকে। স্বামীর প্রতি তার ছিল প্রগাঢ় ভালবাসা। স্বামীর পরিচর্য্যার মাঝেই পেতো সে নারী-জীবনের পরম পরিতৃপ্তি। স্বামী তার ব্যবসায়ী মানুষ। কাজেই বাসন্তীর মনের খবর রাখবার অবসর ছিল তার খুব কম। কিন্তু এ নিয়ে বাসন্তীর কোন অনুযোগ ছিল না। হাসিমুখেই সংসারের সকল দায়িত্ব সে পালন করে যাচ্ছিল। এমনি করেই কেটে গিয়েছিল তাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম দিনগুলি।

কিন্তু এই সহজ জীবনযাত্রায় ঘটলো বিচ্ছেদ। মিলনের সুর গেল কেটে। কোথা থেকে এলো চম্পা তাদের চলার পথে। বাসন্তীকে সরিয়ে দিল দূরে···অনেক দূরে। তাদের বিবাহিত জীবনে টেনে দিল অন্ধকার কালো যবনিকা। চম্পা এসেছিল কলকাতায় পড়তে। বাসন্তীর ছোট খুড়তুতো বোন। এখানে বোর্ডিংএ থেকে সে পড়াশুনা করতো। প্রত্যেক ছুটিতেই সে আসতো ওদের ওখানে। এই চঞ্চলা মেয়েটিকে সত্যি ভালবেসেছিল বাসন্তী। তাদের নিস্তব্ধ গৃহ মুখরিত হয়ে উঠতো চম্পার কলহাস্যে। বৈচিত্র্যহীন জীবনে সে নিয়ে আসতো উদ্দীপনার আমেজ; আজ সেই সুন্দর মুখখানি বাসন্তীর মনকে ব্যথিত করে তোলে। নিজের অজ্ঞাতে বেরিয়ে আসে এক দীর্ঘনিশ্বাস।

সেদিন ছিল বুঝি এমনি এক রোদে ভরা দিন। পত্রপুষ্পে ভরা প্রকৃতি যেন নব সাজে সজ্জিতা হয়েছিল। শুভ্র নীল আকাশ জুড়ে ছিল মেঘের পক্ষ বিস্তরণ। চম্পা বসেছিল খোলা জানলার ধারে। রেশমের মত ঘন কালো চুল তার এলোমেলো ছড়ানো। কানের পাশে আটকানো ছিল হলুদ রংয়ের একগুচ্ছ কুরচি ফুল। বাসন্তী রংয়ের সাড়ীখানা ছিল তার দেহকে বেষ্টন করে। কপালে ছিল ছোট্ট এক টিপ্। বাসন্তী সেই ঘরে বসে স্বামীর জন্যে জলখাবার সাজাচ্ছিল। চম্পা দেখছিল বাসন্তীর কর্ম্মনিপুণতা। সে বলেছিল, দিদি তোমার মতন সেবিকা সংসারে খুবই দুর্লভ। এমন সহধর্ম্মিণী পাওয়া বহু জন্মের তপস্যার ফল। জামাইবাবুর ভাগ্য আছে বটে। বাসন্তী মুখ তুলে ওর দিকে তাকিয়েছিল, তারপর মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিল—তোর বরের ভাগ্যও কিছু কম দেখছি না। এমন রূপবতী ও গুণবতী মেয়ে যে পাবে তাকে এখনই যে একবার দেখতে ইচ্ছা করছে। বাস্তবিক তোর এই কনক চাঁপার মতন মুখের এই মোহিনীরূপ দেখলে মুনি ঋষিরও মন যে টলে যাবে। বাসন্তী থেমে যায়। লজ্জায় চম্পার মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠেছিলো। এমন সময়ে ঘরে প্রবেশ করেন তার স্বামী। ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—ছোট গিন্নির মুখখানা যেন আজ একটু বেশী অনুরাগে মাখানো। কৃত্রিম কোপে মুখ ভেংচে চম্পা উত্তর দিয়েছিল—বয়ে গেছে অমন বুড়োকে স্বামী করতে। একজনকে নিয়েই হিম্‌সিম্ খাচ্ছেন, আবার আর একজনের প্রতি লোভ! বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চান! স্বামী হেসে জবাব দিয়েছিলেন—চাঁদকে পায় না বলেই তো বামনরা বরাবর হাত বাড়িয়ে থাকে যদি কোনদিন চাঁদ এসে স্বেচ্ছায় ধরা দেয়। তা আমার চাঁদ কি এতই নির্ম্মম যে ভক্ত বামনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে না?—না, করবে না—বলে চম্পা ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। স্বামী ওর যাওয়ার পথে তাকিয়ে মৃদু হেসেছিলেন। আজ সেইসব দিনগুলির কথা একে একে মনে পড়ে বাসন্তীর। কিন্তু আজ সে ভুলে যেতে

চায় সেইসব দিনের স্মৃতি যা আজো উজ্জ্বল হয়ে আছে তার অন্তরের মণিকোঠায়।

এমনি করেই বছরের পর বছর ঘুরে চলেছিল। হঠাৎ কি হলো বাসন্তীর। কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হলো। ম্যানেনজাইটিস্। অনেক-দিন তার কোন জ্ঞানই ছিল না। যেদিন সে প্রথম চোখ মেলে তাকালো সেদিন দেখলো তার শিয়রে বসে চম্পা হাওয়া দিচ্ছে। আর তার স্বামী অদূরে বসে আছেন, মুগ্ধ দৃষ্টি তাঁর চম্পার মুখের 'পরে নিবদ্ধ। দুর্ব্বল শরীরে আঘাতটা বোধ হয় একটু বেশিই হবে। বাসন্তী আবার জ্ঞান হারিয়েছিল।

অসুখ থেকে সেরে উঠতে বাসন্তীর বেশ সময় লেগেছিল। রোগ তাকে মুক্তি দিলেও শরীর তাকে কর্ম্মক্ষম করে তোলেনি। তাই নির্জীবের মতোই তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হতো। সংসারের যাবতীয় কাজ তখন চম্পাই করে। স্বামীকে পরিপাটি করে খাওয়ানো, দেখাশুনা সে-ই করে। বাসন্তী শুয়ে শুয়ে তার কাজ দেখে। একদিন অনুযোগ করে চম্পাকে সে বলেওছিল—আমার সংসারের জন্য তোর কত ক্ষতি হলো, আর কতদিন আমার সংসারের ঠেলা তুই সামলাবি? মৃদু হেসে চম্পা বলেছিল—যতদিন না তুমি আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠো। বাসন্তী আর কোন জবাব দেয়নি। এমনি করেই গড়িয়ে চলেছিল তাদের সংসারের চাকা।

কিছুদিনের মধ্যেই বাসন্তী বুঝেছিল তাদের সংসারে কি যেন একটা অঘটন ঘটে গেছে। চম্পাকে আর যেন সে পূর্ব্বের মতন সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। তাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে আর সেই আন্তরিকতার সুর যেন নেই। রোগশয্যায় শুয়ে সন্দেহের যে দানা তার মনে বাসা বেঁধেছিল এখন যেন তা আরও ঘনীভূত হয়েছে। স্বামীর আচরণ দেখে সে মর্ম্মাহতই হয়েছে। চম্পার প্রতি স্বামীর অধিকতর মনোযোগ তাকে ব্যথিত করে তুলেছিল। চম্পাও যেন আজকাল তাকে এড়িয়ে চলে। হয়তো বুঝতে পারে বাসন্তীর বিরূপ

মনোভাবের কথা।...কিন্তু কি করে এ সম্ভব হলো। চম্পাও কি সত্যি ভালবাসে তার স্বামীকে। ফুলের মতন মেয়ে সে, তার মধ্যে এ বিষ এলো কোথা থেকে! অবশ্য নিজের অক্ষমতাকেই বাসন্তী স্বীকার করে নিয়েছিল। স্বামীর মনকে সে হয়তো সম্পূর্ণ জয় করতে পারেনি। তার কাছে তিনি যা পাননি হয়তো চম্পার কাছে তাই পেয়েছেন। চম্পার রূপের মোহ যদি তার স্বামীকে আকৃষ্ট করে থাকে তবে সে দোষ কার। তার অসুখের মধ্যে হয়তো নিবিড় সান্নিধ্যের ফলে গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে ভালবাসা। স্বামীকে এ নিয়ে কোন প্রশ্ন সে করেনি। তবে বিক্ষিপ্ত মনে মাঝে মাঝে চম্পাকে শুনিয়েছে সে অনেক কটু কথা। তার উত্তরে চম্পা বরাবর নীরব থেকেই গেছে। এই ভাবে অন্তরে ক্ষত বিক্ষত হয়ে মন তার ভেঙ্গে পড়েছিল। বড় শূন্য মনে হতো তার। বাড়ীর ঘর-দোরগুলো যেন ফাঁকা লাগে—যেন কোথাও তার জায়গা নেই। কেউ যেন তাকে চায় না। এই সংসারের প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গেছে। এইভাবে মানসিক যাতনা সহ্য করার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো। সে মনে প্রাণে তাই কামনা করেছিল। অশান্তির আগুনে দগ্ধ হয়ে একদিন চম্পাকে সে স্পষ্টই জানিয়েছিল তার বোর্ডিং-এ চলে যাবার কথা। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই বাড়ীতে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। চম্পা কোন প্রতিবাদ করেনি। পরদিনই চলে গিয়েছিল তার বোর্ডিং-এ।

দিন চলে যায়। বাসন্তী লক্ষ্য করে তার স্বামীর অন্যমনস্কতা। আগের চেয়ে অনেক বিমর্ষ হয়ে গেছেন তিনি। বাসন্তীর সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও বলেন না। বাসন্তী ভাবে জীবন-যুদ্ধে সে কি কেবল হেরেই যাবে। একটি মনকে জয় করবার শক্তি কি তার মধ্যে নেই! স্বামীকে সে এ বিষয়ে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করবে—কি সে চায়।...

সেদিন ছিল বুঝি বসন্তেরই কোন এক মধুর সন্ধ্যা। স্বামীর

প্রতীক্ষায় বাসন্তী উদ্‌গ্রীব। আজ সে একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করবে। আর এভাবে নিজেকে সে ফাঁকি দিতে পারে না। এতদিন অনেক সে সহ্য করেছে। কিন্তু আজ সে সহ্যসীমার বাইরে। যদি চম্পাই তাঁর সারা মন জুড়ে থাকে তাহলে চম্পাকে নিয়েই তিনি ঘর করুন। সে অন্যত্র চলে যাবে। এখানে স্বামীর গলগ্রহ হয়ে থাকবে না। স্বামী এলেন ধীর পদক্ষেপে। চোখ মুখ তাঁর শুষ্ক। একটা বিষাদের ছাপ তাঁর মুখে মাখানো—দেহ যেন তাঁর অত্যন্ত ক্লান্ত। ধীরে এগিয়ে এসে খোলা একটা চিঠি বাসন্তীর হাতে দিয়ে বল্লেন—বোর্ডিংয়ের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে গতকাল রাত্রে চম্পা মারা গিয়েছে—ডবল নিমোনিয়ায়। শেষের দিকে স্বামীর কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। বাসন্তী স্তম্ভিত···খোলা চিঠিখানা হাতে নিয়ে একবার তাকালো কিন্তু কিছুই পড়তে পারলো না। চোখের জলে তখন সব কিছুই ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে।

এবাড়ী থেকে চলে যাবার সময় বাসন্তীকে যে ছোট্ট চিঠিখানা লিখে গিয়েছিল তার কথা কটিই আজ তার বারবার মনে পড়ে। চম্পা লিখেছিল—

দিদি,

রূপ নিয়ে এই পৃথিবীতে কেন এসেছিলাম জানি না। যে রূপ শান্তি, কল্যাণ আনে না সে রূপ তো অভিশাপ। মানুষকে শুধু দুঃখই দিয়ে গেলাম, নিজেও কাঁদলাম তোমাকেও কাঁদালাম। আমার সংস্পর্শে কল্যাণ নেই, তাই তোমাদের জীবন থেকে নিজেকে একেবারেই সরিয়ে নিলাম। দিদিভাই, পারো তো অভাগীকে ক্ষমা কোরো। ইতি

চম্পা

চোখ দুটো জলে ভরে আসে বাসন্তীর। অস্ফুট গলায় আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বলে, যেখানেই আজ তুমি থাকো বোন শুধু এইটুকুই জেনো, ঈর্ষ্যাভরা মন নিয়ে তোমার দিদি তোমায় বুঝতে পারেনি। তুমি তাকে ক্ষমা করো···তুমি তাকে ক্ষমা করো। অঝোরে কাঁদতে থাকে বাসন্তী। দূরে কোথায় যেন বাজে শানাইয়ের করুণ মূর্চ্ছনা।

পরগাছা

গাজনতলার মাঠে বসেছে মস্ত মেলা। নানা দেশ থেকে এসেছে নানা রকমের জিনিসপত্র। আগের দিন থেকে সব জিনিসপত্র মেলায় এনে ফেলেছে। চালাঘর বাঁধা হয়েছে, তার মধ্যেই দোকানিরা শোবার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। কেউ বা ছই-দেওয়া গরুর গাড়ীর মধ্যেই খড় বিছিয়ে শোবার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। ভোর হতে না হতে শোনা যাচ্ছে, গরুর গাড়ীর চাকার ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ—রাস্তা মুখরিত করে এসে থেমেছে মেলায় দেবার জিনিস-পত্তর নিয়ে। খাবারের দোকানের আশেপাশে জমা হয়েছে ছোট ছেলের দল। জনকোলাহল জায়গাটি মুখর করে তুলেছে। কেনা, বেচা, দর কষাকষির চিৎকারে কাছের লোকের কথাও কানে শোনা যাচ্ছে না। লোকে লোকারণ্য চারিদিক, দুম্‌দাম্‌ ঢাক বাজছে, এধারে মেলাও জোর চলেছে, নাগরদোলার কাছেও বেশ ভিড়। ছেলে বুড়ো, মাঝারি বয়সী সকলেরই সমান উৎসাহ নাগরদোলায় চড়বার জন্য। ভিড়ের ঠেলায় কে কোথায় ছিটকে পড়েছে খুঁজে বার করা এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শালুর ছোট ছোট টুকরো পেতে বসেছে সাঁওতালি মেয়ের দল, নানা রকমের ছোটখাটো রূপোর গহনা নিয়ে।

কণিকা সবেমাত্র নাগরদোলা থেকে নেমে ঐ গহনার সামনে এসে বসে এক জোড়া মাকড়ীর দর করছিল। শুনতে পেলে ছোট্ট একটি ছেলের কান্না, প্রথমে সে লক্ষ্য করেনি, কিন্তু সেই কাতর কান্না শুনে এগিয়ে গেল ; ভাবলে, হয়তো ছেলেটি হারিয়ে গেছে, তার মাকে খুঁজে পাচ্ছে না, তাই এত কান্না। কণিকা এগিয়ে দেখে, বছর চারেকের একটি সুন্দর ছেলে—সত্যিই ভিড়ের মধ্যে সে মাকে হারিয়ে ফেলেছে। সকলে মিলে হাজার প্রশ্ন করছে তাকে কিন্তু বেচারা কোন উত্তরই দিতে পারছে না, গোলমালে ভয় পেয়ে গেছে সে। কণিকার ভারি ভালো লাগলো ছেলেটিকে। কোলে তুলে নিলে সেও

চুপ হয়ে গেল। কণিকার বুকের উপর মাথাটি রেখে শুয়ে রইল। কণিকা এগিয়ে গেল খাবারের দোকানের সামনে, ক্ষীরের পেঁড়া গরম জিলিপী কিনে খাইয়ে দিলে। তার হাতে কিনে দিলে মাটীর পুতুল, শোলার দাঁড়ে বসানো ল্যাজঝোলানো টিয়ে, পাতার ভেঁপু। ছেলেটি সব দুঃখ ভুলে গেল খেলনা পেয়ে, কিন্তু কণিকাকে কিছুতেই ছাড়ে না। মহামুস্কিল হোলো—কি করবে সে! তখন সকলেই বললে, কি করবেন, ও তো ছাড়বে না—আপনি নিয়ে যান, ঠিকানা দিয়ে যান, কেউ যদি খোঁজ করে তো আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো। এছাড়া আর উপায় কি? এই ছোট্ট হারানো ছেলেটি কি করেই বা যাবে? কিন্তু ভয় হয় তার কাকিমার কথা মনে করে, একে নিয়ে গেলে তো রক্ষা নেই—সে নিজেই কাকাবাবুর আশ্রিতা, কাকিমার গলগ্রহ। কেমন করেই বা এই ভিড়ের মধ্যে একে একলা ছেড়ে যাবে। কাকিমাকে সে বুঝিয়ে বলবে ওর মা বাবা এসে নিয়ে যাবেন—এ তো দু-একদিনের ব্যাপার। চিরকাল তো থাকবে না, বুঝিয়ে বললে হয়তো কাকিমা বুঝবেন, কোন আপত্তি করবেন না।

বাড়ী গিয়ে সব কথাই কাকিমাকে জানালে তিনি যে খুশি হননি তা বলাই বাহুল্য। তবে দু-একদিনের জন্য, তাই আর বিশেষ কিছু বললেন না। কণিকাও ছেলেটিকে ঘরে নিয়ে হাত মুখ মুছিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলে, নিজেও তার পাশে শুয়ে কখন ঘুমিয়ে গেলো।

ভোরের আলোতে চোখ মেলে দেখে, ছেলেটি তার পিঠের ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে 'মা, মা' বলে ডাকছে। আহা বেচারা, হয়তো কণিকাকেই মা ভেবেছে। কণিকা কেমন এক অজানা পুলকে শিউরে উঠলো। কিছুক্ষণ চুপ করে সে পড়ে রইল।

তারপর কাকিমার সাড়া পেয়ে উঠে পড়ল। কাকিমা বললেন, অনেক বেলা হয়ে গেছে, কোথা থেকে এক পরের ছেলে কুড়িয়ে এনেছো—কে দেখবে ওকে? এত বেলা পর্য্যন্ত ছেলে নিয়ে বসে থাকলে চলে, কাজকর্ম নেই?

'এই যে, যাচ্ছি কাকিমা' বলে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ছেলেটিকে নিয়ে। কাকিমা আপন মনেই বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলেন, কণিকাও তার নিত্য নৈমিত্তিক কাজ করতে লাগলো নীরবে।

ক'দিন হ'য়ে গেল, ছেলেটি কণিকার কাছে বেশ আনন্দে আছে। তার খোঁজ নিতে এ পর্য্যন্ত কেউ এলো না। কণিকার কাকাবাবুও অনেক জায়গাতে খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোন ফল হয়নি—কাজেই ছেলেটি রয়ে গেছে। কাকিমার বিরক্তি ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে ছেলেটির উপরে। কাকাবাবু নির্ব্বিবাদী মানুষ, সাতেও নেই পাঁচেও নেই ; তাই নালিশ, ঝগড়া, কান্নাকাটি সবেতেই উদাসী ভাব। সব সহ্য করেন নির্ব্বিবাদে। কণিকার অবস্থাও কাকারই অনুরূপ। তাই এই ছেলেটিকে নিয়ে গোলমাল বাঁধে। সে সহ্য করে নীরবে, সে বেচারা ছেলেটিকে তার সব ভালবাসাটুকু নিঃশেষ করেই দিয়েছিলো—মাঝে মাঝে মনে ভয় হয় যদি তার কাছ থেকে ছেলেটিকে কেড়ে নিয়ে যায় তবে সে কেমন করে থাকবে! না না, সে হতে পারে না। ভগবান এ ছেলেটিকে তাকে দিয়েছেন, সে আর কাউকে দিতে পারবে না। ছেলেটির নাম দিয়েছিলো "সত্যকাম"। ডাকতো "সতু" বলে। ছেলেটিও তাকে মা বলে ডাকে। এতদিনে কণিকা একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিলো—কেউ তো এলো না ছেলেটিকে নিতে, তবে সতুকে আর ছাড়তে হবে না।

এই ভাবেই তার দিন কেটে যাচ্ছিল সতুকে নিয়ে। হঠাৎ একদিন সে জানতে পারলে তার বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছে। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই তাকে সচকিত করে তুললে এই খবর। কোথায় বিয়ে? কার সঙ্গে বিয়ে? পাত্রটি কেমন? সে তো কিছুই জানে না। কাকিমাই পছন্দ করেছেন, কালই বিয়ে, ভাবনা হয়—ব্যাপার কি! নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল আছে। কে এই মানুষটি যিনি তাকে বিবাহের পদমর্য্যাদা দিচ্ছেন। কি তাঁর দয়া এই আশ্রিতা মেয়েটার প্রতি। তিনি মানুষ কি অমানুষ তা কে জানে।

খোকার আসন্ন বিরহের কথা ভেবে সে শঙ্কিত হ'য়ে উঠলো। ছেলেটিকে বুকে তুলে নিয়ে সে খানিকটা কাঁদলে। কে একে যত্ন করবে? কোথায় থাকবে এই ছোট্ট ছেলেটি? ভগবান কেন তাকে এমন শাস্তি দিলেন, অপরের ছেলে চুরি করে রাখার শাস্তি বুঝি?

চুরি? হ্যাঁ—এ একপ্রকার চুরিই বটে। হে মা কালী, এ বিয়ে যেন কিছুতেই না হয়। আমি কাকাবাবুকে বলবো, আমি খোকাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না। না না, সে কিছুতেই পারবো না, ভগবান রক্ষা করুন। কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে, কে জানে। কাকিমার কণ্ঠস্বরে তার চমক ভাঙে, বিয়ের খবরটা তাকে সবই জানালেন। মোটমাট সবই কণিকা বুঝতে পারে—কষ্টে এমন পাত্র জুটেছে তার ভাগ্যে। পয়সায় কোন কিছুরই অভাব নেই, নেহাৎ দায়ে না পড়লে কি কণিকাকে বিয়ে করতে আসে। স্ত্রী নেই, সংসারের ভাবনা ভাবতে পারেন না তিনি, কাজেই গৃহকর্ত্রীর অভাব পূর্ণ করবে কণিকা। ছেলেপিলে সব বেশ বড়, কোন ঝঞ্ঝাট তাকে পোহাতে হবে না। তবে বয়সটা একটু বেশী, তা পুরুষ মানুষ বয়স হলেই বা ক্ষতি কি? পয়সা কড়ি কিছু নিচ্ছে না। নেহাৎ সংসার অচল, তাই তো আমাদের উদ্ধার করছে—এখন ভালয় ভালয় আমাদের কাজটি হয়ে গেলেই নিশ্চিন্ত হতে পারা যায়। অনেক কিছুই বলে চলেছেন কাকিমা।

কণিকা জানালে—খোকার কি হবে কাকিমা! আমায় তাড়িয়ে দেবেন না দয়া করে, এখানে থাকতে দিন। কেঁদে কেঁদে তার চোখ দুটো রাঙা হয়ে উঠলো কিন্তু কাকিমা তাকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন এ বিয়ে হবেই। যে অপরের গলগ্রহ হয়ে আছে তার অত কর্ত্তৃত্ব সাজে না। এ ছাড়া ৫০০০৲ হাজার টাকা দিয়েছেন আমাদের হাতে বিয়েতে খরচের জন্য। খোকার জন্য ভাবতে হবে না। ওকে কোন আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেই হবে। কণিকা তার বড় বড় চোখ দুটো মেলে কাকিমার দিকে তাকালো—কাকিমার এতটা

যত্ন তার নিষ্ঠুরতা বলেই মনে হলো। কি বিশ্রী কেটেছিলো তার সেইদিন।

সারারাত্রি জেগে খোকার মুখের দিকে চেয়ে, ভবিষ্যৎ জীবনের ভয়ঙ্কর ছবি তাকে বিচলিত করে তুললো। বাতাসে আলোর শিখা কেঁপে কেঁপে ওঠে ; কণিকা উঠে আলো নিভিয়ে দিলে—চোখ দুটো বন্ধ করে চুপ করে শুয়ে থাকে। মন তার যেন কোন সুদূর দেশে চলে যায়। বাস্তব জগতের পরিত্যজ্য ইচ্ছায় মানুষ সেখানে চালিত হয়। ভগবানের রাজ্যে এমন অঘটন তো অনেক ঘটে। তার ভাগ্যে যদি এমনি একটা কিছু ঘটে যায়। ষাট বছরের বুড়োর সঙ্গে তার বিয়ে—মাগো, ভাবতেও কেমন লাগে। তার উপর আবার ঘর-ভর্ত্তি ছেলেমেয়ে, লজ্জাও করে না—ছিঃ ছিঃ। না—এ বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না। এ যে নিজের অবমাননা। কাকাবাবুকে সে স্পষ্ট বলে দেবে। এ বিয়ে সে কিছুতেই করবে না। যখন রাত বাড়লো, চারিদিক নিস্তব্ধ, কণিকা তাকিয়ে থাকে তারায় ভরা আকাশটার পানে—চোখে নেই ঘুম। ভগবান, চোখে একটু ঘুম দাও, তার সকল জ্বালা জুড়োক। দুহাতে চোখ দুটো চেপে রাখে।

দীর্ঘদিন পর তার মার কথা মনে পড়লো—মনটা কেঁদে ওঠে। মনে পড়ে ছোট বেলার সেই সুখের দিন, আম কাঁঠালের ছায়া ঘেরা এক টুক্‌রো জমি। ডোবার ধারের পেয়ারা গাছের তলায় বসে পেয়ারা খাওয়া। মনে পড়ে রাঙা শাড়ী পরা ছোট মেয়ে রাধার কথা। তার সঙ্গেই ছিলো বেশী ঘনিষ্ঠতা, কোথায় গেলো সেই সব দিনগুলি। বাবার কথা তার মনে পড়ে না, খুব ছোট বয়সেই তাঁকে হারিয়েছে—চিররুগ্না দুঃখিনী মা যেদিন চলে গেলেন উঃ, সেদিনের কথা আজ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কাকাবাবু তাকে নিয়ে আসেন এই শোকাতুরা মেয়েটীর প্রতি দয়া পরবশ হয়ে। কাকিমা হিসেবী মানুষ, কাজেই কণিকার আসাটা মোটেই পছন্দ করেননি। তবে জমি জায়গা যেটুকু ছিলো সেইগুলি

কাকিমার হাতে এসে গেলো। তখন বাধ্য হয়েই এই দুর্ভাগা মেয়েটাকে আশ্রয় দিতে হলো। সংসারের ছোটখাটো থেকে সব কিছু কাজের ভার তার উপরই পড়লো, দুবেলা দু মুঠো ভাতের পরিবর্ত্তে। আজ ছায়া-ছবির মতোই এক একটা দৃশ্য ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। জ্বালা ভরা চোখ দুটো বন্ধ করতে পারছে না সে, তাকিয়ে থাকে ঘন অন্ধকারের দিকে। কোন উপায় কি নেই, যে-কোন একটা উপায়? মরণের চেয়েও গভীর আতঙ্কের ছাপ পড়ে মনে। চোখ দুটো খুলে রাখলেও সে স্বপ্ন দেখে তার কুমারী জীবনের আশার স্বপ্ন। চোখ দুটো বন্ধ করে, তাতেও কষ্ট বেড়ে যায়। সুতীব্র ব্যথার হাহাকার ছাড়া আর কি আছে তার? কতক্ষণ কেটে গেলো একটানা কান্নার স্রোতে···তারপর শান্ত হয়ে এলো সে,—ঠিক হয়েছে! সে বাঙ্গলা দেশের সহায় সম্বলহীনা মেয়ে। এই মেয়ের যোগ্য আর কি হতে পারে। এর বেশী আশা করাই ভুল। তবে যা হবার তাই হোক। সে কি একদিন চায়নি—কোন একটি মানুষকে অবলম্বন করে এই বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পেতে? আজ তো সেই প্রার্থনাই পূর্ণ হতে চলেছে, তবে এত জ্বালা কেন? ভগবান, এই যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে তাই হোক্, শক্তি দাও ঠাকুর, শক্তি দাও।

ভোরবেলায় কাকিমা ডাকেন—ওগো বাছা এবারে ওঠো। তাড়াতাড়ি করে সব সেরে নাও, দশটার মধ্যে অধিবাসে বসতে হবে, সময় বেশী নেই। নাও, এখন দরজা খোল। ছেলের মায়া করলে চলবে না। ওকে তো ছেড়ে যেতে হচ্ছে, শুধু শুধু মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই।

কণিকা দরজা খুলে দেয়। মুখের পানে তাকিয়ে কাকিমা বলেন—'ওমা! মেয়ের চোখ দুটো রাঙা জবার মত লাল টকটক কচ্ছে, একি চেহারা হোয়েছে! লোকে ছিরি দেখে বলবে কি? শুধু আজকের দিনটা একটু ভালো হয়ে থাকো, কাল থেকে যেমন খুশি তাই কোরো।'

কিছু না বলে কণিকা এগিয়ে আসে। বৈঠকখানা ঘরের সামনে

বসে কাকাবাবু পাঁজি দেখছিলেন হলুদ গায়ে লাগাবার শুভ সময় কখন আছে। কণিকার পানে তাকালেন। তার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বোধ করি মায়া হোলো তাঁর। বুঝলেন কিছু সে বলতে চায়।

কণিকা ডাকে, 'কাকাবাবু, আমি বিয়ে করব না, আপনি আমায় রক্ষা করুন। সতুকে আমি ছেড়ে যেতে পারবো না, আমি আপনার সংসারেই পড়ে থাকব, দয়া করুন এই দুর্ভাগা মেয়েকে। একদিন তো এই দুঃখী মেয়েকে আপনি কত ভালবেসেছিলেন—আজ তার জন্য কি কিছু মমতা অবশিষ্ট নেই আপনার।' তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদে কণিকা। 'জীবনে এই প্রথম আপনার মতের বিরুদ্ধে কথা বলছি, ক্ষমা করবেন আমাকে।'

কাকাবাবু বলেন, 'ওঠো মা, ওঠো। এত অধীর হচ্ছ কেন? রাজার মত ঐশ্বর্য্যশালী পাত্রের তুমি চলেছো রাজরানী হতে। সকলেই বলছে কণিকার পাতা চাপা কপাল। এ পাড়ায় এমন বড় ঘরের সঙ্গে কটা লোকেই বা কাজ করেছে। এমন ঘর, বর পাওয়া বহু ভাগ্যের কথা। তোমার ভাগ্য কজন মেয়ের আছে? এমন ভাল পাত্র কি সহজে মেলে।'

'কাকাবাবু, যে-পাত্র আপনি ঠিক করেছেন, শুধু বড় লোক, এইমাত্র তার পরিচয়? কি জানেন তার সম্বন্ধে? একটি মেয়ের জীবনের পক্ষে এই পরিচয়ই কি যথেষ্ট কাকাবাবু?'

সত্যিই আজ মেয়েটার মুখের পানে চেয়ে চৈতন্য ফিরে আসে কাকাবাবুর। 'তুমি সতুর জন্য ভেবো না, ওকে আমি দেখবো। কিন্তু এখন তো অন্য উপায় দেখি না। এ বিয়ে বন্ধ করা যায় না মা। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন, কোন চিন্তা কোর না, প্রস্তুত হয়ে নাও। সময় আর বেশী নেই।' কণিকা ম্লানমুখে চলে গেলো ধীরে ধীরে, চোখ দুটো শুধু ভরে উঠেছিলো জলে।

কাকাবাবুর মনে পড়ে কণিকার মার কথা বহুদিন পরে। মনে পড়ে

বিদায়ী ম্লান মুখের অনুরোধ : 'মেয়েটাকে সৎপাত্রে দিও ঠাকুরপো, জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছে। ওর জীবন যেন ব্যর্থ না হয়।' সেদিন কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি? সেই স্মৃতি আজ বিদ্যুতের মত তাঁর বুকের পাঁজরা খসিয়ে দিচ্ছে। সত্যিই এত দুর্বল তিনি—স্ত্রীর বুদ্ধিতে একটা অসহায়া মেয়েকে বিসর্জন দিতে চলেছেন। এতটুকু হৃদয়বৃত্তিও তাঁর নেই। কে জানে কণিকার অদৃষ্ট তাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু শুধু অদৃষ্টের উপর দোষ দিলেই কি সব শেষ করতে পারবেন আজ? কিন্তু আর তো কোন উপায় নেই এখন। এই বিসর্জনের মুহূর্তে আর কি করতে পারবেন তিনি?

পাঁচ হাজার টাকা বিয়ের খরচ হিসাবে হাত পেতে নিয়েছেন তাঁর স্ত্রী! এ ছাড়া বাড়ীখানি এই পাত্রের কাছে বন্ধক রাখা আছে। বিয়েটা হোয়ে গেলে বাড়িটা ছাড়িয়ে নিতে পারবেন। এই পাত্রের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনে লাভ আছে। তবে এখন আর ভেবে কি করতে পারেন তিনি। অভাবের জন্য আর কোন দিক তিনি ভাবেন নি। কিন্তু তবুও মনে হয় আজ, তিনি কণিকাকে ঠকাচ্ছেন। নিজের মনেই হাসলেন—এর নাম কি বিয়ে না মেয়ে বিক্রী, নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য। সবই অদৃষ্ট। নানা চিন্তা আজ তাঁর মনের মধ্যে পাক খেয়ে ঘুরে মরছে। সত্যিই কি তিনি আজ ঠকাচ্ছেন কণিকাকে —সত্যিই কি তাই? কিন্তু সকলেই তো বলছে মেয়েটার কপাল ভালো না হলে কি অমন বড় ঘরে পড়ে—এ ঘরে কুটুম্বিতা করা সে তো ভাগ্যি! একটু বয়স অবশ্য বেশী। ভাবপ্রবণতা নাই বা থাকলো—আদর যত্ন তো পাবে। নানা চিন্তা মনে আসে, স্ত্রীর ডাকে তাঁর চমক ভাঙে। 'সময় দেখা হলো তোমার?'

'এই যে, দেখে রেখেছি।'—এক টুক্‌রো কাগজে লেখা গায়ে-হলুদের শুভ লগ্ন, স্ত্রীর হাতে দিলেন।

'আচ্ছা মানুষ! আজ কাজের দিনে এমনি করে বসে থাকলে চলে! ধন্যি মানুষ।'—স্বামীকে তাগাদা দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন।

এধারে হলুদ দেবার সময় উপস্থিত। উঠানের এক পাশে কলাগাছ পোঁতা, আলপনা দেওয়া একখানা পিঁড়ি পেতে দিয়ে কাকিমা ডাকলেন, 'ওরে তোরা হলুদ ছুঁইয়ে দে ওর কপালে। কোথায় গেলি সব, লাল পেড়ে শাড়ীখানা পরে আসতে বল কণাকে—শাঁখটা বাজা।' কণিকা নির্ব্বিবাদে এসে দাঁড়ায় সজল চোখে। কাকিমা এবং আরও চারটি মেয়ে কপালে হলুদ লাগিয়ে দিলেন। মাথাঘষা লাগিয়ে দেন মাথায়, আমের ডাল দিয়ে মাথায় জল ছিটিয়ে দিলেন। কনে স্নানের পর্ব্ব শেষ হোলো শাঁখের শব্দে পাড়া মুখরিত করে। এবার পাড়ার মেয়েরা তত্ত্বের জিনিষ-পত্র উঠিয়ে নিয়ে ঘরে ভরতে লাগলো। সকলের মুখে তত্ত্বের প্রশংসা, সত্যি এমন দেওয়া কটা লোক দিতে পারে? শাড়ীখানা কত দামী। সৌখিন জিনিষ-পত্রও তো অনেক দিয়েছে। মানুষটার সখ্ আছে বলতে হবে। বড় থালায় ভরে মিষ্টি ; আজকাল তো এসব চোখে পড়ে না। দেখিস ভাই কণা, বিয়ে হয়ে গেলে ভুলে যাস্‌নে আমাদের। দেখ ভাই, কি সুন্দর এই বেনারসী, এই ঢাকাইখানা।

কণিকা ঘর বন্ধ করে দিল, সারা দিনের মধ্যে সে-দরজা কেউ খোলাতে পারেনি। তাই নিয়েই পাড়ার মেয়ে-বৌয়েরা মন্তব্য প্রকাশ করলে যখন ডাকাডাকিতেও কণিকা বন্ধ দরজা খোলেনি। তারা সকলে মিলে জটলা করে—কি মেয়ে বাবা, বিয়ের দিন কোথায় একটু আনন্দ করব তা নয়, মেয়ে গোঁসা করে খিল দিলেন। কেন রে বাপু এত দুঃখ? আর একজন বলে, 'আহা, ছেলেটার মায়ায় জড়িয়ে পড়েছে তাই, ওকে ছেড়ে চলে যেতে হবে—হাতে করে মানুষ করেছে তো।' পাড়ার মেয়ে বিন্দু বলে, 'না গো না, তোমরা কিছু বোঝ না, বুড়ো বর ওর পছন্দ নয়। তা বাপু কি আর করবে বলো? যার যেমন ভাগ্য! চল যাই খুড়িমার কাছে। বিয়ে বাড়ীতে শুধু গল্প করলে খুড়িমার কাছে কথা শুনতে হবে।' রান্নার চালার কাছে এগিয়ে আসে, —ঠিকে বামুন এসেছে রান্নার জন্যে। হাতা খুন্তির শব্দে—মাছ মাংসের

গন্ধে ও আনন্দিত ছোট বড় মাঝারি দলের অসংযত চিৎকারে বিয়ে বাড়ী সরগরম হয়ে উঠেছে। পাড়ার গিন্নীরা এসেছেন, দেখছেন; আদেশ করছেন বৌ-ঝিয়েদের উপর। তাদের ওপরেই তো সব ঝক্কি! বরণ ডালার খুঁটিনাটি থেকে রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা সবই তাদের দেখতে হচ্ছে, সকলেই ব্যস্ত। বড়লোক কুটুম্ব আসছেন, কোন ত্রুটী না হয়।

বেলা গেল। সূর্যাস্তের সোনালি রং বুঝি শেষ হয়ে এলো।

পাশের বাড়ীর ছোট বৌ কনে সাজাবার সব জোগাড় করে রেখেছে—লাল ফিতে, চটালো চুড়ি, মাথার কাঁটা, কনে-চন্দন, ফুলের মালা, আরো কত কি খুঁটিনাটি জিনিষগুলি হাতের কাছে গুছিয়ে রাখছে, কনে সাজাবার ভার পড়েছে তার ওপর। কণিকার পিসিমা এসে দাঁড়ালেন, 'বৌদি কোথায়?'

—এই যে কাকিমা এধারেই আসছেন।

পিসিমা বলেন, 'আসতে দেরী হলো, অতদূর থেকে আসা, সব গোছগাছ করে এলাম।'

'তা হোক, বিয়ে তো অনেক রাত্রে; এই দেখো ঠাকুরঝি, এই হাল ফ্যাসানের বালা গড়িয়েছি—ভাল হয়নি?'

'বেশ হয়েছে, ঘটক বিদায় বুঝি এই বালা জোড়া?'

কাকিমা বলেন, 'এসো ভাই ঠাকুরঝি, মুখে একটু জল দাও, তারপরে দেখাবো আমার জন্য তোমার দাদা কত সুন্দর একখানা শাড়ী এনেছেন। ভাইঝির বিয়ে, তোমরাই তো আনন্দ করবে আজ। চল, জিনিসপত্র সব দেখবে। সাধ্যমতো খরচ করেছি, বেশী দেবার ক্ষমতা তো নেই, যেটুকু না হলে চলে না তাই করেছি মাত্র।'

পিসিমা বলেন, 'কণি কোথায়? তাকে তো দেখছি না।'

কাকিমা বলেন, 'ঐ যে কোণার ঘরে দরজা বন্ধ করে আছে, সারাদিন মুখে একটু জলও দেয়নি। ওরে বিন্দু, দেখ তো কণা কোথায়, পিসিমা এসেছেন, বল।' পিসিমা নিজেই এগিয়ে যান ছোট ঘরের দিকে। দরজা খোলা, কিন্তু কণিকা? কোথায় সে?

সতু কাঁদছে মার জন্যে, ভয় পেয়েছে সে—কাকাবাবু তাকে কোলে তুলে নেন। তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে কণিকার মিনতি-ভরা সজল চোখ দুটো—কাকাবাবু আমায় রক্ষা করুন, আমি বিয়ে করবো না। পিসিমা এগিয়ে এসে বলেন, 'দাদা! মেয়েটার মা-বাপ নেই বলে এমন করে বিদায় করতে হয়? কোথা থেকে এক বুড়ো বরের হাতে অমন মেয়েটাকে তুলে দিতে একটুকুও দ্বিধা হলো না। নিজেদের স্বার্থের জন্যে একটা মেয়ের এমন করে সর্বনাশ করে, ছিঃ ছিঃ—'

পিসিমার চোখ জলে ভরে এলো, কাকাবাবু নীরব রইলেন। 'এখন মেয়েটা গেলো কোথায়, কে জানে? এ বিয়ে বন্ধ কর দাদা।' কাকিমা, তাঁর রুদ্ধ রোষ প্রকাশ করতে সাহস করলেন না, কারণ ননদকে তিনি ভালভাবেই চেনেন, কিন্তু চুপ করেও থাকবার মতো লোক তিনি নন, বল্লেন, 'মেয়েও তো কচি খুকিটি নেই ঠাকুরঝি, তার ওপর নেই পয়সা, কাজেই এমন পাত্র ছেড়ে দেওয়া যায় না। চেষ্টা তো অনেক করা গেলো, ভাল পাত্র আর জুটলো কোথা? জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, এই তিনটি মানুষের হাতে নয়। এখন অধিবাসের পরে ওকে বিয়ে করবে কে? তাই বলি, আর বাধা দিও না—ভালয় ভালয় দু' হাত এক হয়ে যাক।'

পিসিমা বলেন, 'সে হয় না, এমনি করে মেয়েটার জীবন নষ্ট করবে তোমরা! বিয়ে যদি নাই করে, নিজের ওপর ভরসা করে চলবার মতো পথ অনেক আছে। পড়াশুনো করুক, তারপর ও নিজেই পথ বেছে নেবে। আমি ওকে নিয়ে যাবো—ওই ষাট বছরের বুড়োর হাতে ওকে আমি কিছুতেই দেবো না।'

'পাত্রের খবর কোথা থেকে পেলে ঠাকুরঝি এর মধ্যে? ঐ পাড়ার ছেলেরা বলেছে তো? ওরা কি সব ষড়যন্ত্র করছে তা আমি জানি। লোকের কাছে মুখ দেখাতে দেবে না দেখছি। এতদূর এগিয়ে এখন কি আর বিয়ে বন্ধ করা যায়? আজই রাত্রে বিয়ে।

অপরের কথায় কান না দিয়ে—মেয়েটার জীবনে সুখ শান্তি নষ্ট যাতে না হয় তাই দেখাই আমাদের উচিত।'

এধারে চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গেছে, কণাকে পাওয়া যাচ্ছে না। পিসিমা এগিয়ে গেলেন দীঘির ঘাটের দিকে, মনে ভয় হয়, কি জানি মেয়েটা এতক্ষণ আছে কি না। কিছু দূরে গিয়ে দেখলেন সামনের পেয়ারা গাছের নীচে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে, দেখলেন গ্রামেরই ছেলে চুনীলাল। পিসিমা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কি দুঃসংবাদ বহন করে এনেছে এই ছেলেটা! পিসিমা এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে কেন চুনী, কিছু খবর আছে কি?'

'কণাকে পাওয়া যাচ্ছে না শুনলাম তাই এসেছিলাম খবর নিতে। সে কোথায়? সত্যি কি এখানে নেই?' 'না বাবা, সে চলে গেছে।' পিসিমা চোখে কাপড় দিয়ে কাঁদতে লাগলেন—'কি হবে বাবা! তুমি একবার দীঘির ধারে যাও বাবা—সে যা অভিমানী, এতক্ষণ সে কি আর আছে, সব শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ বাবা, যদি তাকে পাই, এ বিয়ে বন্ধ করতে পারবে তোমরা?' ছেলেটি হাসে, 'পিসিমা, পাঁচ হাজার টাকা কাকিমার হস্তগত হয়েছে। বিয়ের জন্য খরচ হচ্ছে ৫০০৲ শত টাকা—হয়তো তারও কম হবে। তবে কাকিমার গহনা এর মধ্যেই এসে গেছে। এখন বন্ধ করা কি সম্ভব? তবে আজ খুড়োকে উচিত মতোই শিক্ষা দেবো আমরা—সে সব বন্দোবস্ত করেছি—আপনি ভয় পাবেন না, ভিতরে যান, আমি দেখছি।'

মন্দিরের সামনে প্রকাণ্ড পুকুর, দু'ধারে ঘাট বাঁধানো, জল থৈথৈ করছে। সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারের ছায়া পড়েছে দীঘির কালো জলে। পশ্চিম ধারে প্রকাণ্ড একটি বটগাছ ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা মোটা ডাল প্রায় জলের উপর ঝুঁকে পড়েছে। বাঁধানো চাতালের পাশেই একটি ফলশা গাছ। তার তলায় একটি ক্ষীণাঙ্গী মেয়ে চুপচাপ বসে আছে—কিসের চিন্তায় মগ্ন। মধ্যে মধ্যে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে যায়—মেয়েটি জলের

ধারে এগিয়ে আসে—বোধ করি ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালো। তারপর ধীরে ধীরে নেমে আসে জলের শেষ ধাপে, কিছুক্ষণ দাঁড়ালো, তারপর দেখলে দূরে একটা আলো দপ্ করে জ্বলে উঠে নিভে গেল। মেয়েটি ভয়ে শিউরে ওঠে—তারপর আপনার মনেই হাসে, আত্মহত্যা করতে চলেছে সে, তার আবার এত ভয়! ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে।

যখন জ্ঞান ফিরে এলো সে দেখলে একটি তাঁবুর মধ্যে ক্যাম্পখাটে শুয়ে আছে। একটি সুদর্শন যুবক তার সেবা করছে। সে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, 'আমি কোথায়? কেমন করে এলাম এখানে?'

'বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন আপনি, ব্যস্ত হবেন না, সব আপনাকে বলছি। আপনি কোথায় থাকেন আমাকে জানালে আমি আপনাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসব। এখন বলুন তো, আপনি এভাবে আত্মহত্যা করতে চলেছিলেন কেন? ঠিক সময়ে উঠিয়ে এনেছিলাম তাই কোন ক্ষতি হয় নি। দেরী হলে কী হতো!'

কণিকা নীরবই থাকে—কোন কথা বলে না। ছেলেটি বলে, 'আমার নাম শ্যামল, এটা আমাদেরই ক্যাম্প। আপনাকে পুকুরধারে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এই রকম একটা অনুমান করেছিলাম। সেই জন্যেই আমরা কয়েকজন ছিলাম। সেই সময় ওখানে না থাকলে আপনাকে তুলে আনা সম্ভব হতো না।'

'কেন আমায় বাঁচালেন আপনারা?' কণিকা বলে, 'মৃত্যু তো জীবনে আসে একটিবার, সারা জীবন মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করা সে কি ভয়ঙ্কর, কেন আমায় বাঁচালেন?' এখন বাড়ী যাবার নামেও ভয় লাগে। সে আর ভাবতে পারে না।

'আমি আপনাকে জিপে করে পৌঁছে দিয়ে আসছি, বলুন,—কেন মিছে মন খারাপ করছেন।'

'না না, আমি একাই যাচ্ছি। আপনি অনেক কষ্ট করেছেন। অনেক ধন্যবাদ।'

'সে হয় না, চলুন, খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে আসি। এ অবস্থায় আপনি অতটা পথ হাঁটবেন না।'

কণিকা আর কিছু বলতে পারলে না, তবুও তার ভয়—কি করা যায়! বাড়ীতে কাকিমার সামনে কেমন করে যাবে সেই ভয়েই শঙ্কিত হয়ে ওঠে সে। নীরবেই উঠে বসে জিপে, উপায় নেই। মাঝ পথেই দেখা হলো চুনীলালের সঙ্গে। সে বলে, 'এই শ্যামল, দাঁড়া এখানে'—কণাকে বলে—'কণা, তুমি এখানে?'

'হ্যাঁ চুনীদা, ইনিই আজ আমাকে বাঁচিয়েছেন।' এই বলে সে খুব খানিকটা কাঁদতে লাগলো।

'এধারে তোমাকে খুঁজে খুঁজে আমরা হয়রান হয়ে পড়েছি, আর তুমি বেশ নিশ্চিন্তে জিপে করে হাওয়া খাচ্ছো। এধারে তোমার বর যে বাঁধা রোশনাই নিয়ে বেরিয়েছেন। গ্রামের কাছেই তোমার জীবনের শুভক্ষণ উপস্থিত, চলো এখন।...আয় শ্যামল, কাকাবাবুর হয়ে তোকে নিমন্ত্রণ করতে এলাম—কণার বিয়ে। ষাট বছর বয়স হতে চলেছে বরের, বিয়ের সাধ মিটিয়ে দিয়ে আসি।'

এধারে বরের গাড়ী বড় শড়ক পেরিয়ে গ্রামের সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে এলো—অমনি চারিদিক থেকে বড় বড় থান ইট, পাথর ছুম্‌দাম্‌ করে বরের গাড়ীর উপর এসে পড়তে লাগলো। বেচারা তখন ভয়ে চিৎকার করছে। পাড়ার ছেলেরা গিয়ে হৈচৈ বাধায়, লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো, কয়েকজন এগিয়ে গিয়ে বেশ উচিত মতো শিক্ষা দিলে এবং সঙ্গে যা কিছু টাকাকড়ি ছিলো জরিমানা স্বরূপ সব কেড়ে নিয়ে বরকে গ্রামের বার করে দিলে, এবং জানিয়ে দিলে এ জীবনে তার এমনি বিয়ের সাধ আর কখনও যেন মনে না জাগে। বরযাত্রী যে কয়েকজন ছিল তারা অপমানিত বোধ করে কণিকার কাকাকে নানা-রকম কথা শোনাতে লাগলো। তিনি হাত জোড় করে তাদের কাছে বহু অনুনয় করতে লাগলেন যাতে তারা খাওয়া দাওয়া করে যায়। পাড়ার ছেলেদেরও যথেষ্ট শাসন করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু

হলো না। এধারে কাকিমার সব আক্রোশটুকু কণিকার উপর গিয়ে পড়লো—কারণ কণিকাই যে বিয়ে পণ্ড করেছে এই ধারণাই তাঁর বদ্ধমূল হলো। পাত্রপক্ষ তাদের টাকা ফেরত চাচ্ছে, এখন উপায় কি? বাড়ী ঘর পর্যন্ত চলে যাবে।

বর তো চলে গেলো দলবল নিয়ে—পড়ে রইল শুধু খুঁৎ-পড়া মেয়ে কণিকা। মুখে মুখে শুরু হয় নানা রকমের আলোচনা। কণিকার অবস্থা সহজেই বোঝা যায়। এধারে লগ্নও শেষ হয়ে যায়, পুরোহিত জানায়। হঠাৎ ভিড়ের ভেতর থেকে চুণীলাল বেরিয়ে এসে বললে, 'কিছুক্ষণের জন্য দয়া করে থামুন—আমি কিছু বলতে চাই।' কাকা, কাকি, খুড়িমা, জ্যেঠিমার ছড়াছড়ি সেখানে। কুৎসা, দলাদলি, সামাজিকতা লেগেই আছে। গ্রামের এই বৈশিষ্ট্য। সকলেই চুণীর কথায় উৎসুক হয়ে রইলেন। কি নতুন খবর আবার এলো! চুণী কি কথা শোনাবে! চুণীলাল নিয়ে এলো শ্যামলকে—কাকাবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। তারপর বললে, 'এর হাতে কণিকাকে দিতে আপনার আপত্তি আছে কি?' শ্যামল লজ্জিতভাবে এসে দাঁড়ায়। কাকাবাবু আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়ে দুহাতে শ্যামলকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, 'তুমি বাবা আমাকে বাঁচাও, তোমার কাছে চিরদিন ঋণী হয়ে রইলাম।' শ্যামল বলে, 'এসব কি বলছেন কাকাবাবু। আপনি গুরুজন, ওসব কথা বলতে নেই।' চুণী শ্যামলকে এনে সম্প্রদানের কাছে বসিয়ে দিলে, 'কি বলেন আপনি? কণিকাকে নিয়ে আসি?' ওর মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠলো, 'ও মেয়ের বিয়ে এমনই হবে, তা ছাড়া আর কে বিয়ে করবে।'

লাল শাড়ী পরা কান্নায় উদ্বেল কণিকাকে এনে বসিয়ে দিলে পিঁড়িতে—শ্যামলের মুখোমুখি বসলো সে—কাকাবাবুই উৎসর্গ করলেন। পুরুতঠাকুর মন্ত্র পড়লে, শ্যামলের প্রসারিত হাতের উপর ঠাণ্ডা একখানা সাদা হাত তুলে দিলেন কাকাবাবু। ফুলের মালা জড়িয়ে

দিয়ে পুরুত শান্তি মন্ত্র পাঠ করলে। ঘোমটা ঢাকা কণিকার চোখের দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ, কিছু পরিবর্ত্তন হলো না। শুভদৃষ্টির সময় এসিট্যালিন গ্যাসের আলোতে দেখা গেল মুদিত চোখ দুটি ক্লান্ত। একটী সুশ্রী মুখ, শ্যামল তাকিয়ে রইল সেই করুণ মুখের পানে।

অল্প সময়ের মধ্যে খুব সংক্ষেপে বিয়ের পাট চুকলো। পিসিমা জোরে জোরে শাঁখ বাজাতে লাগলেন। খুশি মনে এগিয়ে এসে বললেন, 'ও বৌদি, দেখো কি সুন্দর জামাই হয়েছে তোমার, বর তুলে নাও, পেট ভরে সকলকে এবার খাওয়াও। আজকের এমন শুভদিন।' চুণীলাল ছুটোছুটি করে বড় বড় হাঁড়ি নিয়ে পরিবেশন করতে লাগলো। স্ত্রী পুরুষের মিলিত কলরবে বাড়ী সরগরম। কতদিন এমন আনন্দ করেনি তারা। ক্রমে রাত অনেক হয়ে এলো, একে একে অতিথিরা বিদায় নিলে। কাকাবাবু এসে দাঁড়ালেন আঁচলে আঁচল বাঁধা মেয়ে জামাইয়ের সামনে। আহা, সুখী হোক মেয়েটা। বিন্দি কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বলে, 'কপাল করেছিল বটে।' সতুকে এনে কাকাবাবু বসিয়ে দেন কণিকা ও শ্যামলের মাঝখানে। তারপর শ্যামল তাকে বুকে তুলে নিলে, ছেলেটির মাথায় কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়লো। আজকের দিনে হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট সতুকে কাছে পেয়ে মনে পড়ে—সেই একদিন, দুদিন, তারপর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলে গেলো।

দেশ দেশান্তরে কি ছুটোছুটি—এই মা হারা ছেলেটির জন্য। ছায়া-ছবির মত আজ সে সব দৃশ্য ভেসে উঠলো শ্যামলের চোখের সামনে। ছেলেটি সরে এলো তার আরও কাছে। ছোট্ট ভীরু পাখীর মতোই বুঝি আশ্রয় নিলে বাবার বুকের মধ্যে।

শ্যামল কণার কোলে তুলে দিলে সতুকে। সতু বলে—'মা, মা, আমার ঘুম পাচ্ছে। চলো গল্প বলবে।'

সতুর আজকের এই মা ডাকটি কেমন এক স্বপ্নজাল রচনা করলে,

সে কোলে তুলে নিল সতুকে। চন্দনচর্চ্চিত কপালে রাঙা শাড়ীর আভায় মুখখানা গোলাপী হয়ে উঠলো।

মুগ্ধ শ্যামল তাকিয়ে রইল কণিকার সেই সুন্দর মুখের পানে, সে ভাবে—ভাগ্যিস এ গ্রামে এসেছিলো, তা নইলে এমন সুন্দর স্মরণীয় দিনটিই জীবন থেকে বাদ পড়ে যেতো।

কথিকা

শরৎ

ছেলেবেলা থেকেই দেখে এসেছি এই পৃথিবীকে নানা সাজে। গ্রীষ্মের প্রখর তপন তাপে সে গৈরিকবসনা যোগিনী। নববর্ষের নবীন জলধারায় স্নাত, পীত আভরণে বিজড়িত, মেদুর মেঘের তালে কম্পমানা তার অপরূপ লাবণ্য। শরতে যেন সে ছলনাময়ী কিশোরী, শেফালি কাশের গুচ্ছে সজ্জিতা কান্না হাসিতে ভরা।

আবার হেমন্তে তারি অঙ্গে দেখেছি আসন্ন বিষণ্নতার ছোঁওয়া। শীতে সে সর্ব্বহারা রিক্তা—নীলকান্তের গভীর ধ্যানে মগ্না। বসন্তে অপরূপা, অবর্ণনীয়া সালঙ্কারা—সে আপন উচ্ছল প্রাণ-প্রাচুর্য্যে বিস্মিতা লাস্যময়ী সুন্দরী।

এই মহানগরীর লৌহ কাঠিন্যের অন্তরালে, লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন যাত্রার সাথে সাথে তাল রেখে বহে চলেছে—পৃথিবীর রূপ ও বাসর ধারা। কর্ম্মব্যস্ত মানুষের কতটুকুই বা অবসর আছে আপনার মনের মণিকোঠায়—সেই রূপ, রস ও গন্ধের নির্য্যাস সংগ্রহ করে নেবার। তবু তো প্রকৃতি আসে তার ঐশ্বর্য্যের ডালি সাজিয়ে, ঋতুতে ঋতুতে, আমাদের এই সহরের পথে ঘাটে, অলিতে গলিতে, ধনীর প্রাসাদের অভ্যন্তরে, গরীবের প্রাঙ্গণে।

নিত্য কর্ম্মের কোলাহলের ক্ষণিক অবসরেও, মন যখন চকিত বিস্ময়ে উপলব্ধি করে এই প্রকৃতির মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তনের সুধারস, তখনি জানতে পারি কি নিবিড় সম্পর্কে আমাদের জীবনধারা বাঁধা পড়ে আছে এই ধরণীর সীমাহীন সৌন্দর্য্য-প্রবাহের সঙ্গে।

আজ বর্ষণক্লান্ত শরতের দিন এলো আমাদের প্রাঙ্গণে, তার পরিচয় পাচ্ছি কি শুধুই ঐ আকাশের নীলিমায়! শুধুই লঘুপক্ষ,

চলমান মেঘের দর্শনে, শুধুই কি মৃদুমন্দ বাতাসের অলসতায়, শুধু কি সোনালি রোদের মৃদু স্পর্শে! না, তার পরিচয় পাচ্ছি—আপনার এই চিরপরিচিত গৃহকোণেও।

এমন একদিন ছিলো, যখন প্রতি বাঙ্গালীর ঘরেই ঋতুবন্দনা স্থান নিয়েছিলো। নানা মেয়েলি ব্রতের মধ্যে দিয়ে ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যে দশা বিপর্যয় ঘটতো সেগুলিকে জাগিয়ে রাখবার ইচ্ছা এবং চেষ্টাতেই এই সকল ব্রতের উৎপত্তি।

বাঙ্গলার নিজস্ব বার ব্রত মেয়েলি সাহিত্যের একটী বিশেষ সম্পদ। এ যুগে এর প্রচলন যথেষ্ট কমে এলেও বাঙ্গলার পল্লী মেয়েদের কাছে এর সমাদর আছে, পল্লীর পুরাঙ্গনাগণ প্রকৃতি দেবীর এই অবদানকে প্রাণ ভরে গ্রহণ করেছেন। মনে পড়ে এমন একটী দিনের কথা—কি ভীড় জমতো ভোরের বেলায় শিউলি ফুল কুড়োবার জন্য পাশের বাগানে! সেই ফুলে গাঁথা হোতো মালা, তারই রঙে হোতো কপালের টিপ্। বোঁটার রংয়ে ছোপানো হোতো শাড়ী, সাজিভরা ফুল তুলে নিয়ে ঝম্‌ঝম্ মল বাজিয়ে মেয়েরা ফিরতো ঘরে। প্রতি দিনের কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে বিশেষ ঋতুর নিঃসঙ্গ প্রভাব বিস্তারিত হোতো সুনিশ্চিত ভাবে নিজের ঘরের মাঝেও। মনে পড়ে এমন একটী দিনের কথা যখন এই শরতের শিহরণ লেগেছে ঘরে ঘরে, বেজেছে পূজার বাঁশী, এই উৎসবে বাঙ্গলা দেশে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আনন্দের এক নূতন চাঞ্চল্য জেগে উঠতো।

ভীড় জমবার আগে থেকেই পূজার বাজার সুরু হলেও তা শেষ হোতো পঞ্চমী তিথিতে। দালানে শুরু হোতো প্রতিমা গঠনের কাজ। কর্ম্মব্যস্ত কুমোরের ঠুক্ ঠাক্ শব্দে ও ছোট ছেলেদের হাস্য কলরবে জায়গাটী মুখরিত হয়ে উঠতো। বর্ত্তমানে উৎসব রয়েছে কিন্তু সেই পরিবেশের হয়েছে আমূল পরিবর্ত্তন।

আধুনিক যুগে বারোয়ারী পূজার হয়েছে প্রচলন, নূতনতর শিল্প রুচির পরিচয় পাই বিভিন্ন পূজা-মণ্ডপে। কিন্তু সেই ফেলে-আসা

অতীতের স্মৃতি আজও জেগে আছে মনের মণিকোঠায়। শরৎ কালের উৎসব শারদীয় পূজা। অপূর্ব্ব আনন্দের সুরে আকাশ বাতাস ও মন মেতে ওঠে।

এই সহরের বুকেই আসে শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, কি জানি কোন সে সোনার কাঠির যাদু স্পর্শে—বদল হতে থাকে অতি সঙ্গোপনে পুরবাসীদের জীবনযাত্রা।

এমন একদিন ছিল যখন এই রং বদলের নিদর্শন পাওয়া যেতো অতি সুস্পষ্ট রূপে— ঘরে ঘরে, পথে ঘাটে, পোষাকে পরিচ্ছদে, বাজারের দ্রব্য সম্ভারে। আমাদের দেশে প্রায় তাই সকল অনুষ্ঠানই জড়ানো আছে ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে। কোন উৎসবই ব্যাপকতা লাভ করে না ধর্ম্মানুষ্ঠানের বাইরে। সর্বভারতীয় আনন্দোৎসবে ঋতু পূজার কোন নিদর্শন পাই না। জাপানে যে ঋতুতে 'চেরি ফুল' ফোটে তখন সেখানে হয় চেরি উৎসব। এই উৎসবটি হোল-জাপানের জাতীয় উৎসব। কি নগরবাসী, কি সহরবাসী, কি গ্রামবাসী ঐ কয়টি দিন নিজেদের মগ্ন করে দেয় এই উৎসবে। এই জাতীয় লোক-উৎসবের প্রেরণা নেই আমাদের দেশে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে, নাটকে, নৃত্যনাট্যে এই কথাটি বার বার লোকচক্ষে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

প্রকৃতি ও মানুষের মিলনানন্দের ছবি তিনি বারে বারে এঁকেছেন তাঁর বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, ফাল্গুনীর মধ্য দিয়ে। সে আবেদন সীমাবদ্ধ হয়ে আছে মুষ্টিমেয় রসিকের মধ্যে। আমাদের জীবনযাত্রা মধুর হয়ে উঠতে পারে আমাদেরই প্রয়াসে, এই সহরের বুকেই। আজ শরতের আলোছায়ার খেলা চলেছে এই সহরের চিরপরিচিত পরিবেষ্টনীর উপরে। যে জীবন চলেছিল মন্থর গতিতে বর্ষার ঘন আবরণের তলায়, তার ছন্দ গেছে বদলে, হয়ে উঠেছে চঞ্চল। পথে চলেছে যাত্রীর দল দ্রুত পদক্ষেপে, ক্লান্ত চাহনি হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল। ঘরের কোণার পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা হঠাৎ চোখে পড়ে। পরিষ্কার করার আহ্বান জাগে মনে। বুঝি ওই নীল আকাশের

নির্ম্মলতা পরিব্যাপ্ত হবার প্রয়াস পায় আমাদের এই ছোট্ট গৃহের কোণে।

যদি শিক্ষার দ্বারা প্রচারের মাধ্যমে জাগিয়ে তোলা যায় আমাদের ঘুমিয়ে পড়া রসপিপাসু মনকে, তবেই একাজ সহজ ও সরল হবে।

সে যুগে এমন একদিন ছিলো, যখন আজকের এই কাঁচা রোদের সঙ্গে রং মিলিয়ে পুরনারীরা পরতেন বাসন্তী রং সাড়ী, মাথায় জড়াতেন শিউলি ফুলের মালা। এই সহরের মানুষও প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের ছোঁয়ায় নিজেকেও বদল করে নিতো। তখন যেন ছিলো সহজ সম্পর্কের বাঁধন।

দাক্ষিণাত্যে আজও জানি এই ফুলের ব্যবহার কত আদরের সামগ্রী। ফুলের সাজে প্রতি সন্ধ্যায় দক্ষিণী মেয়েরা নিজেদের অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করেন।

বর্ষার ঘনঘোর কোলাহলের মধ্যে মানুষ হয় উন্মনা— ঘটে তার বিভ্রম। প্রকৃতির দুর্যোগের সাথে চলে সে নিত্য দ্বন্দ্ব। তারপরে, আসে যেদিন বিরাম, সেদিন অকারণে যেন সে নিজেকে মনে করে ভারমুক্ত। মন তার নির্ম্মল আকাশের নিচে খেলা করে বেড়াতে চায়। নিজেরই গড়া খেলাঘরের মধ্যে, নূতন সাজে সাজাতে চায় আপনার সংসারের প্রতিটি কোণ। পাশ্চাত্ত্য দেশে এই ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পণ্যদ্রব্যের পশারীরা খরিদ্দারের মনের খোরাক যোগায়, নানারকম ফ্যাশানের সৃষ্টি করে—যথা, Summer fashion, Autumn fashion, Spring fashion ইত্যাদি। মানুষের মনের চাহিদা মেটাতে মানুষকে সুরুচিসম্পন্ন করে তুলতে ওদেশের মানুষেরা সদাই ব্যগ্র।

এদেশের মানুষ, বিশেষ করে সহরবাসীর দল, ভেসে চলেছে সুরুচি-কুরুচির স্রোতে, নাবিকহীন নৌকার যাত্রীর মতো।

আজ শরৎ এসেছে তার পদ্মফুলের সম্ভার নিয়ে বাঙ্গলার জলাশয়ে, তার কিছুটা উৎসর্গিত হবে পূজার বেদীমূলে, বাকি

অবহেলিত পদ্মগুলি হয়তো শুকিয়ে যাবে অনাদরে। কয়টী গৃহ-কোণই বা সুরভিত করে থাকে পদ্মফুলের অমলিন সুষমায়।

কোন সে যুগে প্রচলন হয়েছিলো "ফুলদোলের", বিবাহ-অনুষ্ঠানের সব চেয়ে মধুর ফুলশয্যার। তার নিদর্শন আজও রয়ে গেছে আমাদের সামাজিক জীবনে। ফল, ফুল, পত্র হোলো প্রকৃতির নিত্য পরিবর্ত্তনের নিদর্শন, তাই তার আদর যুগে যুগে মানুষ করে এসেছে নানা ভাবে—সম্রাটের সভায়, কবির কণ্ঠে, রূপসীর আভরণে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মাধ্যমে।

অনেকেই জানেন বোধ হয়, "ক্রীসানথিমাম" ফুল জাপানের জাতীয় ফুল। তারা এ ফুলের স্থান দেয় সবার উর্ধ্বে। আমাদের দেশেও এককালে ছিলো এই ঋতুবন্দনার জাতীয় আদর; প্রায় দুশো বছর আগে—মোগল সম্রাট মহম্মদ সাহ রঙিলা দিল্লীর প্রান্তে গ্রামের বুকে এক অপরূপ ফুলের মেলা বসান "সবের এ গুল্ করোসান্"। সে উৎসবে যোগ দিতো সহরবাসী, গ্রামবাসী। সবাই বহে আন্তো ফুলের সম্ভার, তৈরী করতো ফুলের মালা, তোড়া, ফুলের ঝালর, ফুলের পাখা, সারাদিন ধরে লোকে মগ্ন থাকতো হাসিখুসি মেলামেশায়, নাচে গানে। বহু বছরের সেই উৎসব, সেই কবিসম্রাটের স্মৃতি আজও জাগিয়ে রেখেছে দিল্লির প্রান্তে। সবই গেছে বদলে, তবু মানুষ তার রসপিপাসু মনের আকাঙ্ক্ষা মেটাচ্ছে সেই দুশো বছর পূর্ব্বের প্রবর্ত্তিত উৎসবের মধ্যে দিয়ে।

এই ধরণের উৎসব ও মেলার ব্যাপ্তি যে বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই।

পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতির এই যে শারদশ্রী, আজ আমাদের এই বর্ষণক্লান্ত বুকে এনেছে নব অরুণের স্পর্শ। তার ছোঁয়া লেগেছে সহরবাসীর বুকের অন্তঃস্থলে। সে পথ খুঁজছে প্রকাশের জন্য, নানা ছোটখাটো পরিবর্ত্তনের আশায়, নিজেরই একান্ত ঘরটীর বা পরিজনের পরিচর্য্যার মধ্যে দিয়ে। গৃহিণী যাঁরা তাঁরা ব্যস্ত হচ্ছেন নতুন

তরকারি শাকশজি প্রভৃতি বাজারের আশায়। তাঁদের মনের কোণে যে অকারণ তৃপ্তির আস্বাদ, তার ভাগ দিতে চান, ছড়িয়ে যেতে চান আপন প্রিয়জনদের মধ্যে।

এমনি করে যদি সকল মানুষ নিজের আনন্দের ভাগটুকু বণ্টন করে নেন সবার সাথে, তবেই এই শরতের সুষমা ছড়িয়ে পড়বে ঘরে ঘরে, পথে ঘাটে, মহানগরীর রাজপথে। প্রকৃতির বন্দনা প্রকৃত স্থান পাবে আমাদের জীবনে যদি তাকে ছড়িয়ে দিতে পারি উৎসবে, নাচে গানে, পোষাকে, পরিচ্ছদে, গৃহসজ্জায়, পরস্পরের ভাবের আদান প্রদানে, প্রকৃতির অপর্য্যাপ্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারের প্রকৃষ্ট ও সুরুচিপূর্ণ দৈনন্দিন ব্যবহারে।

হেমন্ত

হেমন্তের প্রথম হিমেল হাওয়া এসে লাগছে গায়ে। যেন কার শীতল দীর্ঘশ্বাসের মতো—বুঝি হিমাচল-দুহিতা, তপোরতা পার্ব্বতী মহাদেবের ধ্যানে ক্লান্তা, অবসন্না—তারই সঙ্গে ছন্দ রেখে প্রকৃতি যেন মন্থরা; আসন্ন শীতের শঙ্কায় কম্পিতা। ক্লিষ্টা গিরিবালা গৌরীর অর্দ্ধ নিমীলিত নীল চক্ষুর মতোই শূন্যে নীলাকাশ কুয়াসাচ্ছন্ন। যেন কোন যৌগিক প্রক্রিয়ার বলে সারা বিশ্ব ধীর গম্ভীর। উষার নূতন আলো এসে পড়েছে আমাদের এই সহরের বুকে, হাল্কা কুয়াসার পর্দ্দার ওপার থেকে।

সেই চেনা সহরের অতি পরিচিত পথ ঘাটের চেহারা গেছে বদ্‌লে।

মানুষের চলনে, বলনে এসেছে যেন সামান্য পরিবর্ত্তনের আভাস। শরতের নির্ম্মলতা হয়ে এসেছে যেন সামান্য মলিন। ভোরের আলোয় দেখেছি কঠিন ইট পাথরের পথঘাটের বুক ভিজে গেছে, যেন ক্রন্দন-রতা রাত্রির শিশিরবিন্দুতে।

জানালায় দাঁড়িয়ে দেখা যায়—সামনের রাস্তা চলে গেছে সর্পিল ভঙ্গিতে। তারই ধারে ধারে দোকান-পাট—যেন সদ্য ঘুম থেকে

জেগে উঠেছে, একের পর এক ঝাঁপ খুলছে। যে সহর জেগে উঠতো অন্ধকার থাকতেই, আজ তার যেন হচ্ছে সামান্য দেরী—যেন আলস্যে ভরা তার সারা অঙ্গ।

ফুটপাথবাসীরা বসেছে ঘেঁষে খাবারের দোকানের প্রজ্জ্বলিত চুলার কাছে, সামান্য আগুনের তাপের লোভে।

দু চারটী পথচারীর গায়ে চেপেছে হয়তো একটা মোটা চাদর, নয়তো বিলাতি গেঞ্জি। চায়ের দোকানে লেগেছে ভীড়। ঐ যে চলেছে সজ্জিওয়ালা তার পশরা নিয়ে—তার ঝাঁকাতেও বদলে গেছে অনেক কিছু। প্রকৃতির অপর্য্যাপ্ত সম্ভার, ধরিত্রীর ধন, নতুনরূপে প্রকাশ পেয়েছে ওর পশরা বোঝাই করে দিতে। আর দিতে চায় সহরবাসীকে রসনার নব নব তৃপ্তি। চলে গেলো মৌসুমী ফুলের গুচ্ছ নিয়ে ফুলওয়ালা, তারও সাজী ভরে উঠেছে হেমন্তের বর্ণচ্ছটায়। যে ফুলের দেখা পাইনি এ সহরে এক দিনও, তাই আজ এসেছে আমাদের মাঝে একটুখানি রংয়ের স্পর্শ দেবার জন্য।

ধীরে ধীরে কুয়াসার ঘোর কেটে যায় সহরের বুকের উপর থেকে, কাঁচা রোদে ঝল্‌মল্‌ করতে থাকে সেই চিরপুরাতন সহর। তবু মনে হয় যেন কত নূতন। শুধু প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের যাদু মন্ত্রে মনের মাঝের ছবির খাতার পাতা উল্টে চলি উল্টোদিকে, তা'তে আঁকা আছে এই সহরের পুরানো দিনের ছবি। কত তার রং, কি তার ঢং। দেখেছি গৃহিণীর দল বৌ-ঝিয়েদের দল বসেছে ছাদে চুল শুকোতে, কাঁচা রোদে—কইছে সুখ দুঃখের কথা। তৈরী করছে চিনেমাটির বয়েমে ভরে নানা স্বাদের আচার মোরব্বা। কোনও দল দিচ্ছে হরেক রকমের বড়ি। এ-দৃশ্য আজ বিরল।

আরও দেখেছি আর এক ছবি—ঘরে ঘরে চলছে পুরাতন সিন্দুক পেঁটরা খুলে শাল দোশালা, বেনারসী কাপড় রোদে দেওয়ার ধুম, শীত যে এসে পড়লো। এ দৃশ্য আজ কমই চোখে পড়ে।

এখন কোট-প্যাণ্ট আর সিফন্‌ শাড়ীর যুগ। সহরের চলমান

জনস্রোতের চেহারাও তখন ছিলো অন্যরকম। চোগা-চাপকান, আচকান্, পাগড়ী, টুপি—বেনারসী, পার্শী শাড়ীর উপর শালের রুমালের বাহার। সে কি রঙের আর নক্সার প্রাচুর্য্য—আজ সবই হয়ে এসেছে ছিম্ছাম্, সাদামাটা, আঁটসাঁট।

মনের খাতায় আঁকা আছে বিদেশী রঙে আঁকা আরও একটী এই হেমন্ত দিনের ছবি। শীতের প্রারম্ভ হোতে ঘরে ঘরে নানা দেশ বিদেশের ফেরিওয়ালার ভীড়, আসতো কাশ্মীর থেকে—মস্ত দাড়ীওয়ালা পাগড়ী বাঁধা শালওয়ালার দল। কাবুলের প্রান্ত থেকে বহে আন্তো মেওয়ার পশরা কাবলীওয়ালা। খাগ্ড়াই কাঁসা পিতলের বাসন-ওয়ালা,—বেলোয়ারি চুড়ীর ঝাঁকা নিয়ে দোরের কড়া নাড়া দিতো দিল্লীওয়ালা ও দিল্লীওয়ালীর দল। অলিতে গলিতে হেঁকে যেতো 'নতুন গুড় নতুন গুড়' রবে কোন সে গ্রাম্য লোকের দল। আজও এসব সামগ্রী পাই, শুধু পাওয়ার পন্থা গেছে বদ্‌লে। তাতে সেই পুরানো দিনের ছবির সঙ্গে কোন মিল নেই।

তবুও হেমন্ত এলো এই সহরে। ভেবে পাই না হেমন্তের কোনও একটী বিশেষ রূপ আছে কিনা।

ও যেন প্রকৃতির এলোমেলো খেলাঘরের আবহাওয়া। সকল রসের মিশ্রণেই এর প্রকৃত পরিচয়, সূর্য্যের প্রখর তাপে আছে গ্রীষ্মের আভাস, দমকা হাওয়ায় ক্ষান্ত বর্ষণের ছোঁওয়া, আকাশের নীলিমায় শরতের নির্ম্মলতা, কুহেলিকার অবগুণ্ঠনের আড়ালে আসন্ন শীতের পরিচয়, আবার নিস্তব্ধ দুপুরের মৃদুতায় বসন্তের ব্যাকুলতা। হেমন্ত যেন সর্ব্ব ঋতুর সমন্বয়।

হেমন্ত তাই মানুষের জীবনেও আনে অস্থিরতা, মনে জাগায় ঘর ছাড়ানো পথে ডাকার সুর। শুনেছি রাজারা বেরোতেন এই হেমন্ত কালে মৃগয়ায়, আর দিগ্বিজয়ে।

ঋতুর এই অস্থিরতা সবই দেয় ওলট পালট করে।

নিজের গৃহকোণে অভ্যস্ত জীবনযাত্রার যা কিছু করণীয় তা যেন

থেকে থেকে হয়ে আসে কেমন আলগা, অগোছালো। তাই, যাঁরা গৃহকর্ত্রী তাঁদের কর্ত্তব্য হচ্ছে আসন্ন শীতের জন্য নিজের গৃহটিকে গুছিয়ে নেওয়া। শোবার ঘরের ও বসবার ঘরের আসবাবপত্র সামান্য সরিয়ে তীক্ষ্ণ উত্তুরে হাওয়া থেকে আড়াল করে রাখা। পাশ্চাত্ত্য দেশে Spring cleaning বলে একটা কথা আছে, অর্থাৎ বসন্তকালীন সাফাই করা। আমাদের দেশে বোধহয় এই কাজটী হেমন্তে সেরে রাখাই বাঞ্ছনীয়। শীতোষ্ণ বায়ুতে ঘরের সকল আবর্জ্জনা মুক্ত করে আগামী কালের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা ভালো।

দীপালী-উৎসবের আনন্দ হয়ে গেছে শেষ। লক্ষ প্রদীপের আলোর প্রতিবিম্ব বুঝি ঐ রাত্রির আকাশ-মুকুরে সহরের মাথার উপরে দেখি। হেমন্তের রাত্রির একটী বিশেষ রূপ আছে এই সহরে। সন্ধ্যারতির সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে যে-আলো তারই ক্ষীণচ্ছটায় দেখি সহরের শীর্ষে দোতুল্যমান ধোঁয়ার চাদর। ধীরে ধীরে তা যায় মিলিয়ে —তখন দেখা মেলে অগণিত তারা-খচিত নির্ম্মল আকাশ, লক্ষ কোটী তারা চোখ মেলে চেয়ে আছে নিচের এই সহরের পানে।

ক্লান্ত অবসন্ন সহরবাসী যেন সেই কালো কোমলতার মধ্যে নিজেকে পরম নিশ্চিন্তে অবলুপ্ত করে দিতে পারে। হেমন্তের দিনে এই সহরের বিশেষ অদল বদল পাই না খুঁজে—শুধু দেখি দোকানের দ্রব্যসম্ভারে দেখা দিয়েছে পশমি-কাপড়ের স্তূপ, বাজারে দেখি কপি কড়াইশুঁটী ভেটকিমাছের চাহিদা, আর পূজার ছুটীর অবসানে স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর ভীড়। এ ঋতুটী যেন উৎসবহীন নিরানন্দের দিন। শুধুই যেন অপেক্ষা করে থাকা ভাবী কালের জন্য। তাই বোধহয় এই বন্দনাহীন হেমন্তের উদ্দেশ্যেই কবি গেয়েছিলেন,

"হেমন্তে কোন বসন্তেরই বাণী"—

কবির মনের কল্পনা এ নয়, এই হেমন্তেই আমরা পাই সর্ব্ব ঋতুর ছোঁওয়া। এর মধ্যেই যেন লুকিয়ে আছে আমাদের সকল চাওয়া, সকল পাওয়া। হেমন্তের বিচিত্র ভাণ্ডারে আহরিত হয়েছে সকল

ঋতুর সকল উপভোগ্য সামগ্রী। হেমন্তের প্রকৃত রূপটী ধরা পড়ে আছে সহরেরই আশে-পাশে—বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে নবীন ধানের মঞ্জরীর সুবর্ণ বর্ণ দোদুল্যমান; কাশের গুচ্ছে, বিশীর্ণকায়া স্রোতস্বিনীর মন্থর গতিতে, রাঙ্গামাটীর ধূলায় আচ্ছন্ন গোধূলিতে।

এর আমেজ সহরের মাঝে আসে কতটুকু?

শুধু উপলব্ধি করি পথ চলতে, সরকারি বাগানের গাছের ছায়ায় বিশ্রামরত পথিকের তৃপ্তি দেখে, ফুটপাথের দু'সারী গাছের বিশীর্ণতায়।

তাই বলি, যে গৃহ আজ নিজের কাছেই লাগছে অসুন্দর, তাকে সাজিয়ে তুলতে হবে সবার জন্য মনোরম করে—যাতে বাইরের ম্লানিমা থেকে যেন মানুষ ঘরে এসে পায় রঙের আভাস, আনন্দের ছোঁওয়া। তবেই হবে হৈমবতীর কঠিন তপশ্চর্য্যার প্রতিদান। ধ্যানমগ্ন নটরাজের পূজার জন্য যদি জ্বলে আলো, যদি সজ্জিত হয় হেমন্তিকার উপহার, নানা ফুলের দ্বারা দেহের আভরণে যদি ছড়িয়ে পড়ে ইন্দ্রধনুর বর্ণ-মাধুর্য্য, তবেই এ ঋতুতে এই সহরের দৈন্য ঢাকা পড়ে যাবে। পরস্পরের মনে আনবে এক অনাবিল আনন্দের ধারা।

শীত

সহরের লীলামঞ্চের সামনে পড়ে আছে এখনও একটী শুভ্র কুহেলিকার যবনিকা। তারই অন্তরাল থেকে ভেসে আসছে যেন কোন্-সে-মায়াপুরীর জাগরণের মৃদু গুঞ্জন। সবই মনে হচ্ছে মায়াজালে আচ্ছন্ন।

পরিচিত অপরিচিত সকল বস্তুর উপরই যেন পড়েছে শুভ্রতার আস্তরণ। এই শীতের সকালে তারই মধ্যে চলাচল করছে বিকট শব্দ সহযোগে ট্রামগাড়ী রাজপথের চিরন্তন যাত্রায়, রিক্সার টুংটাং, মোটরের বিচিত্র শব্দ, সরীসৃপের মত ছুটে চলেছে তারা নানা দিকে পথ মুখরিত করে। নাগরিক জীবনের বহুল বিচিত্র রূপের সমারোহের মধ্যে দিয়েই শুরু হয় শীতের প্রভাত; মহানগরীর দৈনন্দিন জীবন-

যাত্রার সাহায্য করতে। রাজপথের ফেরিওয়ালার ডাকে এসেছে পার্থক্য—চা গরম, গরম চা, কমলা বেদানা, সিঙ্গাপুরী কেলা প্রভৃতি নানা প্রকারের ডাক শুনতে পাওয়া যায় রাত্রি প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই। রাজপথে জেগে ওঠে তার নিত্য কর্ম্মের তাগিদ।

হেমন্ত তার এলোমেলো ভাণ্ডার নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে—শুধু রেখে গেছে তার চলে যাওয়া মুহূর্তের বিদায়-বেদনাতুর একটী দীর্ঘশ্বাস। তারই শোকে যেন প্রকৃতি ধীরে ধীরে খসিয়ে দিচ্ছে আপনার অঙ্গের বহু বিচিত্র আভরণ। সর্ব্বদেহে জড়িয়ে নিচ্ছে শুভ্র আবরণ, যেন কোন সে বিলাসিনীর বিরহিণী রূপ। বুঝি তারই নিমীলিত চক্ষু হতে ঝরে পড়ছে বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণা, যার পরিচয় পাই প্রভাতের সিক্ত ঘাসে ঘাসে।

চেয়ে দেখি সহরের সুদূর বিস্তৃত পটচ্ছবি। ঊষার ক্ষীণ আলোকে আঁকা, যেন জাপানী চিত্রকরের তুলির কাজ, ধীরে ধীরে সে ছবি হয়ে উঠছে স্পন্দিত। সজীব রাজপথ ভেদ করে চলেছে মানুষ দ্রুতপদে এই কুহেলিকার অন্তরাল ভেদ করে কোন আলোকের সন্ধানে।

দোকান হাট-বাজার খুলছে যেন অনিচ্ছায় ঘুমভাঙ্গা চোখ মেলে। সেই সূর্য্যকরোজ্জ্বল নিকটের পৃথিবী সরে গেছে বহু দূরে। তাকে নিকটে আনবার যে-আলো, তার ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠেছে গাছের রিক্ত ডালে ডালে, অট্টালিকার চূড়ায়।

ধীরে অতি ধীরে ফিরে এলো সেই পরিচিত জগৎ—দেহের অতি সন্নিকটে, নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করলাম সেই চিরপরিচিতকে। তবুও মন চলে গেলো ঐ কুয়াসার অন্তরাল ভেদ করে অতীতের অভ্যন্তরে। সেখানে সাজানো আছে এই সহরের এমনি শীতের দিনের অন্য ছবি।

সেদিনও এমনি শীতের সকালে গৃহিণীরা আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে, পাল্কি বা জুড়ী গাড়ী করে চলেছেন গঙ্গা-স্নানে। সব্জিওয়ালারা অত ভোরেই ঝাঁকা এনে ফেলেছে বাড়ীর উঠানে, হিন্দুস্থানির দল চলেছে ভজন গান গেয়ে, গরম দুধ, ফেনিবাতাসা ফেরি করছে অলিতে

গলিতে। ভারিরা বয়ে চলেছে গঙ্গাজলের ভার। বাবুরা শাল দোশালা পরে চলেছেন এবাড়ী-ওবাড়ী, মেয়েদের গায়ে উঠেছে পার্শিপাড় দেওয়া মেরুনের সাড়ী, বৃদ্ধাদের তসর-গরদ। আজও চলেছে সেই জীবনের প্রবাহ। শুধু বদলে গেছে তার রং—নেই সে বৈচিত্র্য।

প্রকৃতির দৈন্য তখন মানুষ পূরণ করে নিতো আপনার দেহমনে নানাভাবে রং ধরিয়ে। নানা লোকাচারের প্রচলন ছিলো ব্যাপকভাবে। শীতের অকরুণ দিনগুলিকে মাধুর্য্যে ভরিয়ে নেবার জন্য পিঠে পার্বণ ও নবান্ন উৎসবের প্রচলন ছিলো ঘরে ঘরে। সে উৎসবের কতটুকুই বা বাকী আছে এই বৃহৎ সহরের কোণে। আগেকার দিনে নবান্ন উৎসবই ছিলো শীতের প্রধান উৎসব—আজ সে উৎসবও নেই—আর নেই সে অন্ন।

তবুও সেই অতিপরিচিত শীত এলো এই সহরে—এই আবহাওয়াতে কর্ম্মব্যস্ত মানুষের গতি হয়ে উঠেছে চঞ্চল। শীতের বেলা দীর্ঘ নয়, কাজেই সময়ের অল্পতাকে পুষিয়ে নিতে হয় ক্ষিপ্র গতিতে। ভাগ্যবান ব্যক্তিদের কাছে শীত ঋতু উপভোগ্যই হয়ে থাকে আরামের এবং আহার্য্যের উপকরণ-প্রাচুর্য্যে। শীত ঋতু সহনীয় তো বটেই, লোভনীয়ও হয়ে থাকে। কিন্তু সংসারে কয়টি লোকই বা ভাগ্যবান! সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে দুর্ভাগা জীবের সংখ্যাই তো বারো আনা, যাদের রাত্রিদিন ফুটপাথেই কাটে। গায়ে কাপড় নেই, মাথায় নেই আচ্ছাদন, তাদের কাছে শীত আসে কাঠিন্যের রূপ নিয়ে, শীতের রাত্রি কাটিয়ে দেয় তারা আগুন জ্বালিয়ে, দিন কাটিয়ে দেয় কাঁচা রোদে পিঠ রেখে। প্রকৃতির সাথে করেছে তারা মিতালি।

এক ঋতু চলে যায় অন্যটি আসে—তারি সঙ্গে বদলে যায় মানুষের জীবনযাত্রার ধারা। হেমন্তের বর্ণচ্ছটায় যে ভাণ্ডার ভরা ছিলো, আজ তা' হয়ে গেছে ম্লান। বিগত দিনের সাজ পোষাকের সঙ্গে তার সুর মিলছে না।

চেয়ে দেখছি কুয়াসা গেলো কেটে। কাঁচা রোদের সোনালী আলোয় ঝলোমলো সেই চির পুরাতন রাস্তা, দুদিন আগেও যে ছিলো পাতার

বাহার ফুলের সাজ, আজ তারা রিক্ত। উত্তুরে ঘূর্ণি হাওয়ায় পথের ধূলা চলেছে ঘুরপাক খেয়ে, অন্য কোন অনির্দ্দিষ্টের পথে। মাথার উপর মেঘহীন নীলাকাশ ব্যথাতুর চোখের মতোই ম্লান। এই পট-ভূমিকার উপরে চলমান জীবনযাত্রারও রূপ গিয়েছে বদ্‌লে। পড়েছে রুক্ষতার ছাপ। রাস্তায় ঘাটে, ট্রাম বাসে সব এই বিচিত্র পোষাকের বাহার। কারো গায়ে চড়েছে গরম স্যুট, কেউ জড়িয়েছে কাশ্মিরী শাল, আলোয়ান, কম্বল, কারো গায়ে বিচিত্র বর্ণের উলের সোয়েটার—নানা বর্ণের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায় ; চলনে বলনে এসেছে উৎসাহ।

খেলার মাঠ থেকে শুরু করে সিনেমা, থিয়েটার, সার্কাস, আর্ট-একজিবিসান, রেস প্রভৃতি নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ চলে শীতের দিনে—নদীর স্রোতের মত কোথাও ফাঁক নেই। রোজই যেখানে সেখানে কোন কিছু আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত আছেই। ঘরের মানুষকে ডাক দিয়েছে বাইরে—ঘরে বসে থাকতে মন চায় না। কি সহরে—কি গ্রামে সকল জায়গাতেই আজ বেজেছে আনন্দমুখর উৎসবের বাঁশী। এই শীতের দিনের সব থেকে উজ্জ্বল ছবিটী হোল খৃষ্টমাস বা বড় দিনের উৎসবের ছবি। শিশুমহলে পড়ে যায় সাড়া, শিশুমনে জাগে আনন্দের হিল্লোল, শুরু হয় তাদের অভিযান, এই সময়টীতে আকর্ষণীয় অনেক কিছু থাকে। এই সহরে ক্রিকেট খেলা, সার্কাস, সিনেমা, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি তো আছেই, এছাড়া নানাপ্রকারের দ্রব্য সম্ভারে সজ্জিত বিপণিসমূহ তাদের আকর্ষণ করে থাকে। মেয়েদের শাড়ীর ওপরে চড়েছে ভেলভেট ও বিলিতি ফ্যাসানের কোট, আর জ্যাকেট। এই শীতের দিনের যে জিনিষটীর অভাব মনে করিয়ে দেয় তা হোল আমাদের জাতীয় পোষাকের।

অন্য ঋতুতে তবু কিছুটা সমতা থাকে। কিন্তু এই অকরুণ দিনে সকল রুচি পরিহার করতে বাধ্য হয় মানুষ, প্রকৃতির সাথে তাল রেখে চলার চিন্তায়। দুপুরের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে যায় থেকে থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠ চিলের ডাকে। বাইরে পাতা ঝরানোর খেলা চলতে থাকে, কর্ম্মব্যস্ত

কোলাহল হয়ে আসে মন্দীভূত, তখন উপলব্ধি করি ঋতুর এই ক্ষণিক পরিবর্ত্তন যেন আর এক ছলনা। আগামী বসন্তের বর্ণচ্ছটার আগমনীর পূর্ব্বে গৃহ-প্রাঙ্গণ পরিষ্কারের খেলা। তাই ভাবি, নিজের এই ছোট্ট ঘরের নানা দিকের পরিবর্ত্তনও বুঝি দরকার। মিহি পর্দ্দার বদলে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হোক ঘন রংয়ের মোটা কাপড়ের আবরণ, এতে আনবে ঘরে রংয়ের বাহার, রুদ্ধ করবে নিষ্ঠুর হিমেল হাওয়া। মৌসুমী ফুলের গুচ্ছ এনে সাজিয়ে দিতে পারা যায় ফুলদানিতে, নাই বা রইলো তার সুরভি, তবু তো বাইরের দৈন্যতার প্রতিকার করবে ঐ সামান্য ফুলের চোখ ধাঁধানো রং। যদি শয্যায় পেতে দেওয়া যায় রঙিন আস্তরণ, আলোর আবরণীতে ঝুলিয়ে দিতে পারা যায় রঙিন ঝালর, ধূমল সন্ধ্যাটা তো সেই আলোতে হয়ে উঠবে রঙিন। এমনি করে নানা রঙের এবং সামান্য সামান্য আরামের সামগ্রী দিয়ে যদি নিজের ঘরের ভিতরটা করে তুলি রমণীয়, তাহলে বাইরের এই রিক্ততা ভুলে থাকতে পারে মানুষ কিছুটা সময়।

বেদনাতুর শীতের প্রহেলি-পটের উপরে যে ছবি সচরাচর চোখে পড়ে তাতে পাই প্রকৃতির দৈনতারই পরিচয়। তবু জানি, এই শুভ্র অবগুণ্ঠিতা কুণ্ঠিতা ধরিত্রী অন্তরে অন্তরে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে আসন্ন বসন্তের বর্ণোজ্জ্বল গন্ধচ্ছটায় বিকশিতা হবার সাধনায়। তাই থেকে থেকে চমকে ওঠে শুষ্ক ঘাসের বুকে নাম-না-জানা অগণিত বর্ণের মেঠো ফুল। তাই বুঝি উত্তুরে হিমেল হাওয়ার বুক ভরে ওঠে গোলাপের দীর্ঘশ্বাসে। তুষারের বুক চিরে মাথা বাড়ায় উমার ধ্যানের ডালি ভরাবার জন্য হিমাচলের পুষ্পসম্ভার। মানসসরোবরের তুষার মরু ছেড়ে নীল আকাশে রঙিন পাখা মেলে পাখীর ঝাঁক। প্রকৃতির বিবর্ত্তনের এই বৈরাগিণী রূপ, মনে হয় মিলিয়ে যাবে দুদিন পরে, খুলে যাবে ওর শুভ্র অবগুণ্ঠন আসন্ন বসন্তের দক্ষিণে হাওয়ায়। ধ্যানমগ্না স্থিরা উমার তপস্যার বুঝি সমাপ্তি ঘটাবে এই কঠিন কৃচ্ছতার অবসানে, মিলবে মহাকালের বরলাভ প্রকৃতির বসন্ত-বাসরে।

বসন্ত

শীতের শেষ প্রহরের সুষুপ্তি ও জাগরণের মাঝে কোথা থেকে ভেসে এলো, অদৃশ্য কোন্ মোহানার তীর হতে দক্ষিণের মৃদুমন্দ বাতাস।

শীতের নিষ্ঠুরতার আঘাতে মুহ্যমান সহরের গায়ে বুলিয়ে দিলে কোমল স্পর্শ; আধোঘুমের মধ্যে মানুষ উপলব্ধি করলে—শুরু হয়েছে বসন্তের বিজয় অভিযান। ঋতুরাজ বসন্তের প্রতি পদক্ষেপের ছন্দে পৃথিবীর ধূলিকণাও হয়ে উঠেছে সজীব। পথের ধারে ফুলের কাছেও এলো এই বার্ত্তা; কুয়াশার ওপার থেকে এলো অন্য এক নূতন সুরের ঝঙ্কার।

অদেখা কোকিলের অবিরাম কুহুধ্বনি আগমনীর আভাস জানালো এই শীতের শিহরিত সকালে।

আধোঘুমের জড়িমায় আবরণ উন্মোচন করে মনকে নিয়ে গেলো অন্তরের অন্তঃস্থলে, যেখানে সন্ধান মেলে অদৃশ্যের অভূতপূর্ব্বের।

জানলাম, সেইখানেই ঘটছে এক ঋতুর বিদায় বন্দনা, আর এক নবীনের অভিষেক। শিশির-সিক্তা অশ্রুসজলা প্রকৃতির নব রূপ ধারণের আভাস লাগছে এসে মর্ত্ত্যলোকে।

রূপ রস গন্ধের প্রবাহ বহে কোন অমৃতলোক থেকে। তাই পত্রপুষ্প-ভরা প্রকৃতির অন্তরে যে মিলনের সুর বাজছে, তার প্রকাশের অবকাশ বুঝি আসন্ন। তাই সহরের বুকের উপরেও চলেছে—শীত-বিদায়ের সাথেই—বসন্ত উৎসবের প্রথম পর্ব্বের পূজার আয়োজন।

শীতের বিদায়ের দিনের শীতল বাতাস উৎসবের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেলো। ঘরে ঘরে সেদিন বেজে উঠেছিলো বাণী-বন্দনার মুখরিত আনন্দ উচ্ছ্বাস, শীতের শেষ উৎসব বসন্তের প্রথম পার্ব্বণ।

শীতের ধূসরতা ম্লান সহরের বুকে ফুটে উঠেছিলো, পথে ঘাটে বাসন্তী রংয়ের ছোপ, অসাড়তা লুপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছিলো চঞ্চলের চকিত রূপটি। মনে হয়েছিল, বুঝি গিরিবালা উমার ধ্যানগম্ভীর মন্ত্র-

ধ্বনির মাঝে মিলেছিলো এসে অন্তরের নীরব সুর। বুঝি কুহেলিকার কুহকে স্তব্ধ প্রকৃতির ভাঙ্গছে মোহের ঘোর—কার মিলন বাসরের ডালি সাজাবার প্রচ্ছন্ন প্রয়াসে। মহাকালের রুদ্ধ দুয়ারে এসে পড়েছে নবারুণের স্পর্শ, এত দিনের জড়তা গেছে কেটে—ধ্যানের স্তব্ধতা যাবে ভেঙ্গে, চঞ্চলা প্রকৃতির অশ্রুত ধমণীর স্পন্দনে শুষ্ক ধরিত্রীর মধ্যে আনবে নব রসের উন্মাদনা। তার ইঙ্গিত পাচ্ছি শিহরিত শস্যগুচ্ছে, পুষ্পের রক্তিমচ্ছটায়। এই দুই ঋতুর মিলনের সন্ধিক্ষণে যে সুরটী বাজছে তাইতে যেন মিশে আছে বসন্তবাহারের মাঝে বিরহ-বিধুর বেহাগের রেশ।

শীতের এলো বিদায়ের পালা, সেই অঙ্গনেই সাজানো হচ্ছে বসন্তের আগমনীর ডালি। এই আসা যাওয়ার খেলাই চলেছে প্রকৃতির প্রাঙ্গণে—তাই পাওয়া এবং হারানোর অপরিসীম আনন্দ ও বিষাদের অস্থায়ী মুহূর্তকে অচঞ্চল করে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বের সৃষ্টি।

মহানগরীর কাঠিন্যের মধ্যে দিয়ে চলেছে মানুষ অভাব অভিযোগের দারুণ অবসাদগ্রস্ত মন নিয়ে একটানা জীবনের স্রোতে, প্রকৃতির এই সৌন্দর্য উপভোগ করবার অবসর কোথায়? তরু ও প্রকৃতির এই নব জাগরণে মানুষের মুহ্যমান মন ওঠে জেগে। জীবনযাত্রার পথে এই চিরপথচারিণীর স্পর্শ যখন চিত্তে দেয় দোলা, স্বস্তি আসে অকারণে; কাজকর্ম্মের ঘটে যায় ভুল। ক্ষণেকের জন্য মানুষ হয়ে পড়ে আনমনা, পথ যায় হারিয়ে। সহরের শুষ্ক চেহারার উপরে এসে পড়েছে শ্যামলতার ছাপ, এরই মধ্যে সহরের রূপ গেছে বদলে। গাছের ডালে দেখি কচি পাতার বাহার। বাগানে নবদূর্ব্বাদলের সম্ভার। পথচারীর অঙ্গ থেকে নেমেছে মোটা কাপড়ের ভার। দেহের আপন সৌন্দর্য্য মুক্তি লাভ করেছে আবরণের অত্যাচার থেকে। দোকানের পশরায় স্থান পেয়েছে ঋতুর উপযোগী দ্রব্যসম্ভার, ফুলের দোকানে গোলাপ গাঁদার পাশে দেখা যাচ্ছে নানা বর্ণের ও গন্ধের ফুলের রাশি। চলতি পথের গতিও বদলে গেছে, শীতের সায়াহ্নের শূন্যতা আর নেই। পথিকের গতির ছন্দ হিল্লোলে মুখরিত সেই পথ।

বসন্তের এই বৈচিত্র্য সুপ্রকাশিত হয় এই সহরের বুকে বেশী করে। প্রভাতের কুহেলি-প্রচ্ছদ তুলে ওঠে দমকা দক্ষিণে বাতাসে, আবরণ যায় ঘুচে। সোনালি রোদের স্পর্শ মেলে গৃহ-প্রাঙ্গণে; শুক্‌নো পাতার মরণ অভিযান শুধ্‌রে রাজপথের ধারে ধারে তারা স্থান করে দেয় নবীনের আগমনীর। দেখতে পাই, কোথা থেকে কোথায় উড়ে চলেছে পাখীর ঝাঁক বাছাদের আহারের সন্ধানে—এতদিন তারা ব্যস্ত ছিলো, শীতের শুষ্ক ডালে বেঁধেছিলো নীড়।

ঊর্ধ্বে নীল আকাশ হয়ে উঠেছে ঘনীভূত, যেন অচঞ্চল নীল আলোর সমুদ্র। ফুলের বাগানের আশেপাশে দেখা যায় প্রজাপতির বর্ণচ্ছটা, শোনা যায় ভ্রমরের মৃদু গুঞ্জরণ, মঞ্জরিত আমের শাখার চারিধার ঘিরে বসন্তের জয়গান—নব জীবনের জাগরণ, প্রকৃতির পূর্ণতার পরিচয়।

সহরের বুকে প্রহর গড়িয়ে যায়। দ্বিপ্রহরের দীপ্তির মাঝে ফুটে ওঠে বাসন্তিকার বিহ্বলতার রূপটি। আলস্যভরা বাতাস, স্নিগ্ধ রোদ, জনবিরল পথ, যেন বাসন্তীরঙিন আবরণে ঢাকা কোন স্বপনপুরী, চিরপরিচিত যেন সাজিয়েছে নিজেকে কোন উৎসবের আভরণে। তাই মানুষের মনের গোপনেও ঘটতে থাকে নব জাগরণের নব রূপ উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা।

বসন্তের প্রধান উৎসব দোল। সারা ভারতে এর দোলা লাগে, মাঘের শেষ থেকে ফাল্গুনের অন্ত পর্য্যন্ত। শীতের অন্তরে অন্তরে মানুষের অপেক্ষার স্রোত বহে চলে এই ফাল্গুনী উৎসবের। কবির কাব্যে, ভাস্কর্য্যের ভঙ্গিমায়, শিল্পীর চিত্রে এর রূপান্তর হয়েছে মহোৎসব রূপে।

পাষাণ প্রাচীরের গায়ে, মন্দিরের মর্ম্মরশিলায়, ছন্দে গানে গ্রন্থে, গৃহপ্রাঙ্গণের আলিম্পনে, আবরণে, বসনে ভূষণে শিল্পীরা সে যুগের মানুষের জীবনযাত্রার এই আনন্দ উপভোগের কাহিনী নৈপুণ্যের সঙ্গে এঁকে রেখে গেছেন। আজ তা অনেকাংশে বিস্মৃতির অন্ধকারে

অবলুপ্ত হলেও, এখনও কিছুটা টিঁকে আছে কালের করাল গ্রাস এড়িয়ে।

সে যুগের নানারূপ উৎসবের মধ্যে এই দোল উৎসবটি রঙিন হয়ে আছে আবির কুঙ্কুমের রক্তরাগে ; ধর্ম্মের গণ্ডির বাইরে গিয়ে পৌঁছেছে এই আয়োজন। মানুষ আপনার মনের মাধুরী মিশিয়ে দিয়েছে এই উৎসবের সার্থকতায়, প্রিয়জনকে প্রীতি জানাবার জন্য।

মনে পড়ে কিছু দিন আগেও এই উৎসবের আয়োজন চলতো ঘরে ঘরে—আগে থেকেই আবির কুঙ্কুমের রং বাছাই চলতো পাড়ায় পাড়ায়, চলতো জল্পনা কল্পনা—কেমন করে শুরু হবে আর কোন সুরেতে শেষ হবে এই ফাল্গুন উৎসবটি। সৌখিন লোকদের বাড়ীতে বসতো জলসা ; নাচ, গান, বাজনার মধ্যে দিয়ে শুরু হতো উৎসব। শুধু পানাহার চলতো, শালীনতার সঙ্গে সম্পন্ন হোতো হোলি খেলা। খেলার মধ্যে থাক্‌তো সূক্ষ্ম রসানুভূতির প্রকৃষ্ট পরিচয়।

মেয়েদের মহলেও ছিলো এই একটি মাত্র উৎসবে সকল বাধার শৈথিল্য। ফাগমিশ্রিত আতর গোলাপের গন্ধে ভরে থাক্‌তো অন্দরের অন্তঃস্থল। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত চল্‌তো এই উৎসব আত্মীয়া পরিচিতাদের নিয়ে। সমবয়সীদের মধ্যে হোতো নাচ গানের আসর। তাঁরা পরতেন মিহি তাঁতের শাড়ী—আবিরের রক্তিম রঙে রাঙা হয়ে উঠতেন। তবকে মোড়া পানের দোনা থাকতো থরে থরে সাজানো। আতর গোলাপ ও ফুলের সৌরভে ভরে থাক্‌তো অন্দরের অন্তর্মহল।

বসন্তের মাধুরীকে পরিব্যাপ্ত করবার জন্যেই ঋতুর এই উৎসবটীর সমাদর আছে। কে জানে কোন সে বিস্মৃত শতাব্দীর কোন এক পরম রূপকার প্রচলন করেছিলেন প্রকৃতির উজ্জ্বলতার সাথে মিলিয়ে বাসন্তী রংয়ের পোষাকের ব্যবহার। আজও এই রংয়ের সমাদর চলে আসছে এই ঋতুতে। তখন লট্‌কান রংয়ে শাড়ী ছোপানো হোতো ঘরে ঘরে। অনেক সৌখিন পুরুষেরাও এই লটকানে ছোপানো রঙিন উত্তরীয় ব্যবহার করতেন বিনা দ্বিধায়।

বসন্ত সন্ধ্যায় দেখেছি ফেরি হোতো নানারকম ফুলের সাজ ও গড়ে মালা, মেয়েরা কিনে তা পরতেন। বাবুরা জড়িয়ে নিতেন হাতে, গড়গড়ার সটকায় ঝুলিয়ে দিতেন ফুলের ঝালর। শরীরের মলিনতা ঘোচাবার চেষ্টায় মেয়েরা মাখ্‌তেন কাঁচা হলুদের প্রলেপ, মাথা ঘসার সুগন্ধে ভরে থাকতো সারা গৃহ, খাঁটি দেশী মতে তাঁরা নিজেদের সাজিয়ে তুলতেন বসন্তের সাজিভরা সুষমার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।

আজও সেই সহরে সংসারের বুকের উপর বইছে সেই পুরাতন অথচ চিরনবীন দক্ষিণ বাতাস। তাই মনে হয় যদি নিজেদের মনের সুরটি সদাই ধ্বনিত করে রাখতে পারি আপন সংসারের মাঝে, তবেই বসন্ত-বন্দনা সুন্দর হবে, নিত্য লোকের নিবেদন মিলবে গিয়ে অনিত্য লোকের অন্তরে।

জীবনী

কৃষ্ণভাবিনী দাস

আজ আমি একটি আত্মত্যাগী মহীয়সী মহিলার জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করবো। আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে যাঁরা সত্যব্রতকে অন্তর থেকে গ্রহণ করেছেন, এবং জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত অপরের জন্য সকল শক্তি উৎসর্গ করে গেছেন, স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। তিনি যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে রেখে গেছেন, সে আদর্শ আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্বরূপ আত্ম-উন্নতির পথে পরিচালিত করবে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে কৃষ্ণভাবিনীর জন্ম হয়। তিনি জমিদার জয়নারায়ণ বসুর কন্যা। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ১৯শে ফাল্গুন ১০ বৎসর বয়সে বহুবাজারের খ্যাতনামা উকিল ৺শ্রীনাথ দাসের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ দাসের সহিত তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পরে শিক্ষা-লাভার্থে স্বামী বিলাতে যান। কৃষ্ণভাবিনীর স্বামীর সঙ্গে বিলাতে

যাবার খুব ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু তখন তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি। স্বামীর অদর্শনে তিনি সর্ব্বদাই ম্রিয়মানা থাক্‌তেন। স্বামীর বিলাত গমনের কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর একমাত্র কন্যা তিলোত্তমার জন্ম হয়।

দেবেন্দ্রনাথ যখন ফিরে আসেন তখন তাঁর কন্যাটির বয়স পাঁচ বছর। কিন্তু কিছুদিন পরই পুনরায় তিনি বিলাত যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময় কৃষ্ণভাবিনীও স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা জানান। তখনকার দিনে মেয়েদের বিলেত যাওয়া লোকে কল্পনাও করতে পারতো না। তারপর তিনি ছিলেন গোঁড়া হিন্দু পরিবারের বধূ, কাজেই তাঁর শ্বশুর মহাশয় প্রবল আপত্তি করেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ ইচ্ছা থাকাতে অবশেষে শ্বশুর মহাশয় যাবার অনুমতি দেন। কিন্তু তাঁর একমাত্র কন্যাটিকে ছেড়ে দিতে তিনি রাজি হলেন না। কৃষ্ণভাবিনী ভাবলেন মেয়েকে ছেড়ে গেলেও এখানে দেখবার লোক আছে। কিন্তু বিদেশে স্বামীকে দেখবার কেউ নেই।

হিন্দু কুলবধূর শ্বশুরগৃহের প্রতি যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে কিন্তু স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। একমাত্র কন্যাটিকে ছেড়ে যেতে তাঁর খুবই কষ্ট হয়েছিলো সন্দেহ নেই কিন্তু স্বামীর প্রতি প্রকৃত কর্ত্তব্য পালনে তিনি ব্রতী হলেন।

শিক্ষাবস্থায় দেবেন্দ্রনাথ যে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারে পুস্তকের মধ্যে নিমজ্জিত থাক্‌তেন, সেই গ্রন্থাগারেই তিনিও কয়েক বৎসর ধরে তাঁর জ্ঞানপিপাসার কিছুটা নিবৃত্তি করেন। তখন তিনি বিলাতি পরিচ্ছদ পরতেন। কিন্তু বাইরের বেশভূষার পরিবর্ত্তন হলেও তাঁর অন্তরে ছিল ভারতনারীর আদর্শ। বিদেশী আবহাওয়ায়ও সে আদর্শের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয়নি। স্বামী এবং স্ত্রী দুজনেই অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

দেবেন্দ্রনাথের দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি সেঞ্চুরী স্কুল এবং কলেজ স্থাপনা করেন। তিনি নির্য্যাতিত মেয়েদের স্বাবলম্বী হবার

শিক্ষা দিতেন। বালিকা-বধূদেরও বাড়ীতে গিয়ে শিক্ষা দিতেন। তিনি ঐ বিদ্যালয়ের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন।

কৃষ্ণভাবিনী এই বিদ্যালয়গুলির কাজ নির্ব্বাহ করতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিলাতে অবস্থানকালে "বিলাতে বঙ্গনারী" নামে তিনি একটি বই রচনা করেন। সেই বইটী পরে সরকার কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হয়। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার জন্য ৪নং উইলিয়মস্ লেনে "ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল" স্থাপনা করেন।

বাড়ীতে তিনি নূতন বৌয়ের মতই থাক্‌তেন। সর্ব্বদা বড়দের আদেশ মেনে চলতেন। বাহিরে কঠিন পরিশ্রম করে এসেও বাড়ীতে ঘরকন্নার খুঁটিনাটী সব কাজই করতেন। একদিন বাড়ীতে ফিরে এসে খুব ক্লান্ত হয়ে প'ড়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, বাইরে থেকে বাড়ীর একজন ডাকলেন—"ন' বৌ, মশারীটা সেলাই করে দাও তো।" কৃষ্ণভাবিনী তখনি উঠে সেলাই আরম্ভ করলেন। সেখানে একজন মহামণ্ডলের কর্ম্মী উপস্থিত ছিলেন। তিনি চাইলেন সেলাই করে দিতে কিন্তু কৃষ্ণভাবিনী দিলেন না। কারণ গুরুজনেরা যা তাঁকে আদেশ করেছেন সে আদেশ পালন করা তাঁর কর্ত্তব্য। এই সমস্ত ছোটখাটো ব্যাপারে তাঁর মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় পাওয়া যায়। আত্মসম্মান বজায় রেখে ন্যায়পথে চলাই তাঁর আদর্শ। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিলো অল্প কিছুদিনের জন্য। খুব অল্প বয়সে তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলাম কিন্তু তাঁর সেই স্নেহমাখা জ্যোতির্ময়ী মূর্ত্তি আমার আজও স্মরণ হয়। আমার বাল্যের চপলতা ও পড়ার অমনোযোগিতা দেখে একদিন স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমার পড়তে ভালো লাগে না?"

আমি বলেছিলাম, "সব সময় ভালো লাগে না, মাঝে মাঝে লাগে।" তখন তিনি বলেছিলেন, "শিক্ষিত স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হতে গেলে স্ত্রীদের শিক্ষিতা হতে হবে। সব বিষয় জান্‌তে হবে, নইলে স্বামীর সব

কথার উত্তর দেবে কি করে ?" আমার তখন স্বামীর কথার উত্তর দেবার চেয়ে খেলার ভাবনাই বেশী ছিলো ;—বল্লাম, "স্বামীর কাছেই জেনে নেব এখন।" আমার কথায় তিনি হেসে বলেছিলেন, "বয়স হোক্ বুঝতে পারবে।" তিনি যখন বাড়ীতে আস্‌তেন ধর্ম্মমূলক অনেক কিছুই আলোচনা হতো। তখন সে সব বিশেষ বুঝতাম না কিন্তু শুন্‌তে খুব ভালো লাগতো। তাঁর সেই শুভ্র বেশ শুচিতার প্রতীক বলেই মনে হতো। তাঁর বিলাতে থাকা কালেই শ্বশুর মহাশয় দশ বৎসর বয়সে তাঁর কন্যাটির বিবাহ দেন। কন্যাটির বিবাহিত জীবন বড়ই কষ্টকর হয়েছিলো। দুশ্চরিত্র ধনী স্বামীর হস্তে যথেষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করেছিলেন। কিন্তু কারো কাছে তা প্রকাশ করেননি। তাঁর কন্যার লিখিত কবিতা সংগ্রহ করে আক্ষেপের মুখপত্রে তিনি অন্তরের কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

> "মা! তুমি জীবনে সতী স্ত্রীর যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছো তাহা হিন্দুর ঘরে ঘরে বিরাজমান। কিন্তু তুমি জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে রকম মনস্তাপের ভিতর বত্রিশ বৎসর কাটাইয়া গিয়াছো, সে রকম ঘটনা সংসারে প্রায় দেখা যায় না। সেই আজীবন কষ্টের মধ্যেও তুমি সার বস্তু ধর্ম্মকে চিনিতে পারিয়াছিলে, জগৎকে সেইটুকু দেখাইবার জন্য তোমার কবিতাগুলি ছাপাইলাম। জীবনে তো তোমার জন্য কিছুই করিতে পারি নাই! এখন আর কিছু করিবারও নাই। তোমার স্মৃতি রক্ষা ও সেই স্মৃতি স্মরিয়া অভাগিনী স্ত্রীলোকদের অশ্রু মুছাইবার চেষ্টা জীবনে ব্রত করিয়াছি। ভগবান আমায় বল দিন, এই প্রার্থনা।
>
> তোমার দুঃখিনী মা"

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বাহান্ন বছর বয়সে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। যে স্বামী ছাড়া কৃষ্ণভাবিনী আর কিছু জানেননি তাঁকে হারিয়ে তিনি দারুণ আঘাত পান। এক মাসের মধ্যে তাঁর কন্যাটিরও মৃত্যু হয়। উপর্য্যুপরি দুইটি আঘাতেও তিনি নিজেকে যে প্রকৃতিস্থ রাখ্‌তে পেরেছিলেন সে শুধু ভগবৎপ্রেম ও ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখবার জন্য। এই দারুণ শোক তাঁকে কর্ম্মজীবনে আরও অধিক অগ্রসর ক'রে দিয়েছিলো।

দশ বৎসর এই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এই দশ বৎসর তিনি আপনাকে কর্ম্মজীবনের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। কর্ম্মের দ্বারাই তিনি দগ্ধ প্রাণে কতকটা সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন। হিন্দু গৃহবধূ হয়েও কৃষ্ণভাবিনী নারীজগতে যে আলোক জ্বালিয়ে গিয়েছেন তা চিরদিনই সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। যে নারী আপনাকে সকলের পশ্চাতে রেখে আজীবন নিঃস্বার্থ পরোপকার ক'রে গেছেন তিনি আমাদের প্রণম্য। তাঁর সকল ইচ্ছায় নারীসমাজ সিদ্ধি লাভ করুক এই কামনা করি। প্রত্যেক কর্ম্মীর দ্বারা সেই স্নেহরূপিণী কৃষ্ণভাবিনীর নাম অমরত্ব লাভ করুক। আজ নির্য্যাতিত রমণীদের গোপন অশ্রু মুছাবার জন্য আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। আজীবন সহ্য করে যে সকল নারী নীরবে বিদায় গ্রহণ করে যাচ্ছেন, তাঁদের যে এ-বিশ্বে অনেক কিছুই করবার আছে তা তিনি নিজের জীবনের দ্বারা দেখিয়ে গেছেন। শুধুই সংসার একমাত্র স্থান নয়। বাহিরের অনেক কিছু দায়িত্ব তাঁদের সাম্নে। নিজেদের দুঃখকষ্ট ভুলে তাঁর প্রদর্শিত পথে যাত্রা করলে সেই মহান্ আত্মা শান্তি লাভ করবে। সেই শান্তিরূপিণী কৃষ্ণভাবিনীকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের মত আলোচনা শেষ করলাম।

শ্রীমা

সারদা দেবী—"শ্রীমা" নামে পরবর্তী জীবনে যিনি সকলের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন—খনা, লীলাবতীর মত বিদুষী ছিলেন না, রাণী দুর্গাবতীর মত যুদ্ধে অশ্বচালনাও করেন নি; কিন্তু তাঁর ভগবৎপ্রেম, আত্মত্যাগ, চরিত্রের মাধুর্য, এই দেশের মেয়েদের মধ্যে তাঁকে একটি বিশিষ্ট আসন দিয়েছে।

"শ্রীমা"—এই একটি ক্ষুদ্র কথায় তাঁর স্নেহ, সেবাপরায়ণতা ও পবিত্রতা যেমন পরিস্ফুট হয়েছে তেমন আর কোন নামেই হয়তো হোত

না। বস্তুতঃ তিনি সকলের কাছেই মাতৃরূপা ছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ২২শে ডিসেম্বর "শ্রীমা" বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মা'র নাম শ্যামাসুন্দরী। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সামান্য অবস্থার গৃহস্থ ছিলেন। কয়েক বিঘা জমির ধান ও ক্রিয়া-কর্মে পৌরোহিত্য করে তিনি যা পেতেন তাইতেই তাঁর কোন রকমে জীবিকা-নির্বাহ হোতো। শ্রীমার আর চারিটী ভাই ছিলো। বাল্যকালে বাপ-মায়ের সর্বপ্রথম সন্তান হিসাবে ভাই-বোনগুলিকে দেখা শোনা করা ছাড়াও তাঁকে গৃহস্থালির কাজকর্মে মাকে সাহায্য করতে হোতো। এমন কি বর্ষার সময় জলে দাঁড়িয়ে গরুর জন্য ঘাসও তাঁকে কাট্‌তে হোতো। ছেলেবেলা হতেই ঠাকুর-দেবতায় তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল এবং এই ভক্তিই পরবর্তী জীবনের ঘটনার জন্য অনেক পরিমাণে তাঁকে প্রস্তুত করেছিল।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ৫ বছর ছয়মাস বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত শ্রীমার বিবাহ হয়। তখনকার দিনে হিন্দু সমাজে এই বয়সে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া কোনও অভাবনীয় ঘটনা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বয়স তখন ২৩ বৎসরেরও বেশী। বিবাহের অনুষ্ঠান খুব সামান্য ভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল ; কারণ দুপক্ষের অবস্থাই সচ্ছল ছিলো না। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বৈরাগ্য ও বিষয়ে অনাসক্তি দেখেই তাঁর মা চন্দ্রমণি দেবী খুব অল্পকালের মধ্যেই এই বিবাহের আয়োজন করেন। বিবাহের পর ১৮।১৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত বাপের বাড়ীতেই বেশী দিন কাটে। এর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ২।৪ বার কামারপুকুরে এসেছিলেন, জয়রামবাটীতেও ২।১ বার গিয়েছিলেন কিন্তু সামান্য কয়দিনের বেশী শ্রীমার সঙ্গে তিনি থাকেন নি। শ্রীমার যখন ১৪ বছর বয়স, সেই সময় কামারপুকুরে শ্রীমার সঙ্গে তিনি মাস তিনেক ছিলেন। এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে ঈশ্বর ও ধর্মজীবন সম্বন্ধে শিক্ষাদানে ব্রতী হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভগবৎপ্রেম ও মনের পবিত্রতা সারদামণির বালিকা-মনে গভীর রেখাপাত করেছিলো। এর পরে

প্রায় ৫ বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। বাপের বাড়ীতেই তাঁর দিন কাটছিলো। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বৈরাগ্য ও ভাব-বিহ্বল অবস্থা এমন আকার ধারণ করেছিলো যে, সাধারণ লোক তাঁকে পাগল ছাড়া আর কিছু মনে করতো না। এই অখ্যাতি সুদূর পল্লীগ্রামে জয়রামবাটীতেও পৌঁছেছিলো। শ্রীমার আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামের লোকেরা তাঁকে করুণার চক্ষে দেখতে লাগলো। এই অবস্থা শ্রীমার বেশী দিন সহ্য হোল না। কারণ তিনি ভাল করেই জানতেন তাঁর স্বামী কি। অবশেষে গঙ্গাস্নান করবার ছলে কয়েকজন গ্রামের লোকের সঙ্গে ১৯ বৎসর বয়সে তিনি দক্ষিণেশ্বরে চলে আসেন স্বামীর কাছে। এর পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব যতদিন বেঁচে ছিলেন—ততদিন তাঁর ও তাঁর ভক্তদের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। এই সেবার মধ্যে কোন দৈহিক কামনার স্থান ছিলো না, কারণ শ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে আসার কিছু দিন পরেই—শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে দেবীর আসনে বসিয়ে মাতৃভাবে ষোড়শী-পূজা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে তিনি ছিলেন মহামায়ার অংশ, জগজ্জননীর প্রতীক। সাধারণ স্ত্রীলোকের পক্ষে এইরূপ অবস্থা সহজে মেনে নেওয়া খুবই কঠিন হতো সন্দেহ নেই। কিন্তু ভগবান যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণীরূপে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন সাধারণ স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে, এবং তাঁর নির্দেশ-মত শ্রীমাও গভীর ধর্মজীবন আরম্ভ করলেন। সেই সঙ্গে বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা ও তাঁর শিষ্যদের জন্য দুবেলা রান্না ও আহার্য প্রস্তুত করার ভারও তাঁর উপর এসে পড়লো। এই সময় তাঁর দৈনন্দিন কাজ ছিল, রাত তিনটায় উঠে গঙ্গাস্নান করে নহবৎখানায় তাঁর নির্দিষ্ট ঘরখানিতে বসে পূজা-জপাদি সেরে নিয়ে গৃহস্থালীর কাজ ও শাশুড়ীর সেবা শেষ করে রান্না আরম্ভ করা। খুব যত্নসহকারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আহার্য প্রস্তুত করে তিনি তাঁর ঘরে তাঁকে খাওয়াতে যেতেন। শুধু দুবেলা আহারের সময় ব্যতীত স্বামীর সঙ্গে তাঁর দেখা

হোত না। কারণ সব সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরে লোক থাকতো। তাঁর আহারের পর শাশুড়ী ও অন্যান্য অতিথিদের খাইয়ে শ্রীমার খেতে অনেক বেলা হয়ে যেতো, খাবার পর অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার তাঁকে রাত্রির জন্য আহারাদির ব্যবস্থা করতে হোতো। শুধু সন্ধ্যারতির সময় তিনি পূজাদি করবার জন্য কিছু সময় করে নিতেন। এই রকম ভাবেই ১৪ বছর কাটলো ; এর মধ্যে তিনি ২।৩ বার জয়রামবাটীতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু সিংহবাহিনীর প্রসাদে স্বপ্নাদ্য ঔষধ লাভ করে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। তারপর—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হলেন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে শ্যামপুকুরের বাড়ীতে আনা হোলো। স্থানাভাবের জন্য প্রথমতঃ সেখানে শ্রীমাকে আনা হয়নি। পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুমতিক্রমে শ্রীমা সেখানে গিয়ে তাঁর স্থান করে নিলেন। কাশীপুরের বাগান-বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যখন স্থানান্তরিত করা হোলো, শ্রীমাও তাঁর সঙ্গে গেলেন।

কিন্তু শ্রীমা ও শিষ্যদের অক্লান্ত যত্ন ও সেবা সত্ত্বেও ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহাবসান ঘটলো। শ্রীমা খুব কাতর হয়ে পড়লেন, কিন্তু কথিত আছে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই সময়ে তাঁকে দেখা দিয়ে তাঁর শোক নিবারণ করেন, এমন কি শ্রীমাকে তাঁর হাতের বালাও খুলতে দেননি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহরক্ষার পর শ্রীমা কিছুদিন তীর্থপর্যটন করেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হয়েছিলো ; কিন্তু এর জন্য তিনি কারো কাছে নালিশ জানান নি। অবশেষে তাঁর এই অবস্থার কথা জানতে পেরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েক জন ভক্ত শ্রীমার জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন এবং মাসিক কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। এর পরেও তাঁর সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুতে তাঁর সংসারের ভারও শ্রীমার উপর এসে পড়ে। রাধু নামে তাঁর মৃত এক ভ্রাতার এক মাত্র কন্যাকে শ্রীমা'ই লালন-পালন করেন, কারণ

তাঁর ভ্রাতার বিধবা স্ত্রী শোকে প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। এই সব সাংসারিক গোলযোগ ও অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন কখনও ব্যাহত হয়নি।

শেষ জীবনে তিনি কখনো কলিকাতা বাগবাজারে, আবার কখনো জয়রামবাটীতেই অতিবাহিত করেছিলেন। এই সময়ে অনেক লোক তাঁর কাছে মন্ত্র নিতে আস্‌তো। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে কয়টি মন্ত্র তাঁকে দিয়েছিলেন, তিনি ব্যক্তিবিশেষে সেই সব মন্ত্রের দীক্ষা দিতেন। তাঁর সামান্য অর্থ থেকে এই সব অভ্যাগতদের আহারের ব্যবস্থাও তাঁকে করতে হোতো। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোন কোন ভক্ত ২।১ দিন জয়রামবাটীতে থেকে যখন চলে আসতেন, তখন শ্রীমা বাইরে থেকে ছল ছল চোখে তাঁদের দিকে চেয়ে থাকতেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর এইরূপ ভাবে অতিবাহিত করে ১৯২০ সালের ২৩শে জুলাই প্রায় ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। শ্রীমার জীবন ঘটনাবহুল নয়। কিন্তু নীরব আত্মত্যাগ ও পবিত্রতার যে দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন জগতের ইতিহাসে তা খুবই বিরল। এই রূপ সহধর্মিণী লাভ না করলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক জীবন যে অনেক পরিমাণে অসম্পূর্ণ হোতো সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং মায়ের আধ্যাত্মিক সহায়তার কথা স্বীকার করেছেন।

মহীয়সী নারী পুত্‌লি বাঈ

ভারতের ইতিহাসে যে সমস্ত নারী আজো স্মরণীয়া হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর জননী পুত্‌লি বাঈ অন্যতম। যে মহামানবের কথা আজ সর্ব্বপ্রথমে মনে আসে, যিনি দেশের জন্য নিজের জীবনকে বলি দিলেন সেই অহিংসার পূজারী, প্রেম ও ভালবাসার প্রতীক মহাত্মার জননী পুত্‌লি বাঈ-এর জীবন যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি আদর্শস্থানীয়। মহাত্মাজার জীবনে তাঁর মার প্রভাব ছিল অনেকখানি।

মায়ের অহিংসা ধর্ম্ম, দেবদ্বিজে ভক্তি, ব্রত উপবাস, রামায়ণ ভাগবত পাঠ প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণগুলি পুত্রের বাল্যজীবনে গভীরভাবে ছাপ রেখে গেছে। রামায়ণের কাহিনী এবং হরিশচন্দ্রের আত্মত্যাগ গান্ধীজির সত্তায় মিশে গিয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্রকে তিনি আদর্শের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছিলেন। মাতার সৎশিক্ষায় অনুপ্রাণিত পুত্র সত্যের সাধনায় সর্ব্বত্যাগী হয়ে মহৎ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। বাল্যকালে মাতৃদত্ত শিক্ষাই মহাত্মাজীকে শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শের প্রতি উৎসাহিত করে তুলেছিল।

গান্ধীজির পিতা করমচাঁদ গান্ধী পর পর চারটি বিবাহ করেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ পত্নীই শ্রীমতী পুত্‌লি বাঈ। এঁর এক কন্যা ও তিন পুত্র। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রই গান্ধীজি। যে সমস্ত গুণ থাকলে নারী মহীয়সী হয়ে ওঠে সেই সমস্ত সদ্‌গুণই তাঁর ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু। পূজাদি না করে কখনও জল গ্রহণ করতেন না। প্রত্যহ মন্দিরে যেতেন ও চতুর্মাস ব্রতের ন্যায় কঠোর ব্রতও তিনি পালন করতেন। এই সমস্ত ব্রতের নিয়ম পালন বিশেষ কষ্টসাধ্য। কিন্তু ইহাতেও তিনি হার স্বীকার করতেন না। অসুস্থ অবস্থাতেও এইসব দুরূহ ব্রতাদি তিনি ত্যাগ করেননি। একবার তিনি চান্দ্রায়ণ ব্রত নেন। এই ব্রতের নিয়ম সূর্য্যের দর্শন না পেলে জলগ্রহণ নিষিদ্ধ। ব্রতের সময়কাল চার মাস। একদিন অন্তর একদিন উপবাস ছিল ব্রতের নিয়ম। সময়টা ছিল বর্ষাকাল। কাজেই সূর্য্যের দেখা পাওয়া খুব কঠিন ছিল। বালক মোহনচাঁদ সব সময়েই আকাশের দিকে চেয়ে থাকতেন যদি কখনও সূর্য্যের দেখা মেলে। কারণ তাহলেই মা তাঁর জলগ্রহণ করবেন। মায়ের সম্বন্ধে পরে মহাত্মাজী তাঁর জীবনীতে বলেছেন—এমনি এক সময় যখন একদিন তিনি সূর্য্যের দেখা পান, তখনি ছুটে মার কাছে গিয়ে বলেন, "মা মা, সূর্য্যনারায়ণ দেখা দিয়েছেন।" মা তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখেন সূর্য্য মেঘের আড়ালে চলে গিয়েছে। মায়ের আর সেদিন খাওয়া হলো না।

বালক গান্ধীজির মুখখানি আঁধার হয়ে গেল। মা বল্লেন—"তাতে কি হয়েছে! ভগবানের ইচ্ছা নয় যে আজ আমি অন্ন গ্রহণ করি।" এই বলে তিনি প্রাত্যহিক কাজে মন দিলেন। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি তাঁর নিষ্ঠা, ভক্তি ও মানসিক বল কিরূপ প্রবল ছিল।

সাংসারিক জ্ঞান তাঁর ছিল প্রচুর। পিতা যখন তাঁর রাজকোট দরবারে কাজ করতেন তখন সেই দরবারের সকল খবরই পুত্‌লি বাঈয়ের জানা ছিল। রাজ পরিবারের সকল মেয়েরাই তাঁর বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করতেন। রাজ-অন্তঃপুর থেকেও তাঁর ডাক আসতো। বালক গান্ধীজিও মাঝে মাঝে তাঁর মার সঙ্গে যেতেন এবং ঠাকুর সাহেবের বৃদ্ধা মার সঙ্গে তাঁর জননীর কথোপকথনগুলি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। এই আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ধর্ম্ম ও অন্যান্য মজার গল্প। এই ভাবেই পুত্‌লি বাঈ গড়ে তোলেন তাঁর পুত্রের চরিত্র। মাতার শিক্ষা যে সন্তানকে কতখানি মহৎ ও কৃতী করে তুলতে পারে জননী পুত্‌লি বাঈ তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বিলাত যাত্রার সময় গান্ধীজি তাঁর মাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করে যান জীবনে তিনি কখনও মাছমাংস ও মদ্য স্পর্শ করবেন না। সকল নারীকে তিনি মা-বোনরূপে দেখবেন। এই প্রতিজ্ঞা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তাই মহাত্মাজীর মধ্যেই আমরা দেখতে পাই তাঁর মহীয়সী মাতার অতুলনীয় চরিত্র। শ্রীমতী পুত্‌লি বাঈই মহাত্মার জীবনকে সফলতার দিকে নিয়ে যান। তিনি মহাত্মাজীকে এই শিক্ষাই দেন যে, সত্যের আলো সম্মুখে রেখে সোজা পথে চলতে পারলে জীবনের পথে কোন ভুলভ্রান্তি হয় না। সকল বাধাই অপসারিত হয়। মানুষকে ভালবাসলে, তার সেবা করলেই ভগবানের সেবা করা হয়। মানুষমাত্রই ভগবানের জীব। সকলের মধ্যেই ভগবান সমান-ভাবে বিরাজ করেন। এই শিক্ষাই মহাত্মার চরিত্রে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। শ্রীমতী পুত্‌লি শিক্ষিতা ছিলেন না বা তথাকথিত ইংরাজি শিক্ষা তাঁর ছিল না বটে কিন্তু তিনি তাঁরই সুশিক্ষায় শিক্ষিত ও

গঠিত এমন এক সন্তান দেশকে দান করে গেছেন যার তুলনা জগতে বিরল। যে শিক্ষা মানুষকে উন্নত, হৃদয়কে মহৎ ও ধার্ম্মিক করে, সে শিক্ষারই অধিকারিণী ছিলেন জননী পুত্‌লি বাঈ। তাই মহাত্মার মতন পুত্রের জননী তিনি হতে পেরেছিলেন। তাঁর নির্ভীকতা, সত্যবাদিতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মহাত্মার চরিত্রের মধ্যেও সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। ১৮৯১ খৃঃ ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়ে মহাত্মাজী যখন দেশে ফিরে আসেন তার পূর্ব্বেই জননী পুত্‌লি বাঈয়ের মৃত্যু হয়েছে। পুত্রকে শেষ দেখাও তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর নশ্বর দেহের অবসান হয়েছে বটে কিন্তু তবুও তিনি বেঁচে আছেন ভারতের কোটি কোটি নরনারীর অন্তরে, যেখানে নিয়তই ভক্তি ও শ্রদ্ধার্ঘ নিয়ে তারা প্রণাম জানাচ্ছে এই মহীয়সী জননীর চরণে।

সাধক সন্তদাস

আমাদের দেশের বৈষ্ণব সাধকদের অন্যতম হচ্ছেন স্বামী সন্তদাস। তিনি খুব বেশী দিন আগেকার নন। ১২৬৬ সালে শ্রীহট্ট জেলায় বামৈ গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। সন্ন্যাস নেবার আগে তাঁর নাম ছিল তারা-কিশোর চৌধুরী। খুব অল্প বয়স থেকেই তিনি অদ্ভুত মেধা ও স্মরণ-শক্তির পরিচয় দেন। তিন থেকে পাঁচ বছরের ভেতর রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুনে শুনে তিনি ওই বিরাট গ্রন্থ দুটি থেকে যে-কোন ঘটনা বলতে পারতেন। ছয় বছর বয়সেই রীতিমত পাঠাভ্যাস সুরু হয়। বাবা হরকিশোর চৌধুরী নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। ছেলেকে সেই সময় থেকে সংস্কৃত শ্লোক শেখাতে আরম্ভ করেন। হরকিশোর চৌধুরী জানতেন, সংস্কৃত জ্ঞান ছাড়া হিন্দুধর্ম্ম, বা ভারতবর্ষের পুরাণ ইত্যাদি কোন কিছুরই মূল জানা যায় না। তারাকিশোর পড়তেন শ্রীহট্টের মিশন স্কুলে। সেখানে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের কথা এবং যিশুর উদার মতবাদের কথা বাল্যকাল থেকে শুনতেন। মাত্র দশ বছর বয়সে

তারার মা মারা যান। মায়ের স্নেহের অভাব হরকিশোর চেষ্টা করলেও পূরণ করতে পারেননি। চিন্তাশীল বালকের মনে অল্প বয়সেই একটা বৈরাগ্য এসে পড়ে। ১৮৭৪ খৃঃ ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি ১৫ টাকার বৃত্তি পান। ওই সময় তাঁর বিবাহও হয়। এরপর কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি পড়তে আসেন। এসময় কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের প্রভাবে তিনি পড়েন। একটি ঘটনা তাঁকে এতদূর বিমোহিত করে যে তিনি একদিন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। ঘটনাটি হচ্ছে ৺দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়ের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক অসুখের সময় ঈশ্বর উপাসনায় যন্ত্রণার উপশম হয়। হরকিশোর চৌধুরী ছেলে বিধর্ম্মী হয়েছে শুনে খরচপত্র পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। নিজে ছুটে কলকাতা চলে এলেন ও ছেলেকে ধর্ম্মত্যাগ থেকে বিরত হতে অনেক বোঝালেন। শেষে উত্তেজিত হয়ে হত্যা করতে অবধি গিয়েছিলেন। কিন্তু তারাকিশোর তখন ব্রাহ্মসমাজ ছাড়তে রাজি হননি। শোনা যায় ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ প্রভৃতি মহাভক্তরাও এ সময় আলোচনা করে তারাকিশোরকে তাঁর মত পরিবর্ত্তন করাতে পারেন নি। তারাকিশোর সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনে যোগ দিলেন। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের যাঁরা রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন তাঁদের সংস্পর্শে এসে রাজনীতিতেও তাঁর আগ্রহ দেখা দিল।

এফ্. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করলেন তারাকিশোর। বাবা হরকিশোর আর রাগ করে থাকতে পারলেন না মা-মরা ছেলের ওপর। বাইরেটা রুক্ষ হলেও তাঁর মন ছিল বড় কোমল। ছেলের পড়ার খরচপত্র আবার তিনি পাঠাতে লাগলেন। তারাকিশোর বি. এ. পরীক্ষার পর দর্শনশাস্ত্রে এম্. এ. পাশ করেন। ভাবপ্রবণ ও চিন্তাশীল প্রকৃতির জন্যে স্বভাবতই দার্শনিক তত্ত্বগুলি তাঁকে আকৃষ্ট করতো। পরবর্ত্তী জীবনে দর্শনশাস্ত্রে তিনি মহাজ্ঞানী বলে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এম্. এ. পাশ করার পর সিটি কলেজে অধ্যাপনার ভার নিয়েছিলেন।

এ সময় আর একটি সামান্য ঘটনা আবার তাঁর জীবনে বিরাট পরিবর্ত্তন এনেছিল। কলকাতায় এক সার্কাসে একদিন দেখলেন হিংস্র বাঘকে তার বিদেশী পালক চোখের দৃষ্টিতে সম্মোহিত করে বশীভূত করে দিল। তারাকিশোর ভাবলেন মানুষের পাশবিক শক্তিকেও এমনভাবে নিস্তেজ করে দিতে পারে এমন শক্তিমান মহাপুরুষকে কি গুরুরূপে পাওয়া যায় না? প্রকৃত সদ্‌গুরুর সন্ধান পেলে শিষ্যের সমস্ত অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে এই তাঁর বিশ্বাস হলো। এরপর তিনি ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হলেন। তাঁর বন্ধু কালিনাথ দত্ত যোগসাধনা করতেন। কালিনাথ দত্তের প্রভাবে তাঁর গুরু জগৎবাবুর কাছে তিনি দীক্ষা নেন। গুরুর কাছে প্রাণায়াম অভ্যাস করেন কিছুকাল। তাঁর মনের জ্যোতি শরীরে এক দিব্যশক্তি রূপে প্রকাশিত হতে লাগল। ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করার পর ব্রাহ্মমতগুলির অসম্পূর্ণতা বিষয়ে তিনি সাময়িক পত্রিকাগুলিতে মন্তব্য করেন। ফলে তাঁকে সিটি কলেজে অধ্যাপনা ছেড়ে দিতে হয়। হরকিশোর তখন ছেলেকে অনুরোধ করলেন আইন পড়তে। আইন পরীক্ষায় পাশ করে তারাকিশোর হবিগঞ্জে আর শ্রীহট্টে ওকালতি সুরু করেন। তারাকিশোর যাই করতেন তাতে তাঁর সম্পূর্ণ উৎসাহ এবং প্রচেষ্টার সংযোগ থাকত, তাই অল্পকালের মধ্যে তিনি আইনজ্ঞ বলে খ্যাত হয়েছিলেন। কিছুকাল পরে কলকাতার হাইকোর্টেই ওকালতি আরম্ভ করেন। কলকাতায় এসে জগৎবাবুর সংস্পর্শে পুনরায় যোগসাধনে উৎসাহী হন ও আশ্চর্য্যের বিষয় আদালতে প্রতিপত্তি এবং যোগমার্গে উন্নতি তাঁর একই সঙ্গে বাড়তে থাকে।

কিছুকাল যোগাভ্যাসের পর তারাকিশোর আর তেমন তৃপ্তি পেতেন না। তিনি চাইতেন সম্পূর্ণ জ্ঞান, সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঈশ্বর-উপলব্ধিতে। এই অজানা জ্ঞানের সন্ধানে বেড়িয়েছিলেন তিনি অনেকদিন আগে, এক ধর্ম্ম থেকে আর এক ধর্ম্মের অভ্যন্তরে। অসংখ্য দর্শনগ্রন্থের ভেতরে হাতড়ে বেড়িয়েছিলেন পরম তৃষ্ণা মেটাবার আশায়,—শেষে ভয় হল

কোনদিন কি পথের সন্ধান মিলবে না? গঙ্গার ধারে ব্যাকুল হয়ে একদিন তিনি প্রার্থনা করলেন—তিনি সদ্‌গুরু চান, মুক্তির উপায় চান। তাঁর ভগবৎ-দর্শন হয়, গঙ্গোত্রী গোমুখী তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পান। দেখতে পান তুষারধবল অপূর্ব্ব জ্যোতিমণ্ডিত মহেশ্বর-মূর্তি। শুনলেন একটি একাক্ষরী মন্ত্র জপ করে কি উপায়ে গুরুর সন্ধান পাবেন। তারাকিশোর আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন।

১৩০১ সালে শ্রাবণ মাসে জন্মাষ্টমীর দিন গুরু কাঠিয়া বাবাজীর কাছে পূর্ণ দীক্ষা লাভ করেন। বৈষ্ণবের সহজ সরল ঈশ্বরপ্রেমে এতদিনে তারাকিশোরের স্নেহময় হৃদয় তৃপ্তি পায়। গুরুর সঙ্গে তীর্থভ্রমণ করে তারাকিশোর কলকাতায় ফিরে সংসারে থেকেও সন্ন্যাসীর মতন ছিলেন। কিছুকাল পরে ওকালতি ও সংসার ছেড়ে বৃন্দাবনে একটি মন্দির স্থাপন করেন। বৃন্দাবনের নিম্বার্ক সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব বারি সম্প্রদায়ে তারাকিশোর ব্রজবিদ্রোহী মোহন্ত স্বামী সন্তদাস রূপে দেবসেবায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি ধর্ম্মবিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই সব লেখা থেকে তাঁর ভক্তহৃদয়ের আর অসীম জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্বার্ক থেকে বৃন্দাবন যাত্রার পথে ১৩৪২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

সাধক তুলসীদাস

ভারতবর্ষে যে সকল কবিদের নিয়ে আমরা গর্ব্ব অনুভব করি, ভক্ত কবি তুলসীদাস ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সামাজিক জীবনে তাঁর রচনার প্রভাব যথেষ্ট ছিলো। প্রয়াগের কাছে রাজপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিলো আত্মারাম দূবে, মাতা হুলসী দেবী। আত্মারাম ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। কথিত আছে যে—তুলসীদাস অনেকগুলি অশুভ লক্ষণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্য তাঁর পিতা শিশুটীকে জন্মাবার পরেই পরিত্যাগ করবার সঙ্কল্প

করেন। মার মন ছেলের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে, কিন্তু উপায় নেই। স্বামী ওই ছেলেটীকে পরিত্যাগ করবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করেছেন। কাজেই তিনি চোখের জল মুছে চুনিয়া-ঝিকে শিশুটীর সকল ভার দেন। চুনিয়া সেই দিনই ছেলেটীকে নিয়ে বাড়ী চলে যায়। হুলসী দেবীরও তার পরের দিন মৃত্যু হয়।

চুনিয়া খুব আদর যত্নে ছেলেটীকে মানুষ করছিলো। তুলসীদাসের পাঁচ বছর বয়সের সময় চুনিয়ারও মৃত্যু হয়। বালক তুলসীদাস নিরাশ্রয় হয়ে পড়েন। পরের অনুগ্রহে এবং অন্যের আশ্রয়ে তাঁকে দুচার দিন করে কাটাতে হয়েছিলো এবং তিনি যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করেছিলেন। ভগবান হয়তো ভক্তের কষ্ট সহ্য করতে পারেন নি। রামসোল-বাসী শ্রীনরহরিদাস বাবাজী স্বপ্নাদেশ পেয়ে তুলসীদাসকে খুঁজে বার করেন। ইনিই তাঁর নাম রাখেন রাম-বোল। তুলসীদাস তাঁর সঙ্গে অযোধ্যায় যান এবং তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। উপনয়নের পর নরহরিদাস বাবাজী তুলসীদাসকে পঞ্চসংস্কার করান এবং রামমন্ত্রে দীক্ষা দেন। তাঁর কাছ হতেই তুলসীদাস রামায়ণ শুনতেন, এই রামায়ণ-গানই তাঁর মনের মধ্যে রামভক্তির বীজ বপন করে। এই ভক্তিই তুলসীর কবিত্ব-প্রেরণার মূল।

বিদ্যাশিক্ষা শেষ করে তিনি জন্মভূমি দেখবার জন্য প্রয়াগে যান, এই সময় তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর স্ত্রী রত্নাবলী খুব সুন্দরী ছিলেন। তুলসীদাস তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাঁকে একদণ্ডও ছেড়ে থাকতে পারতেন না। এজন্য রত্নাবলী মধ্যে মধ্যে বেশ বিরক্ত হতেন। একবার তিনি বাপের বাড়ীতে যান, সেখানে পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরে দেখলেন তুলসীদাসও সেখানে উপস্থিত। লজ্জা এবং বিরক্তিতে রত্নাবলী স্বামীকে ভর্ৎসনা করেন। তিনি বল্লেন—সামান্য একটী নারীর প্রতি তোমার এত আকর্ষণ, তার অর্ধেকও যদি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি থাকতো, তাহ'লে সংসার-সমুদ্র সহজেই পার হয়ে যেতে। স্ত্রীর ভর্ৎসনায় তাঁর জ্ঞান হোলো। তিনি তখুনি শ্বশুর বাড়ী ছেড়ে চলে

গেলেন। আর ফেরেন নি। সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করে বারাণসী তীর্থে চলে যান। রামায়ণ গান করেই তিনি জীবিকা অর্জ্জন করতেন। বহুকাল নানা তীর্থে ভ্রমণ করে তিনি একবার নিজের দেশে আসেন এবং শ্বশুরবাড়ীতেই অতিথি হয়েছিলেন। এই বাড়ীখানি যে তাঁর শ্বশুরের বাড়ী তা তিনি জানতেন না। অতিথিসেবা করতে এসে রত্নাবলী তুলসীদাসকে চিনতে পারেন কিন্তু তুলসীদাস তাঁকে চিনতে পারেননি। তুলসীদাসের রান্না করবার সময় রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করেন, "মরিচ লাগবে কি ?" তুলসীদাস বল্লেন—"না, দরকার নাই।" আবার রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করলেন, "ঝাল এনে দেবো কি ?" তুলসীদাস বল্লেন, "না, এ সবই আমার ঝুলিতে আছে, আর দরকার হবে না।" এরপর রত্নাবলী নিজের পরিচয় দিয়ে স্বামীর পদসেবা করতে যান। তুলসীদাস তাহা প্রত্যাখান করে প্রস্থানের উদ্যোগ করলেন। রত্নাবলী তখন বল্লেন, "গোসাঞি! আপনি সর্ব্বত্যাগী হয়েও সকল জিনিষ ঝুলির মধ্যে রেখেছেন, কেবল আমাকেই ঝুলির মধ্যে স্থান দিতে পারলেন না।" স্ত্রীর এই কথায় তাঁর জ্ঞান হোলো, তিনি মনে ভাবলেন, যখন সংসারই পরিত্যাগ করেছি তখন আর বৃথা ঝুলি বয়ে বেড়াই কেন ? তখনি তিনি ঝুলিটী পরিত্যাগ করলেন। রামায়ণ-গানই রইলো তাঁর শেষের সম্বল। কথিত আছে, এইবার তিনি শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করেছিলেন। 'রামচরিত মানস' তাঁর জনপ্রিয় রচনা, এর পাণ্ডুলিপি এখনও তাঁর জন্মস্থান রাজপুরে সযত্নে রক্ষা করা হচ্ছে। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে তিনি এই বইগুলি রচনা করেন। তার মধ্যে দোঁহাবলী, গীতাবলী, ভক্তমাল তাঁর কয়েকটী বিশেষ জনপ্রিয় রচনা। এ ছাড়া আরও অনেকগুলি বই রচনা করেন। রামলীলা, কৃষ্ণ-দোঁহাবলী যুক্তপ্রদেশে নাটক ও সঙ্গীত হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 'রামচরিত মানস' তুলসীদাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা, উহা 'তুলসী রামায়ণ' নামে খ্যাত। দুই বছর সাত মাস ছাব্বিশ দিন লেগেছিলো এই রচনাটী শেষ করতে। রচনাটী শেষ করে তিনি রাত্রে

শ্রীবিশ্বনাথের মন্দিরে রাখেন। সকালে যখন মন্দির-দ্বার খোলা হোলো, তখন দেখা গেলো যে বইয়ের উপর লেখা আছে "সত্যং শিবং সুন্দরম্", এই কয়টি কথা উচ্চারিত হতেও অনেকে শুনেছিলেন। একথা শীঘ্রই প্রচারিত হোলো, তখন পণ্ডিতেরা গেলেন ভীষণ চটে, তাঁরা দলবদ্ধ হয়ে তাঁর নিন্দাবাদ শুরু করে দিলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র যাঁর সহায়, মানুষ তাঁর কি ক্ষতি করবে? পণ্ডিতেরা 'রামচরিত মানসে'র পাণ্ডুলিপি হস্তগত করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা রাত্রে ঐ পাণ্ডুলিপিখানি সরিয়ে ফেলার মতলবে একজন লোক পাঠান। কিন্তু সে এসে দেখে দুইটী সুদর্শন মূর্ত্তি ধনুর্ব্বাণ হাতে তুলসীদাসের বাড়ীর চারপাশে পাহারা দিচ্ছেন। সে লজ্জিত হয়ে পড়ে এবং নিজের ভুল বুঝতে পেরে সকল কথা তুলসীদাসকে খুলে বলে। এধারে ক্রমে ক্রমে 'রামচরিত মানস' ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় প্রচার লাভ করতে লাগলো। এই দেখে তো পণ্ডিতেরা গেলেন ভীষণ রেগে। তাঁরা তখন পণ্ডিত শ্রীমধুসূদন সরস্বতীকে রচনাটি দেখাবার জন্য নিয়ে আসেন। আশা করেছিলেন, পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতীকে দেখালে পণ্ডিতসমাজে বইখানির যথেষ্ট নিন্দে রটে যাবে। কিন্তু ফল হোলো ঠিক্ তার বিপরীত। পণ্ডিতজী লেখা দেখে খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং বইটীর উপরে প্রশংসা করে একটী শ্লোক লিখে দিলেন। তাইতে পণ্ডিতেরা আরও বেশী রেগে গেলেন। কিন্তু তুলসীদাসের তাইতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি। আজও তাঁর দোঁহা লোকের মুখে মুখে বৈষ্ণব পদাবলীর মতই ঘুরছে। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম ও কাশীবাসের জন্য হরপার্ব্বতীর প্রতি অবিচলিত আকর্ষণ তুলসীদাসের লেখার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলো। বাল্মীকির রামায়ণ-এর মূল সূত্র ধরে তিনি 'রামচরিত মানসে' কবিজনোচিত স্বাধীনতা ও কল্পনার নব নব অবদানে ভক্তির সহিত মাধুরী মিশ্রিত করে নূতন কাব্যের সৃষ্টি করেছিলেন। 'রামচরিত মানসে' শঙ্করকে বক্তা ও পার্ব্বতীকে শ্রোতা করা হয়েছে। নারদ ঋষির দর্পচূর্ণের কাহিনী ও সতীর সীতারূপ ধরে রামকে পরীক্ষা,

গরুড় ও কাক-ভূষণ্ডির কথা প্রভৃতি অনেক স্ব-রচিত সুন্দর গল্পে তুলসীদাস তাঁর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ক্ষমতা ও কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তুলসী রামায়ণ এবং বাল্মীকির রামায়ণে অনেক তফাৎ আছে। তুলসীদাস শ্রীরামচন্দ্রকে নির্দ্দোষ দেবোপম চরিত্র দেখিয়েছেন, শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের ত্রুটীগুলি ঢেকে দেবার চেষ্টা করেছেন। 'রামচরিত মানসে' তুলসীদাস সীতাবর্জ্জন রচনা করেননি, শম্বুকবধেরও উল্লেখ নেই। বালী-বধ সম্বন্ধে লিখেছেন, বালী অসৎ চরিত্র ছিলেন, সেই জন্য তাঁকে বধ করায় কোন পাপ হয়নি, ধর্ম্মরক্ষা করাই হয়েছে। দুষ্টকে দমন করাই শ্রেয়। রামকে তুলসীদাস এত ভালোবাস্‌তেন যে, তাঁর রাজত্বের মহত্ত্ব মাধুর্য্য ও শান্তির খ্যাতি করেই শেষ করেছেন। শেষের দিকে বিষাদময় শোকজীর্ণ ঘটনাগুলি চিত্রিত করেননি। যুক্তির দিক দিয়ে তুলসীদাস হরপার্ব্বতীর আলোচনায় নিজের সংশয় নিরসনের সুন্দর অভিব্যক্তি দিয়েছেন। গরুড় একবার ব্যাকুল ভাবে নারদের কাছে গিয়ে রাম সম্বন্ধে নিজের সংশয় প্রকাশ করেছিলো। সে বল্লে—ইন্দ্রজিতের নাগ-পাশে বন্দী রামচন্দ্রকে আমি মুক্ত করলাম। শুনেছিলাম সর্ব্বশক্তিমান ভগবানই শ্রীরাম রূপে এসেছিলেন। এখন দেখছি তার কিছুই শক্তি নেই। যার নাম স্মরণ করলে মানুষের ভববন্ধন কেটে যায়, সামান্য রাক্ষস সেই রামকে বাঁধলো!

ভব বন্ধন তেঁ ছুটাহি নর জপি জাকর নাম
খর্ব্ব নিশাচর বাঁধেউ নাগপাশ সোই রাম॥

নারদ গরুড়কে ব্রহ্মার কাছে পাঠালেন, ব্রহ্মা তাকে শঙ্করের কাছে পাঠালেন। শঙ্কর তাকে দীর্ঘকাল সৎসঙ্গ করতে বল্লেন; আর বল্লেন—

মিলতি ন রঘুপতি বিনু অনুরাগা।
কিয়ে যোগ জপ যজ্ঞ বিরাগা॥

ভক্তি না হ'লে রঘুপতি মেলে না। জপ-তপের কর্ম না। যোগ নিতান্ত কঠিন, সকল লোক পারে না। বিশুদ্ধ জ্ঞানও দুর্ল ভ। এই জন্যে

গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের জন্যে ভক্তির পথ অবলম্বন করতে বলেছেন। তুলসীর বিশ্বাস-নির্ভর শরণাগতিকেই তিনি ভক্তি বলেছেন। তিনি বল্লেন, 'বল, ভক্তির পথে কোন্ কষ্ট আছে? জপ তপ উপবাস কিছুই নেই, শুধু স্বভাব সরল রাখো, মন কুটিল কোরো না। যা পাও তাতেই সর্বদা সন্তুষ্ট থাকো।'

কোন কোন সমালোচক শ্রীরামচন্দ্রকে সাধারণ মানুষ হিসাবে অনেক দোষ ত্রুটি গুণাগুণের বিচার করেন কিন্তু তুলসীদাসের রাম তা নয়। তিনি তাঁর ইষ্টদেব জগৎপিতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, ভক্তের দুঃখহারী প্রভু। তাঁর একান্ত বিশ্বাস থাকার জন্য শ্রীরামচন্দ্র অনুগ্রহ করে মৃত্যুর সময় তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন। কাশীতে তাঁর মৃত্যু হয়। এখনও সেই স্থানটি কুশীঘাট নামে খ্যাত।

প্রবন্ধ

নৃত্য

সৃষ্টির আদিম প্রভাতে যখন মানুষ নিজে ভাবতে ও বুঝতে শিখেছে তখন থেকেই বোধকরি এই নৃত্যের প্রচলন। কারণ মানব সমাজে আত্মপ্রকাশের গৌরবই ছিল নৃত্য। সুখ, দুঃখ, রাগ অনুরাগে ভরা হৃদয়ে বিচিত্র ভাবের সৃষ্টি হয়। ভাব অভিব্যক্ত হয় নৃত্যে, কারণ নৃত্যই হয় ভাষার বাহক। নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চঞ্চলতার মধ্য দিয়ে এই নৃত্যকলাই আদিম যুগের মানুষের মনে প্রেরণা এনেছিল। আজো অনেক জাতির মধ্যে তাদের কোন মাঙ্গলিক বা ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে এই নৃত্যের প্রচলন দেখা যায়। নৃত্যের অপরূপ ভঙ্গিমার মধ্যে কত কল্পনা, কত রহস্য লুকিয়ে থাকে। মনের অব্যক্ত ভাবকে সঙ্গীত প্রবল করে তোলে—অন্তর আকুল হয়ে দেহে আসে চঞ্চলতা। অন্তরের আনন্দ, গোপন ভাব প্রকাশ পায় নৃত্যে।

প্রাচীন শিল্পীরা তাঁদের অন্তরের মাধুর্য্য দিয়ে বহুযুগের জীবন-

যাত্রার কাহিনী অজন্তার পাষাণ প্রাচীরের মধ্যে খোদিত করে গেছেন। আজ সেইসব পুরাতন জীবনযাত্রার বিচিত্র কাহিনী পাথরের মধ্য থেকে জাগ্রত হয়ে উঠেছে। মানুষকে দিয়েছে প্রেরণা, অন্তরে জ্বালিয়েছে রাগ-ব্যঞ্জনা। সেই পুরাতন শিল্পকলা মানুষকে করেছে স্বপ্নালু। মানুষের মন যখন অবসাদে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন বাইরে থেকে নিজেকে সে সরিয়ে এনে শিল্পী-মন দিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করে। মুহূর্তের জন্য হলেও নিজেকে সে ভাবে শিল্পী, কবি। তখন সব আবরণ তার খুলে যায়। মন ভরে ওঠে আনন্দে - তাই অভিব্যক্তির মধ্যেই সে তার পথ খুঁজে নেয়। হিন্দু পুরাণের মধ্যে যা ছিল সমাহিত, মানুষের নৃত্যে হলো তার প্রকাশ। শিল্পীর নৃত্যলীলায় ফুটে উঠলো প্রাচীন ঋষিদের বাণী।

এই নৃত্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটির নাম তাণ্ডব, অপরটির নাম লাস্য। এই লাস্য নৃত্যের মধ্যে ফুটে ওঠে দুর্লভকে পাবার ব্যাকুল কামনা—যা মানুষের মনে চঞ্চলতা এনে দেয়, এই নৃত্য সেই গতিকে চরণ-বিক্ষেপের আঘাতে উৎক্ষিপ্ত করে। শ্রীকৃষ্ণকে পাবার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আজো শ্রীরাধার স্বপ্নকে, অনুরাগের মধুর কল্পনাকে রাঙ্গিয়ে দেয়। দেহের লীলায়িত ভঙ্গীতে ফুটে ওঠে সেই মহাকাব্যের ঝঙ্কার। তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে দেখি সেই সত্য, শিব ও সুন্দরকে। একদিকে তার ধ্বংস, অপরদিকে তার সৃষ্টি। একদিকে মৃত্যু, আর একদিকে জীবন। যতকিছু মলিনতা পাপ আছে, সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। অসুন্দরের হয় মৃত্যু। তারপর সেই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আবার বেঁচে ওঠে মানুষ, গড়ে ওঠে নতুন পৃথিবী। সমস্ত আবিলতা মুছে গিয়ে সত্য হয়ে ওঠে অপরূপ। কারণ সত্যই সুন্দর। আর যা কিছু সুন্দর তাই শিব। এর লয় নেই, ক্ষয় নেই। এ অবিনশ্বর। তাই তাণ্ডব নৃত্য ধ্বংসের প্রতীক হলেও সুন্দর ও নবীনের প্রতিভূ। তাই রুদ্র এত প্রিয়—কারণ তাঁর বিষাণে ধ্বংসের মাঝেও ধ্বনিত হয় সৃষ্টির জয়গান।

তোমায় সাজাবো যতনে

নিজের দেহকে সুন্দর করবার প্রচেষ্টা সকল নারীরই সহজাত প্রবৃত্তি। মুখশ্রীটুকু রমণীয় করে নিজের দেহকে যথাযথ সজ্জিত করে তোলবার ইচ্ছা সকলেই করে থাকেন। পরিপূর্ণ দেহসৌন্দর্য্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন কম লোকেই। মানুষের দেহে নিখুঁত সৌন্দর্য্য দেখা যায় না। কিছু না কিছু ত্রুটি থেকেই যায়। কিন্তু এই ত্রুটির জন্য অযথা মন খারাপ করা ঠিক নয়। স্বাস্থ্য বিষয়ে একটু মনোযোগ দিলে এবং সামান্য একটু দেহ-পরিচর্য্যা করলে হয়তো লাবণ্যযুক্ত দেহ লাভ করা যেতে পারে। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও সুন্দর মুখশ্রী সহজেই আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা শরীর-রক্ষার প্রতি উদাসীন বলেই অল্প বয়সেই সকল সৌন্দর্য্য হারিয়ে হতশ্রী হয়ে পড়েন। রূপের পরিচর্য্যা করতে হলে অঙ্গরাগের যেমন প্রয়োজন তেমনি স্বাস্থ্যরক্ষা করতে হলে শরীরচর্চ্চা করাও বিশেষ প্রয়োজন। রূপচর্চ্চা আমাদের দেশে পুরানো জিনিষ। বহুকাল থেকেই আমাদের দেশে এর প্রচলন আছে। কবি কালিদাসের কাব্যে নারীর রূপের যে বর্ণনা আছে তার মধ্যেও সে কালের অঙ্গরাগের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগে বিদেশী জিনিষের উদ্ভব এদেশে হয়নি, কাজেই সম্পূর্ণ দেশীয় জিনিষের দ্বারাই নানারূপ প্রসাধন সামগ্রী তৈরী করে নিতে হতো। যথাযথ অঙ্গরাগ ব্যবহার করলে মুখশ্রী বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। বিলিতি জিনিষের যথেষ্ট প্রচলন হবার পর আমাদের দেশীয় বহু জিনিষের ব্যবহার একেবারেই কমে গেছে। আগেকার মোমবোট, রূপটান প্রভৃতি প্রসাধনী জিনিষের ব্যবহার লোপ পেয়েছে বল্লেই হয়। ঘরে প্রস্তুত বহু জিনিষের এখন আর সেরকম চল নেই। কিন্তু আমরা যদি একটু কষ্ট করে সেই-সব সুলভ অথচ সুন্দর জিনিষগুলি আগের মতন তৈরী করে আবার ব্যবহার করি এবং তার দ্বারা যদি যথেষ্ট উপকার পাই তাহলে সেই পন্থা অনুসরণ করাই কি ভাল নয়?

এখন দেখতে হবে প্রসাধনের অর্থ কি। যাকে যেমনি সাজে মানায় তার সেই ধরণের সাজাই ভালো। দেহের গঠন এবং মুখশ্রী অনুযায়ী সাজাই হল ফ্যাসান্। একজনের মুখে যে জিনিষটি মানায় অন্যকে তাইতে নাও মানাতে পারে। কাজেই রুচিসম্মত যথাযথ সাজ-সজ্জার দ্বারাই দেহের সৌন্দর্য্য যে বৃদ্ধি পায় তাতে আর কোন ভুল নেই। বাঙ্গালা দেশের মেয়েদের খাঁটি বাঙলা পোষাকেই বেশী মানায়। অন্য দেশীয় সাজের সঙ্গে এ দেশীয় সংমিশ্রণ যে সৌন্দর্য্যহানি করে তা বলাই বাহুল্য। সাধারণতঃ পোষাক এক দেশীয় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সকল দেশের মেয়েরাই এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশেই এই রুচিবোধের অভাব দেখতে পাই। কিছুদিন পূর্ব্বে পাড়-বিহীন সাড়ী পরা মেয়েদের এক ফ্যাসান্ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আমাদের দেশের গৃহলক্ষ্মীদের যে এই পাড়বিহীন শাড়ীতে একেবারেই বেমানান দেখায় তা অবশ্য অনেকেই স্বীকার করবেন। আর নিজেদের বিচার-বুদ্ধি ও রুচিকে জলাঞ্জলি দিয়ে অপরের রুচিমত চলা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। কেবল মাত্র অপরের কথার ভয়ে আমরা অনেক সময় নিজস্ব রুচির বদলে বিকৃত রুচির পরিচয় দিয়ে থাকি, এটা খুবই দুঃখের বিষয়। 'পাছে লোকে কিছু বলে' এ ধরণের মনোভাব বিসর্জ্জন দিতে না পারলে আমরা কখনও সহজ হতে পারবো না। কালিদাসের যুগের মেয়েদের নিজস্ব রুচি অনুযায়ী যে অঙ্গসজ্জা, যা কালিদাসের কাব্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে, সত্যি তা কত মনোমুগ্ধকর। অজন্তার ছবিতেও আমরা সেই জাতীয় সুরুচির পরিচয় পাই।

"অলকে কুসুম না দিও
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিও।"

সত্যি, আগে শিথিল কবরীতে মেয়েদের সৌন্দর্য্য কতখানি প্রকাশ হতো। শিথিল কবরীতে মেয়েদের এক স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়, যা কবিদের মধ্যে ভাবের প্রেরণা এনে কবিকে উৎসাহিত করে তোলে। কিন্তু কবরীর প্রধান সৌন্দর্য্য তার কেশ। উপযুক্ত কেশ

না থাকলে এই কেশের সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে না। আগে অধিকাংশ মেয়েদের মাথায় ছিল অপর্য্যাপ্ত চুল। থোকা থোকা ঘন কাল চুল, মসৃণ চিক্কণ। তাই সে সময় ছিল খোঁপা বাঁধার নানা কারিকুরি। কলা খোঁপা, কদলী ইত্যাদি বিচিত্র রকমের নমুনা তখন দেখতে পাওয়া যেতো। কিন্তু এখন আর তা দেখা যায় না। মেয়েদের মাথার চুল এখন কমতে কমতে 'বব্‌ড হেয়ারে' এসে দাঁড়িয়েছে। এতেই নাকি মেয়েদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়। তাই আধুনিক ফ্যাসান্ হিসাবে এটা চল হয়েছে। কিন্তু এতে যে মেয়েদের সৌন্দর্য্যের কতখানি হানি হয় ও মেয়েদের রূপকে বিকৃত করে তোলে তা রুচিপরায়ণ ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারেন। আগের দিনে মেয়েদের প্রসাধন ছিল খুব সাদাসিদে ধরণের। সুন্দর করে চুল বেঁধে, চোখে সরু করে কাজল দিয়ে, সামান্য একটু পাউডারের সাহায্যেই তাঁদের সাজ সম্পূর্ণ হতো। এতেই তাঁরা সৌন্দর্য্যময়ী হয়ে উঠতেন। কিন্তু এখন নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে দীর্ঘ সময় প্রসাধন সেরে যখন অনেক তথাকথিত আধুনিকারা নিজেকে পাঁচজনের সামনে বের করেন তখন খানিকটা লজ্জা ও বিরক্তিতে অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নেন। তথাকথিত ফ্যাসান্ নামে যে বিকৃত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যি লজ্জাকর। মানুষের সহজ, সুন্দর রূপটি এই বিকৃত রুচির তলায় একেবারে চাপা পড়ে যায়।

মেয়েদের সর্ব্বপ্রথমে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সজাগ হতে হবে। কারণ স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্যের মূল আধার। সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারিণী না হলে নারী কখনই সৌন্দর্য্যময়ী হয়ে উঠতে পারে না। তারপর কৃত্রিম প্রসাধন সামগ্রী যত কম হয় ততই ভাল। যেগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গল সেগুলিই ব্যবহার করা উচিত। এইভাবে প্রত্যেক মেয়ে যদি নিজেদের স্বাস্থ্য ও প্রসাধন সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়ে ওঠে তাহলে অদূরেই তারা সুন্দর স্বাস্থ্য ও রূপলাবণ্যের অধিকারিণী হতে সক্ষম হবে। সৌন্দর্য্যময়ী নারী তখনই কাব্যের প্রিয়া হয়ে উঠবে।

জাতকের ইতিকথা

'জাতক' শব্দটি বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ভগবান বুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্ত কথিত আছে। বৌদ্ধেরা বলেন শুধু এক জন্মের কর্ম্মফলে গৌতমবুদ্ধের ন্যায় মহামানবের জন্ম হওয়া সম্ভব নয়। তিনি যুগে যুগে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে সৎকর্ম্মের দ্বারা উত্তরোত্তর চরিত্রের উন্নতি সাধন করে পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। তিনি অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা গত জন্মের সকল কথাই জানতে পারতেন। তাঁর শিষ্যদের বহু উপদেশমূলক অতীতের কথা শুনিয়ে তিনি নির্ব্বাণ অভিমুখে পরিচালিত করতেন। জাতকের গল্পগুলি বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের একটি অংশ। জাতক-কথা পালি ভাষাতেই লেখা ছিল। পরে অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

এই জাতক-কথা তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আছে কি উদ্দেশ্যে জাতক লেখা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে মূল গল্প—এতে বুদ্ধদেবের অতীত জন্মকথা লেখা আছে। তৃতীয় অংশে অতীতের সহিত বর্ত্তমানের কি প্রভেদ তাই দেখানো হয়েছে। মূল জাতকের সঠিক সংখ্যা কত বলা শক্ত। গল্পের মধ্য দিয়ে এইভাবে উপদেশ দেবার পদ্ধতি বহুদিন থেকেই চলে আসছে। এইসব গল্পের সঙ্গে ঈশপের গল্পের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এইসব গল্প গদ্যে এবং কবিতায় লেখা আছে। এই কবিতাগুলির নাম 'গাথা'। এর মধ্যে বহু উপদেশ লিখিত আছে। যেগুলি সরস এবং সারগর্ভ সেইগুলিই লোকে মনে রাখতো। জাতকের গল্পগুলিতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়-বস্তু দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ এই গল্পগুলি উপদেশমূলক এবং মহাপুরুষের বাণীবিশেষ। কাজেই ছোট বড় সকলেই আনন্দের সঙ্গে এই সকল উপদেশাদি গ্রহণ করবেন। সর্ব্বজীবের প্রতি যেন একটা প্রীতিভাব জন্মায়। বৌদ্ধধর্ম্মে বলে, সকল জীবকেই নিজের মত দেখো। যিনি এ যুগে বুদ্ধ, তিনি নানা জীবে বিভক্ত ছিলেন। সকল জীবই

নিজের কর্ম্মের দ্বারা উন্নতি সাধন করে, মানব-জন্ম লাভ করে। আবার কর্ম্মক্ষয় হলে পরে নির্ব্বাণ লাভ করে। এ ছাড়া এই গল্পের মধ্য দিয়ে পুরাকালের রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। বহুদিন আগে যখন ভারতবর্ষের সঙ্গে নানা দেশের সংযোগ ছিল না, তখনকার দিনের সামাজিক চিত্র দেখতে হলে এই সকল গল্প জানা দরকার।

আমরা দেখতে পাই প্রাচীন যুগেও ধনী লোকেরা প্রাসাদেই বাস করতেন এবং বণিকেরা সমুদ্রপথে বিদেশে বাণিজ্য করতে যেতেন। নগরবাসীরা চাঁদা সংগ্রহ করে অনাথাশ্রম চালাতেন এবং দরিদ্র ছাত্রেরা অধ্যাপকদের কাছে বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা করতেন। তখনকার দিনে কাঠের তক্তিতে লেখা বা অঙ্ক কষা হতো। ভারতবর্ষের মধ্যে তক্ষশীলা নগরই তখন বিদ্যাশিক্ষার শ্রেষ্ঠস্থান ছিল। দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত ছিল বলে অবস্থাপন্ন লোকেরা মূল্য দিয়ে দাসদাসী ক্রয় করতেন। শাসনপ্রণালী সাধারণতঃ রাজতন্ত্র ছিল বটে কিন্তু রাজপদ যথেষ্ট নিরাপদ ছিল না। রাজা অত্যাচারী হলে প্রজারা বিদ্রোহী হতো এবং অনেক সময় তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করা হতো। অনেক সময় রাজপুত্রেরাও পিতার বিরুদ্ধে যেতো। রাজাকে তাই বিশেষ সাবধানে চলতে হতো। মেয়েদেরও সুশিক্ষা দেওয়া হতো এবং যৌবনে পদার্পণ করবার আগেই পাত্রস্থ করা হতো। ক্ষত্রিয়েরা নিকট আত্মীয়াকেও বিবাহ করতে পারতেন। সম্ভ্রান্ত বংশেও বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। এছাড়া স্বামী সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করলে স্ত্রী দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারতেন। দুঃস্বপ্ন দেখলে লোকের মনে আতঙ্ক হতো এবং ভূত-প্রেতেও লোকের বিশ্বাস ছিল। সেই সময় অর্থের দ্বারা অপরের পুণ্যাংশ ক্রয় করা যেতো। যাঁরা সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করতেন তাঁরা 'কামিনী-কাঞ্চন'কে ভয় করে চলতেন। এই জন্যই কোন কোন জাতকে নারীদের উপর বিরূপ মনোভাব দেখানো হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে ভিক্ষুদের মনে নারী সম্বন্ধে একটা বিতৃষ্ণার উদ্রেক হয়।

কিন্তু উৎপল বন্যা, বিশাখা, আম্রপালী প্রভৃতিতে দেখা যায় নারীরা পুরুষদের সমকক্ষই ছিলেন এবং তাঁদের সর্ব্ববিষয়ে সমান অধিকার ছিল।

জাতক পাঠ করলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃতি বিশেষভাবে বোঝা যায়। অনেকের বিশ্বাস বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতির মত বৌদ্ধধর্ম্মকেও হিন্দু ধর্ম্মের একটি শাখা বলা যেতে পারে। এতে হিন্দুধর্ম্মের মতই জন্মান্তরবাদ, পরলোক, স্বর্গনরক, কর্ম্মফল ইত্যাদি আছে। শুধু প্রাণীবধ নেই। বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যেও এই ভাব দেখা যায়। এতেই বোঝা যায় হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব শুধু ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, দেশ-দেশান্তরেও এর অসীম প্রভাব। গৌতম বুদ্ধের বাণী লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীকদেশেও দেখা যায়। ভগবান বুদ্ধ শুধু এই দেশেই পূজিত হননি, তাঁর ধর্ম্মের নির্ম্মল প্রভাবে পৃথিবীর কোটি কোটি লোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছে। এ দেশবাসীর ন্যায় তাদের অন্তরেও তিনি ভগবানরূপে অধিষ্ঠিত আছেন।

বিবাহিতা জীবন বনাম স্বাধীন জীবন

বর্ত্তমানে শিক্ষিতা মেয়েরা স্বাবলম্বী হতে চান বলেই হয়তো তাঁরা ভাবেন যে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করতে পারলেই বুঝিবা তাঁরা সুখী হবেন। নিজেদের স্বাধীনতা ও নিজস্ব সত্তাকে অপরের হাতে তুলে দিতে চান না বলেই পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে তাঁরা একেবারেই নারাজ। আমার মনে হয় বিবাহিত জীবনই বোধকরি শ্রেয়। কারণ সংসারে একমাত্র স্বামীই নারীর নির্ভরস্থল। সুখে দুঃখে সকল অবস্থায় নারীকে সংসারের যাবতীয় ঝড়-ঝাপটা থেকে রক্ষা করে থাকেন স্বামী। বর্ত্তমানে দেশের যে পরিস্থিতি তাতে নিজের মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে নিজের ভরণ-পোষণের জন্য সংসারের দুর্গম পথে প্রতি পদক্ষেপে

যে সংঘাত সহ্য করতে হয় তাতে মনের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা খুবই কঠিন। তাছাড়া জীবনের শেষভাগে অসম্পূর্ণ জীবনের বেদনাভরা মন যখন চাইবে পরম নির্ভরতা, একান্ত আশ্রয়, তখন হয়তো মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে বিবাহিতা মেয়েরা সত্যি কত সুখী—তাদের জীবনধারা কত সহজ, সরল ও সুন্দর।

মাতৃত্বেই নারী-জীবনের পরম সার্থকতা। নারী তখনই পূর্ণ যখন মাতৃত্বের গৌরবে সে গরীয়সী। প্রত্যেক নারীর মধ্যেই এই মাতৃভাব সুপ্ত হয়ে থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ভাব তাদের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিবাহিতা জীবনে নারী তাই সন্তান কামনা করে থাকে। সন্তানের দ্বারাই সে পায় পূর্ণ মর্য্যাদা। কারণ প্রত্যেক নারীর মধ্যে তুটি সত্তা বিরাজমান। একটি প্রিয়া, অপরটি মাতা। সন্তান হবার পূর্ব পর্য্যন্ত সে থাকে প্রিয়া। এই প্রিয়া অবস্থায় সে থাকে অপরিপূর্ণ অর্থাৎ নারীত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে না কিন্তু সন্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে হয় মাতা। মাতৃত্বের মাধুর্য্যে সে মহিমান্বিতা। তার নারীত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। অন্তরে বহে তার স্নেহের ফল্গুধারা, বাৎসল্য রসের অমৃত। নারী তখন সম্রাজ্ঞী।

তবে বিবাহিতা মেয়ে মাত্রই যে সুখী তা আমি বলছি না। কারণ বিবাহের পরে মেয়েদের জীবনের নতুন অধ্যায় সুরু হয়। অনেক মেয়ে স্বামীর ঘরকে বেশ মানিয়ে নিয়ে সুখে ঘরকন্না করে। আবার কত মেয়ের গোপন ব্যথার সমাপ্তি হয় নীরব অশ্রুপাতে। কত মেয়ের জীবন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় নতুন জীবনের প্রারম্ভে। আশা-আকাঙ্ক্ষার হয় পরিসমাপ্তি। বিবাহিত জীবনে মেয়ে সুখী হবে কি না একথা জোর দিয়ে বলা খুবই মুশ্‌কিল। কারণ সংসারে উভয়বিধ অবস্থায় মেয়েকে সুখী দেখতে পাওয়া যায়। তবে উভয় জীবনের তুলনামূলক সমালোচনা করলে বিবাহিত জীবনই মেয়েদের পক্ষে শ্রেয় আমার মনে হয়।

অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিয়ের বন্ধনকে এড়িয়ে অনেক মেয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করে স্বাবলম্বী হয়েছে। বিভিন্ন কর্ম-

স্থলে পুরুষের পাশে বহু মেয়েকে আজ কাজ করতে দেখা যায়। বিবাহিত জীবন যাপন না করার জন্য অনেকের মধ্যে কোন ক্ষোভও দেখা যায় না। নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব তারা মাথায় নিয়ে জীবিকা অর্জ্জন করে চলেছে। নিজেদের সুখ-সুবিধা, আনন্দ ইত্যাদি সব কিছুই ত্যাগ করেছে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব মাথায় নিয়ে। এরা প্রকৃত সুখী কি না জানি না তবে সংসারের অনেক ঝঞ্ঝাট ও অশান্তিকে এড়িয়ে এরা বেশ নির্ভাবনায় দিন কাটিয়ে যায়। তবে শেষের জীবনে হয়তো এরা একটা কিছুর অভাব বোধ করে এবং হয়তো তখন একটা পরম নির্ভরশীল আশ্রয়ের অভাব বোধে নিজেদের জীবনকে অসার্থক মনে করে। নারী ও পুরুষ উভয়ের একত্র সংযোগে জীবন পরিপূর্ণ হয়। একক নারী বা একক পুরুষ উভয়ের জীবনই অসম্পূর্ণ —পরিপূর্ণতার আস্বাদ কখনই তারা পায় না। কাজেই সংসার-জীবনে উভয়ের একত্র চলাই বোধকরি শ্রেয়।

কাজেই বিবাহিত জীবন ভাল, না স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করা ভাল, তা সঠিকরূপে বলা খুবই কঠিন। প্রত্যেক মেয়েরই এ বিষয় যথেষ্ট অবহিত হয়ে এগোন উচিত। প্রথম বয়সে জীবনের সৌন্দর্য্যপিয়াসী মন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করে। মনে মনে আশা থাকে সুন্দর একটি শান্তির নীড় রচনা করবার। কারো ভাগ্যে হয়তো তা সফল হয় আবার কারুর ভাগ্যে তার বিপরীত ঘটে থাকে। তখন জীবনের রঙিন্ স্বপ্ন ছুটে যায়। অশান্তির আগুনে মন জর্জ্জরিত হতে থাকে। তবু নারী তখন নিরুপায়। যে শৃঙ্খলে সে আবদ্ধা তার থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। ওই ভাবেই নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে কাটিয়ে যেতে হয় জীবনের কর্ম্মক্লান্ত দিনগুলি। তখন ভাগ্যকেই একমাত্র ভরসাস্থল করে এগিয়ে যেঁতে হয়।

বর্ত্তমানে দেশের যা পরিস্থিতি তাতে প্রত্যেক মেয়েরই আত্ম-নির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজন। এইজন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা ও জীবন-পথে চলবার সহজ জ্ঞান। প্রয়োজনবোধে মেয়েরাও যেন উপার্জ্জনক্ষম

হতে পারে—নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি অর্জ্জন করে। স্বামীর মৃত্যুর পর বা সংসারের নানাবিধ জটিলতায় অনেক মেয়েই সহায়-সম্বলহীনা, নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। তখন যদি তার উপযুক্ত শিক্ষা, মানসিক দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভরশীলতা থাকে তাহলে সেই বিপদে সংগ্রাম করে সে উত্তীর্ণ হতে পারে। নারী স্বভাবতই কোমলা কিন্তু প্রয়োজনবোধে যেন সে কঠোরা হতে পারে। তার চরিত্রের মধ্যে যেন শক্তির বিকাশ থাকে। তাহলেই জীবন-সংগ্রামে সে নিশ্চয়ই জয়ী হবে। পরমুখাপেক্ষী হয়ে অপরের করুণা ভিক্ষা করে বাঁচার চেয়ে স্বাবলম্বী হয়ে বেঁচে থাকা অনেক শ্রেয়, অনেক গৌরবের।

সংসার পরিচালনা

প্রত্যেক গৃহকর্ত্রীর লক্ষ্য রাখা উচিত কি উপায়ে গৃহের সকল ব্যক্তিকে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য দিয়া সুচারুরূপে সংসার পরিচালনা করা যাইতে পারে। যেমন স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়, তেমনি গৃহের আয়-ব্যয় ও বাজেট ইত্যাদি বিষয়েও গৃহ-কর্ত্রীর অভিজ্ঞতা ও সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আয়ের পরিমিত গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া সকলের প্রয়োজনানুরূপ আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে পারাই সুনিপুণ গৃহকর্ত্রীর লক্ষণ। প্রতিমাসের শেষে সংসারের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া আগামী মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুযায়ী পরবর্ত্তী বাজেট তৈয়ারী করা প্রয়োজন।

প্রথমে লক্ষ্য রাখিতে হইবে জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি, যথা—খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান ইত্যাদি। গুরুত্ব হিসাবে এইগুলিই প্রথম স্থান অধিকার করিবে। সুতরাং সাধ্যমত এই প্রয়োজনগুলি পূর্ণ করিয়া পরে গৃহস্থালির অন্যান্য খরচ ও সঞ্চয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাইতে পারে। সঞ্চয় জীবনের পরম মূলধন। জীবনযাত্রার পথে অনেক বিপদ-আপদে এই সঞ্চয় অমৃতের কার্য্য করে। প্রত্যেক

গৃহস্থেরই সঞ্চয় করা উচিত। কি ধনী, কি গরীব প্রত্যেকেরই সাধ্যমত সঞ্চয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় খরচগুলি বাদ দিয়া কেহ সঞ্চয় করিলে তাহা কৃপণতা করা হয়। অবস্থা এবং সাধ্য অনুযায়ী সঞ্চয় করাই বাঞ্ছনীয়। সংসারে যাহাতে কোন বিষয়ে অযথা খরচ না হয়, সে বিষয়ে গৃহিণীর সতর্ক দৃষ্টি থাকা উচিত। যে সমস্ত জিনিষের ব্যয় সহজেই কমানো যাইতে পারে সে বিষয়ে অনর্থক ব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন। যেমন পুরানো বস্ত্রাদি সামান্য কাটিয়া ছাঁটিয়া বা রিপু করিয়া ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ছোট ছেলেমেয়েদের জামা কাপড়গুলিও অধিক মূল্যে ক্রয় না করিয়া অবসর সময়ে নিজ হস্তে তৈরী করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যিনি সুগৃহিণী তিনি স্বল্প আয় হইতেও কিছু না কিছু উদ্বৃত্ত করিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেন।

বাৎসরিক বা মাসিক খরচের অনুমান হিসাবে বাজেট তৈরী করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে বাঁচিয়া থাকাই এখন প্রধান সমস্যা। উপভোগ করা তো কল্পনা-বিলাস। বাসস্থান অনুযায়ী আবার ব্যয়ের তারতম্য হয়। সাধারণতঃ সহরবাসীদের খরচ গ্রামবাসীদের তুলনায় অনেক বেশী। সৌখীন ধনী পরিবারদিগের বাড়ীভাড়া কিছু অধিক হইয়া থাকে, সেই অনুপাতে বসবাসের খরচও গ্রামবাসীদের খরচ অপেক্ষা অধিক। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে যদি গৃহ দূরে অবস্থিত হয় তাহা হইলে যাতায়াত খরচও অনেক বেশী হইয়া থাকে। পরিবারবর্গের সংখ্যা অনুযায়ী আবার বাজেটের পরিবর্ত্তন হয়। পরিবারের সংখ্যা যদি অধিক হয়, সেই অনুপাতে খাওয়া ও পরিচ্ছদের খরচ অনেক বাড়িয়া যায়। ছোট পরিবারের খরচ অপেক্ষাকৃত কম হইয়া থাকে। প্রত্যেক পরিবারেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার দরুণ ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। অসুখ-বিসুখ ও ঔষধ ইত্যাদিরও খরচ আছে। বাজেট তৈরীর সময় আবার আমোদ-প্রমোদের জন্যও কিছু ব্যয় ধরা উচিত। কারণ দেহের ন্যায় মনেরও খোরাক আবশ্যক। দেহ সুস্থ থাকিলে চলিবে না,

মনকেও সুস্থ রাখিতে হইবে। সেইজন্য মনেরও আবশ্যকমত খোরাক পাওয়া দরকার। তবে যতদূর সম্ভব স্বল্প খরচে এই সকল সারা উচিত। কারণ প্রয়োজনের মাত্রা ছাড়াইয়া যাইলে তাহা অমিতব্যয়িতা ও অপচয়ের রূপ গ্রহণ করে। সুতরাং জীবনের অতি প্রয়োজনীয় অপরিহার্য্য বিষয়গুলি হইতে অর্থসংকোচ না করিয়া বাজেট করিবার সময় কিছু অর্থ ওই বাবদ ধার্য্য করিয়া রাখাই উচিত।

দৈনন্দিন খরচের হিসাব প্রত্যহ নিয়মিত না রাখিলে খরচ নিয়ন্ত্রণ করা খুব দুরূহ হইয়া পড়ে। খাওয়ার খরচ, দুধের হিসাব, পরিচ্ছদাদির ব্যয়, ধোপার হিসাব প্রভৃতি রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র খাতার প্রয়োজন হইয়া থাকে। প্রতিদিন সুবিধামত ঐ সকল খাতায় জিনিষের পরিমাণ বা দৈনিক খরচের হিসাব তারিখ দিয়া তুলিয়া রাখিতে হয়। পরে ঐগুলি জমা-খরচের মোটা খাতায় লিখিয়া রাখিতে হয়। প্রথমে তারিখ দিতে হয়, তারপর দ্রব্যের দাম, পরে জিনিষের পরিমাণ লিখিলে মাসের শেষে হিসাব পরিষ্কার বোঝা যাইবে। আরও একটি জিনিষ লক্ষ্য রাখা উচিত ; কোন্ জিনিষ কতদিন চলিবে এবং কি পরিমাণ প্রয়োজন হইতে পারে। কোন জিনিষ অপচয় হইতেছে কিনা। এই সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে গৃহকর্ত্রীর সজাগ দৃষ্টি রাখা বিশেষ দরকার। কারণ গৃহকর্ত্রী প্রকৃতপক্ষে সংসারের মেরুদণ্ড। গৃহকর্ত্রী যদি সজাগ ও সচল হন, সমস্ত সংসার সুশৃঙ্খল ভাবে চলিবে। আবার তিনি যদি অচল ও পরমুখাপেক্ষী হন তাহা হইলে সংসারে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। সংসারে শ্রী ও সৌন্দর্য্য আনিতে পারাই গৃহিণীর পরম কৃতিত্বের পরিচয়। বুদ্ধি, ধীরতা, দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি কোন বিষয়েই নারী আজ অপরিপূর্ণ নহে। তাই আজ জীবনে চলার পথে নারীর যোগ্য স্থান তারই গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেক নারীর কণ্ঠে আজ যেন এই কথাই ধ্বনিত হইয়া ওঠে—

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার ?"—

সুখের সংসার

কথায় বলে—"ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো", একি শুধুই কবির কল্পনা !!
বাস্তব জীবনে কি সংসারের এই রূপটী হারিয়ে গেছে? আমাদের গৃহ
থেকে কি মিলিয়ে গেছে সেই অম্লান স্নিগ্ধ আলোটী, যার স্পর্শে সকল
আঁধার চলে যায় দূরে, সংসারে বিরাজ করে শান্তি। মানুষ চায় সুখের
সংসার গড়ে তুলতে, স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে ছোট্ট একটী নীড় বাঁধবার
সাধ মানুষের বহু যুগের। কিন্তু বাস্তবের প্রবল তাড়নায় মন হাঁফিয়ে
ওঠে। মনের সুস্থতা ও সৌন্দর্য্যবোধ যায় হারিয়ে বর্ত্তমানের আলোক-
বিহীন পথে। এখন আমাদের ওপরে এসেছে দেশকে গড়ে তোলার
ভার—যদি আমরা নিজেদের সংসারগুলি সুন্দররূপে গড়ে তুলতে পারি
তবে এই ছোট্ট সংসারের সমষ্টি নিয়েই আবার জেগে উঠবে অতীতের
ভারত। এই সংসারকে গড়ে তোলার জন্য চাই সুযোগ্যা গৃহিণী—
আমাদের ভাবীকালের গৃহিণীরা যদি নূতন উদ্দীপনায় সংসারে প্রবেশ
করেন এবং সংসারটীকে এমনভাবে গড়ে তোলেন যা হবে ভবিষ্যতের
সম্পদ, তাহলে আবার দেশ নতুন করে জেগে উঠবে। সংসার পরি-
চালনা করা একটুখানি কথা নয়।

গৃহিণীকে নিজ গৃহের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার
আসন তৈরী করে নিতে হবে। জানতে হবে সংসার-পরিচালনার
প্রকৃত পদ্ধতি ও সন্তান-প্রতিপালনের তথ্যাদি। সংসারে প্রকৃত সুখের
ভিত্তি অর্থের উপর নয়, সুখ হচ্ছে মনে। যার মনে সুখশান্তি নেই
তার সংসার সুখের হয় না। আমি দেখেছি প্রাসাদের অভ্যন্তরে,
ঐশ্বর্য্যের অপর্য্যাপ্ত সমারোহে হাজার বাতির রোশ্‌নাইতেও যে সুখের
আলো জ্বলেনি—দেখেছি দীন দরিদ্রের কুটীর প্রাঙ্গণে, অবহেলিত ঝরা
ফুলের মাঝে, তুলসীতলার মাটির প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে সেই সুখের
ছবি। সারাদিন পরিশ্রমের পরে যখন স্বামী ঘরে ফেরেন, তিনি দেখতে
পান গৃহকর্ম্মরতা তাঁর স্ত্রী মলিন বসনে সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে নিয়ে

তুলসীতলায় দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে তাঁর মধুর হাসি, কেননা এই কুটীরই তাঁর স্বর্গ ; ছেলেমেয়ে তাঁর নন্দন-কাননের ফুল। এদের ঘিরে আছে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি আর গভীর তৃপ্তি। কিন্তু কি সেই পরশ-পাথর যার ছোঁওয়ায় সব কিছু হয়ে ওঠে নির্ম্মল, সুন্দর। প্রতিদিনের কর্ম্মক্লান্ত পথ হয় ক্লান্তিহীন ? এর মূলে আছে সুদক্ষ গৃহিণীর অপূর্ব্ব গৃহিণীপনা। জীবনের সকল ক্লান্তি ও ভুলের ব্যথা ভুলিয়ে দিতে পারেন তিনিই, যিনি সংসারে বিরাজ করেন আপন মহিমায়।

বৃহৎ সংসারের গণ্ডীর মধ্যে কেটেছে যাঁদের প্রথম জীবন, তাঁরাই দেখেছেন অক্লান্ত কর্ম্মদক্ষতা ও নিত্য কাজের ক্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি প্রখর দৃষ্টি, কঠিন শাসন, বিপদে অসীম ধৈর্য্য—আনন্দের দিনে অম্লান স্ফূর্ত্তি। আজকের দিনে যে গৃহিণী সংসার-তরণীর হাল ধরে বসে আছেন —তাঁকে জানতে হবে অনেক কিছু, সইতে হবে তারও বেশী।

সুখের সংসার বলতে যে ছবিটী আমার চোখের সামনে ভেসে আসে তার প্রথমটি হোল গৃহের পরিচ্ছন্নতা, দ্বিতীয়টী নিয়মানুবর্ত্তিতা, তৃতীয় অপচয় নিবারণ। এই তিনটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখলেই সংসারে শৃঙ্খলা আপনিই আসবে। আজ বিশ্বের উপর পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে ঝড়ের মেঘ। বইছে অনিশ্চিত অস্থিরতার ঝোড়ো হাওয়া, যার বেগ আমাদের ছোট সংসারের মাঝেও প্রবেশ করেছে, সব বিপর্য্যস্ত করে দিচ্ছে। তাই যেখানে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা নেই, বিশ্বাস নেই, সন্তানের ওপর স্নেহ-মমতা নেই, সেই সংসার কেমন করে দাঁড়াবে ? সে সংসার কখনও সুখের হতে পারে না। কাজেই সংসারকে সুন্দর করতে হলে—সংসারের মানুষদেরও হতে হবে সুন্দর। শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্ত্তিতা ইত্যাদি বজায় রাখতে হবে। আর সর্ব্বোপরি গৃহিণীকে হতে হবে সুদক্ষ পরিচালিকা। যেমন কারিগরের নৈপুণ্যে সামান্য জিনিষ অসামান্য সুন্দর হয়ে ওঠে, তেমনি সুগৃহিণীর কল্যাণ-স্পর্শে সংসার হয়ে ওঠে পবিত্র, সুন্দর। যে সংসারকে ঘিরে থাকে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা আর পবিত্রতা, সে সংসারে শান্তি ও তৃপ্তি মানুষকে স্বর্গ-সুখ এনে দেয়।

কাপড় কাচা

আজ কালকার দিনে আমাদের প্রত্যেকেরই অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা উচিত নয়। সকল কাজ যদি আমরা নিজেরা করি তাহলে লোকজনের সমস্যা কিছুটা লাঘব হতে পারে। সামান্য একটু পরিশ্রম করলেই যদি পারা যায়, তাহলে কোরে দেখতে দোষ কি? এই ধরুন "কাপড় কাচা" এমন কিছু অসাধ্য কাজ তো নয়। কাজেই প্রথমে দুচারটী কাপড় কেচে দেখা যেতে পারে। আমি কাপড় কাচবার সহজ প্রণালী নিচে দিলাম। পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

প্রথমে পরিষ্কার গরম জলে কিছুক্ষণ কাপড়গুলি ভিজিয়ে রেখে দিতে হয়। তারপর ময়লাগুলি কেটে যাবার পরে অপর একটী পাত্রে সোডা ও সাবান কেটে দিতে হবে। এই জলটী খুব বেশী গরম হবে না। এক গ্যালন জলে সাধারণতঃ আধ আউন্স সাবানের প্রয়োজন হয়। সাবানের কুচি ও সোডা সম্পূর্ণ গ'লে যাবার পরে ভিজান কাপড়গুলি নিংড়ে নিয়ে ওই সাবানজলের মধ্যে ছেড়ে দিন। বেশ কোরে কচলে নিয়ে দেখুন। যদি কোন যায়গায় দাগ থাকে তাহলে উপর থেকে একটু সাবান লাগিয়ে নিতে হবে, পরে ওই কাপড়গুলি একটী পুরু কাঠের তক্তার উপর থুপে কাচতে হবে। মাঝে মাঝে গরম জলের ছিটে দেবেন, কারণ তাহলে ময়লা বেশ সহজেই কেটে যাবে। এর পরে অন্য আর একটী পাত্রে জলের সঙ্গে সাবান দিয়ে ১০ থেকে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত ফুটিয়ে নিতে হবে। প্রয়োজন হলে সোডাও দিতে হবে, এর পরিমাণ কোয়ার্টার আউন্স হবে। বেশী সোডা দিলে কাপড়ের জমি খারাপ হয়ে যেতে পারে। কাপড়ে নীল দিতে হয়, তাহলে কাপড় বেশ পরিষ্কার দেখায়। নীলের টুক্‌রোটী একটু কড়া ফ্ল্যানেলেতে বেঁধে ঠাণ্ডা জলে আস্তে রগড়াতে হবে। ফ্ল্যানেল দেবার উদ্দেশ্য যে, নীলের বড় দানাগুলি বাহিরে যাতে আসতে না পারে। গামলার জলটী প্রয়োজনানুযায়ী নীল হলে ওর মধ্যে ধোওয়া

নিংড়ানো কাপড়গুলি খুলে এক এক করে ডুবিয়ে দিন। গামলায় জল বেশী দিতে হবে, যাতে কাপড়গুলি ভাসতে পারে। তা না হলে রং সব জায়গায় সমান হবে না। কোন জায়গায় বেশী নীল হয়ে গেলে, সেই জায়গাটি সামান্য ১ চামচ ভিনিগার-মেশানো জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। নীল রং উঠে যাবে তাহলে। এই বারে এই কাপড়-গুলি কলপের জলে ডুবিয়ে আধ শুকনো করে নিয়ে ইস্ত্রি করে নিতে হবে। কলপ প্রস্তুত করতে গেলে, ভাতের মাড়, বা বার্লি, কিম্বা খই সিদ্ধ করে (লেই) তৈরী করে নিতে হয়। বড় বড় দোকানে ষ্টার্চ কিনতে পাওয়া যায়। কাঁচাজল বা গরমজলে ষ্টার্চ ব্যবহার করা যেতে পারে। সামান্য ঠাণ্ডা জলে গুলে নিয়ে কিছু বোরাক্স মিশিয়ে কিছুক্ষণ নাড়তে হবে। তখন দেখা যাবে ওই জিনিষটি ছাই রং হয়ে এসেছে বা অনেকটা বার্লির মত হবে বা ভাতের মাড়ের মত হবে। এটী গরম জল দিয়ে করতে হবে। এইবার নীল-দেওয়া কাপড়গুলি এই জলে ডুবিয়ে নিয়ে, আধ শুকানোর পর অল্প জলের ছিটে দিয়ে ইস্ত্রি করে নিতে হবে। এইভাবে কাপড়গুলি বাড়িতে কাচিয়ে নিলে অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প খরচে সুন্দরভাবে কাচা যেতে পারে। একবার পরীক্ষা করে দেখবেন। সিল্ক সাড়ীর রং করা বা ধোবার নিয়মাবলী পরে জানাবার ইচ্ছা রইলো।

৭ই পৌষ

৭ই পৌষের মেলা দেখবার জন্য এখান থেকে শান্তিনিকেতনে রওনা হলাম। ভোরের ট্রেনে এখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বোলপুর ষ্টেশনে প্রায় ১২টা নাগাদ পৌঁছলাম। নেমেই দেখি উত্তরায়ণ থেকে মোটর এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে। আমরা সেই গাড়ীতে উঠে পড়লাম। সঙ্গে বিশেষ কিছু ছিলো না, শুধু সুটকেস ছিলো। বাকি জিনিষগুলি ও আমার বেয়ারাটী বিশ্বভারতীর বাসে কোরে এসে

পৌঁছালো। কলকাতার বাইরে এসে চোখ জুড়িয়ে গেলো। এখানে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে। চারিদিক বেশ ফাঁকা, এখানে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ নয়। বাড়ীর পর বাড়ী সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে দৃষ্টিপথে বাধা সৃষ্টি করে না। আমাদের গাড়ী শান্তিনিকেতনের দিকে চলতে লাগলো। বাজারের মধ্যে দিয়ে চল্লাম। রাঙ্গামাটীর অসমান পথের উপর দিয়ে রাঙ্গা ধূলি উড়িয়ে গাড়ী ছুটলো। গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেখলাম, আমাদের আত্মীয়েরা সকলেই অপেক্ষা করছেন। তাঁদের সঙ্গে একটু কথা বলে বাড়ীটী ঘুরে দেখলাম। বেশ সুন্দর বাড়ী। চারিদিক বেশ ফাঁকা, পিছনে লেক আছে। তিনখানি ঘর নিচে, ওপরে একখানি বড় ঘর। সামনে কামিনী ফুলের গাছ, তার চারিধারে করবী গাছগুলি ডালপালা মেলে ঘিরে রেখেছে। তারি মধ্যে দু-চারটী ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা বেশ একটী দল ছিলাম। খাওয়া দাওয়া সেরে সন্ধ্যার সময় প্রতিমা দেবীর কাছে গেলাম। তিনি আমাদের দেখে খুসী হলেন। অন্য আত্মীয়েরাও ছিলেন। বেশ জমিয়ে খানিকটা গল্প ও হাসি হোলো। তার পরে বাড়ী এসে খানিকটা হৈচৈ করে কেটে গেলো। সেদিন তো সকাল করে শুয়ে পড়লাম। খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেলো। উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালাম, বেশ লাগছিলো। দেখলাম দূর থেকে গরুর গাড়ী বোঝাই করে বহু জিনিষ পত্র মেলার জন্য আসছে। গরুর গাড়ীর চাকার ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দটীও বেশ লাগে। সবই যেন বেশ নতুন। তার পরে সারি সারি ট্রিপে বাস্, মোটার, লরীর নানা রকমের আওয়াজ রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত কানে এসে পৌঁছেছিল। এই সব গাড়ী মেলার জন্য যাত্রী এবং মালে ভর্ত্তি ছিলো। বেশীর ভাগ শিউড়ি থেকেই আস্‌ছিলো। উত্তরায়ণের সামনের মাঠে দেখি অনেক দোকান বাঁধা হচ্ছে। বেশীর ভাগ খাবারের দোকান বসেছে। ভিয়েন আরম্ভ হয়ে গেছে। গ্রামের যত ছোট ছেলেমেয়েদের ভীড় সেখানে জমেছে। কাপড়ের দোকান, মহিলা সমিতির হাতের কাজ।

বিশ্বভারতীর বইয়ের দোকান। শ্রীনিকেতনের জিনিষপত্রও অনেক কিছু ছিল। তা ছাড়া আমার সব থেকে ভালো লেগেছিলো গ্রামের মেয়েদের হাতের কাজগুলি—ডিজাইন এবং রং। অবশ্য প্রতিমা দেবীই সেগুলি দিয়েছিলেন। আমি কয়েকটী নিয়েছি, লোভ সামলাতে পারলাম না। কাজগুলি বেশ নূতন ধরণের। মহিলা সমিতির ষ্টলে আমাদের বাড়ীর মেয়েদেরও অনেক হাতের কাজ ছিলো। নাগর দোলাতে ওঠবার আগ্রহ ছেলেদের চাইতেও বড়দের বেশী দেখলাম। সেখানে অসম্ভব ভীড়। সেখান থেকে সরে এলাম। এধারে আমোদ-প্রমোদেরও যথেষ্ট আয়োজন করা হয়েছিল। কবির লড়াই, যাত্রা, সার্কাস, সাঁওতালি নাচ ইত্যাদি অনেক কিছুই ছিলো। চমৎকার বাজী পোড়ানো হোলো। সাঁওতালি রূপোর গহনাও বেশ কয়েকটী ছিলো।

উত্তরায়ণের কমপাউণ্ডের ভেতরও বেশ একটু সাড়া পড়ে গিয়েছিলো। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং ডাঃ কাটজু এসে-ছিলেন। তাঁদের সঙ্গের লোকজনদের থাকবার জন্য ৫।৬টী তাঁবু পড়েছিলো। ওপরে মিসেস নাইডুর জন্য ঘর গোছানো হয়েছিলো দেখে এলাম। রাত্রে ডিনারের সময় মিসেস সরোজিনী নাইডু একাই জমিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর কথা বলার অদ্ভুত ক্ষমতা। বেশ লাগছিল তাঁর গল্প শুন্‌তে। সেদিন অবশ্য একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন—জয়পুর থেকে আরও দু-এক জায়গায় গিয়েছিলেন বল্লেন। কনভোকেশানেও ওঁর বক্তৃতা সকলেই উপলব্ধি করেছিলেন। যাই হোক এবার আমরা বেশ আনন্দে ছিলাম কয়টা দিন। এর মধ্যে একদিন শ্রীনিকেতনে ঘুরে এলাম, রথীন্দ্রনাথ তাঁর হাতের কয়েকটী কাজ দেখালেন। এত চমৎকার কাঠের জিনিষগুলি করেছেন, দেখলে মনে হয় পাকা মিস্ত্রিও এত চমৎকার জিনিষ করতে পারে না। একটী পাউডার কেস করেছেন, ছোট একখানি কুঁড়ে ঘরের ডিজাইন, তার চালটা উঠিয়ে নিলে ভেতরে পাউডার রাখবার জায়গা। প্রতিটি জিনিষের মধ্যেই বেশ

সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। গুহাঘরের মধ্যে তাঁর ষ্টুডিয়োটী ভারী সুন্দর। সামনের ফুলের বাগানে যেটা দেখি সবই ভালো লাগে। রাঙা গোলাপগুলি বাগান আলো করে রেখেছে। সব থেকে ভালো লাগে, এখানে বাহুল্যের আড়ম্বর নেই। সব জিনিষের ভেতরই শিল্পকলার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। আমার শরীর একটু খারাপ হোলো বোলে আর বেশীদিন থাক্‌লাম না। মেলা ভেঙ্গে যাবার সঙ্গে আমাদের দলও ভেঙ্গে গেলো। ফিরে এলাম আবার সেই চিরন্তনী জীবন-যাত্রার সীমানার মধ্যে।

পরনির্ভরতা

এ ক্ষেত্রে পরনির্ভরতা বলতে আমরা এই বুঝি যে—আমাদের কর্ত্তব্যের সীমারেখার মধ্যে কোন কাজ করবার জন্য পরের উপর নির্ভর করা। কারণ কতকগুলি ক্ষেত্রে আমাদের পরের উপর নির্ভর করতেই হবে। আজকাল সমাজ এত জটিল হয়ে পড়েছে যে—একজনের পক্ষে সমস্ত কাজ করা সম্ভব নয়। যেমন—যে ডাক্তারি করে তার পক্ষে জমিচাষ করে নিজের প্রাত্যহিক অন্ন জোগাড় করা সম্ভব নয়, এই ব্যাপারে চাষির ওপরে তাকে নির্ভর করতেই হবে। সুতরাং পরনির্ভরতা ভাল নয় বলতে এই বুঝি যে,—আমাদের নিজের যতটুকু কর্ত্তব্য আছে, ব্যক্তিগত ভাবেই হোক্ বা সামাজিক কর্ম্মক্ষেত্রের ব্যাপারেই হোক্, সেই কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য আমরা পরমুখাপেক্ষী হবো না।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমে ইংলণ্ডে গিয়ে ইংরাজ জাতির একটী মহৎ গুণের কথা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, "ইংলণ্ডে এসে ইংরাজ জাতির আত্মনির্ভরতা দেখলে অবাক হতে হয়। প্রত্যেক ইংরাজ মনে করে যে, সে যখন ইংরাজ, তখন এমন কোন দুঃসাধ্য কাজ নেই যা সে করতে পারবে না। এই বিশ্বাসের বলে তাদের অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জেগে ওঠে।"

যুগে যুগে স্বাবলম্বী ও স্বপ্রতিষ্ঠ মহাপুরুষেরাই নেতৃত্ব লাভ করেছেন। আপনার সাধনার দ্বারা যিনি "সত্য"-কে না পেয়েছেন, তিনি জগৎকে কি দান করবেন? গৌরব অর্জ্জন করতে গেলে স্বাবলম্বন চাই। ছোট থেকেই আত্মনির্ভরতা অভ্যাস করতে হয়। আত্ম-নির্ভরতার বলে আত্মশক্তিকে জাগাতে পারা যায়। যে মানুষ আপনাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে সে সকলের গৌরবের বস্তু। স্বাবলম্বী হতে গেলে নিজেকে বড় করে দেখতে হবে এবং সত্যের পথে আপনাকে পরিচালিত করতে হবে, নিজের শক্তি এবং বিশ্বাসকে পবিত্র করে তুলতে হবে। যদি সমাজের প্রচলিত ধারণা তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তখন শুধু নিজেকে মেনেই চলতে হবে। ভাবতে হবে—আমি যে কাজ করে যাবো তা শুধু আমার অন্তরের দেবতার জন্য, অন্যের মতামতের জন্য নয়। আমার প্রকৃত বিশ্বাসটী যদি প্রতিমুহূর্তে অন্যের মতামত অনুযায়ী পরিবর্ত্তন করতে হয় তবে আমার ব্যক্তিত্ব থাকে না। আমার ব্যক্তিত্ব যখন পূর্ণমাত্রায় গঠিত হয়ে উঠবে তখন বিরুদ্ধ-বাদী সমাজও আমার অনুসরণ করবে। আমাদের বুদ্ধি এবং বিবেকের সাহায্যে জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করতে হবে। পরনির্ভরতার মত দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।

এজগতে দুর্ব্বলের স্থান নেই। জগতের এই বিপর্য্যয়ের মাঝে হাল ছাড়লে চলবে না। ভারতবর্ষকে যে আঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে তা বড়ই মর্ম্মান্তিক। আজকের দিনে আর আমাদের পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে না। স্বাধীন ভারতের উপযুক্ত করে আমাদের নিজেদের গড়তে হবে। কখন কি বিপদ আসে বলা যায় না। আপনার শক্তির উপর বিশ্বাস রেখে শত বিপদের মধ্যেও এগিয়ে যেতে হবে। ছোট বড় সকল কাজেই আত্মনির্ভরতার পরিচয় দিতে হবে। বিদেশী মেয়েদের আত্মনির্ভরতা ও সামর্থ্য আছে বলেই তাঁরা ঘরকন্নার খুঁটিনাটী কাজ থেকে অফিসের বড় বড় কাজগুলি পর্য্যন্ত সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন। এর জন্য অন্যের

সাহায্যের দরকার হয় না। নিজের সম্মান বাঁচিয়ে চলাফেরা করবার মত নির্ভীকতাও তাঁদের যথেষ্ট আছে। আমাদেরও সকল সঙ্কোচ পরিত্যাগ করে এগিয়ে আসতে হবে। এদেশের মেয়েরাও আত্মনির্ভরতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়ে গেছেন। যেমন রাণীভবানীর কথাই ধরা যাক—তাঁর একমাত্র বিধবা কন্যা তারাসুন্দরীর রূপের খ্যাতি শুনে নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁকে আনবার জন্য দূত পাঠান। এর ফলে যুদ্ধ বেধে যায়। রাণী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে সৈন্য পরিচালনা করেন। নবাব-সৈন্য তাদের সঙ্গে পেরে উঠলো না,—পলায়ন করে প্রাণ বাঁচালো। তিনি নারী হয়েও তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেছেন।

রাণী দুর্গাবতী, পদ্মিনী ইত্যাদি মহীয়সী মহিলারা তাঁদের নির্ভীকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। আজও তাঁদের স্মরণ করে আমরা গর্ব্ব করে থাকি। এ তো গেলো বাইরের কথা। বাড়ীর ভেতরেও মেয়েদের আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। নিরাশায় ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। সহ্যের অসীম শক্তি না থাকলে আমাদের কোন্ অতলে তলিয়ে যেতে হবে। নিজের শৌর্য্যের দ্বারাই দুঃখকে জয় করে নিতে হবে, বিপদের সময় আত্মনির্ভরতা হারালে চলবে না। দুঃখের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। এই তো জীবনের ধারা। দুঃখের রুদ্র মূর্তি দেখে ভয় করলে তো চলবে না। বিপদের সময়তেই শুধু 'ভগবান আমায় রক্ষা করুন' এই বলে হাহাকার করলে হবে না।

"বিপদে মোরে রক্ষা করো,
এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়,
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে
নাইবা দিলে সান্ত্বনা
তরিতে পারি শক্তি যেন রয়॥

ভগবান কৃপা করে আমাদের শোকে দুঃখে সান্ত্বনা দেবেন এবং

বিপদে রক্ষা করবেন—এ প্রার্থনা আমি করি না। শুধু এইটুকু তাঁকে জানাই যে, আমাদের দেহে এবং মনে এতখানি শক্তি জেগে উঠুক যে—আমরা সকল বিপদকে অতিক্রম করে যেতে পারি। মানুষ আপনার মধ্যে শক্তিকে জাগিয়ে তুলবে।

অপরের সাহায্য নিয়ে নিজের গৌরব ক্ষুণ্ণ করবে না, কারো সাহায্যের প্রত্যাশা করবে না; তবেই মানুষ একদিন সত্যিকারের মানুষ হবে। ভগবান যে মুহূর্ত্তে দুঃখ সৃষ্টি করেছেন, তার সঙ্গে তা জয় করবার শক্তিও দিয়েছেন। জয় করবার শক্তি আমাদের হাতেই আছে। মনের শক্তি না থাকলে আমরা দুঃখ, কষ্ট, নৈরাশ্যকে জয় করতে পারবো না। রাগ অভিমান আমাদের হৃদয়ের দৃঢ়তার বাঁধ ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করে; এর বিরুদ্ধে আমাদের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে হবে। প্রত্যেক মানুষেরই স্বাবলম্বী হওয়া দরকার। অনেক ক্ষেত্রে সংসারে আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেলে, অনেক অসহায়া নারীর পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। সেই সব ক্ষেত্রে ঘরে বসেই অনেক কাজ করা যায়। যেমন—ছোট ছেলে-মেয়েদের জামা, ব্লাউজ ইত্যাদি অনেক কিছু দরকারি জিনিষ ঘরে বসে তৈরি করে লোকের দ্বারা বিক্রি করা যায়। Mrs. E. Wood কত সুন্দর ফ্রক ইত্যাদি তৈরী করে হকারের মারফত বাড়ীতে পাঠান। সেইভাবে আমাদের মেয়েরাও তাঁদের নিজেদের বুদ্ধির দ্বারা অনেক ভাল জিনিষ ঘরে বসেই বিক্রী করে অর্থ উপার্জ্জন করতে পারেন। এ ছাড়া দেশী মিষ্টি, চাট্‌নী, জ্যাম, আমসত্ত্ব ইত্যাদিও বেশ ভালভাবে তৈরী করে পরিষ্কার বাক্সের মধ্যে সাজিয়ে বিক্রি করতে পারেন। অবশ্য খাবার জিনিষগুলি যেন বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। যাঁদের সুবিধা আছে তাঁরা বাড়ীতেই স্কুল করে পাড়ার মেয়েদের পড়াতে পারেন। এছাড়া হাতের কাজ, গান, বাজনা, সুতাকাটা ইত্যাদি শেখাতে পারেন। এমন অনেক মেয়ে আছেন যাঁরা দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্প বয়সে স্বামীকে হারিয়েছেন, তাঁদের আত্মীয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা

ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। মিথ্যা আভিজাত্যের অহঙ্কারবশতঃ বাইরে বেরুতে পারেন না। তাঁদের সম্বন্ধে এইটুকু বলতে চাই যে—ঘরে বসেও অনেককিছু কাজ করে অর্থ উপার্জ্জন করতে পারেন। এ তো গেলো আর্থিক ব্যাপার। সাংসারিক ব্যাপারেও আত্মনির্ভরতার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। একদিন ঝি বা চাকর না এলে একেবারে অধীর না হয়ে যদি নিজে সেই কাজগুলি করে নেওয়া যায়, তাহলে তারাও বুঝতে পারবে যে আমরা ঝি-চাকরের হাতের মধ্যে নেই। আমাদের সকল কাজই করবার মত শক্তি আছে। জগতে মানুষ যত কিছু গৌরব অর্জ্জন করেছে সমস্তই কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে। পরিশ্রমী মানুষেরা নিজেকে শ্রদ্ধা করতে জানে। যে আপনাকে শ্রদ্ধা করতে জানে না, সে অপরের শ্রদ্ধা পায় না। পরিশ্রম করবার শক্তিকেই ঈশ্বরের দান বলে মনে করি। বর্ত্তমান যুগে জীবন যাত্রার পথ বড়ই কঠিন হয়ে পড়েছে। আমাদের উপর যে গুরুদায়িত্ব আছে সে দায়িত্ব আমাদের সম্পন্ন করতে হবে আমাদের শক্তি ও পরিশ্রমের দ্বারা। চারিদিকে ভীষণ প্রতিযোগিতা চল্‌ছে। এর বিরাম নেই। যে মানুষ সহ্য করতে পারছে সেই বেঁচে আছে। আশা করি শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে আমাদের দায়িত্বজ্ঞান আরো বেড়ে যাবে। সকল স্বাধীন দেশের মানুষের মত আমরাও স্বাবলম্বী হয়ে উঠবো।

স্বাবলম্বী মানুষেরা জাতির গৌরব। তাঁরা সকল বিপদ তুচ্ছ করে মনুষ্যশক্তির বিকাশসাধন করেন, সুতরাং স্বাবলম্বন মনুষ্যত্বের প্রথম সোপান এবং ভিত্তি।

ভাঙ্গন

সহরের বুকে প্রকাণ্ড বাড়ী। শাখাবহুল বৃদ্ধ মহীরুহের মত কালো আঁধার বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীরবে। প্রকাণ্ড থামগুলোর চূণ বালি খসে পড়েছে, সুবৃহৎ খড়্‌খড়িগুলোয় ভাঙ্গন ধরেছে— ভগ্নাংশে

বিভিন্ন রেখাপাতে অতীতের অনেক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

দক্ষিণের লম্বা বারান্দায় আজও অকেজো চেয়ার টেবিলগুলো ধূলি-ধূসরিত অবস্থায় পড়ে আছে— অতীতের গৌরব বুকে নিয়ে। যে নাচঘর সুন্দরী নর্ত্তকীদের নূপুরের ঝঙ্কারে মুখরিত হয়ে থাকতো, সহস্র বাতির আলোতে যে ঘর উঠতো ঝল্‌মলিয়ে সে ঘরে আজ বাসা বেঁধেছে রাত্রি-জাগা পাখির দল। সারি সারি দেওয়ালে টাঙ্গানো পূর্ব্বপুরুষদের প্রতিকৃতি আজ আর চেনাও যায় না। সব কিছুই মুছে গেছে ধূলার আবরণে। প্রকাণ্ড পূজার দালান, কত যুগ থেকে মহাসমারোহে দোল দুর্গোৎসব পূজা চণ্ডীপাঠ হয়ে গেছে ; সে সব রোশনাই আজ কোথায় ? সেও আজ মিলিয়ে গেছে অতীতের অন্তরালে—। দালানের একটি কোণায় একটি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে বৃদ্ধ শুভ্রশ্মশ্রু দরোয়ান আজও সুর ক'রে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে আপনার মনে। তার কাঁপা কণ্ঠের ক্ষীণ শব্দটুকুও ক্রমে মিলিয়ে আসে। যখন আসে গভীর রাত্রি নিকষ কালো আঁধারের মধ্যে দিয়ে, চুপে চুপে পা ফেলে, তখন এই রহস্যঘন আঁধারের মধ্যে জেগে ওঠে অতীতের ঐতিহ্য। বৃদ্ধের ক্ষীণ কণ্ঠের গান থেমে যায় সেই নিস্তব্ধ নিশীথে। রাত্রিজাগা পাখিরা ডানা ঝট্‌পট্ করে, মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। পায়রা-দম্পতী থামের মাথায় বাসা বেঁধেছে। মাঝে মাঝে ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে তারা ডেকে ওঠে। পাশা-পাশি বসে থাকে দুজনে— সেই আঁধারের রাজ্যে। বৃদ্ধ দ্বারবান চারপাইটি উঠানে নামিয়ে লাঠিটা পাশে রেখে বসে থাকে, কোন্ অজানার উদ্দেশ্যে জানায় গভীর শ্রদ্ধা, চোখে জল আসে ; জামার এক প্রান্ত দিয়ে চোখ মোছে সে। সে প্রহরী, চিরদিনই একইভাবে চলেছে তার জীবন,— কোন পরিবর্ত্তন নেই, কোথায় এর শেষ তাও জানে না। মাথা মাটির দিকে আনত করে বসে আছে— যেমন থাকতো পুরানো কর্ত্তাবাবুর সময়ে— সে তো বহুযুগ হয়ে গেছে— সেদিনের কথা তো আজ "ইতিহাস"।

এই বাড়ীতেই ওই দক্ষিণের বারান্দায় বসে থাকতেন সৌম্যমূর্ত্তি

কর্ত্তাবাবু— রাজার মতই ছিল তাঁর টক্‌টকে চেহারা। নিষ্ঠাবান অভিজাত বংশের ধনীর সন্তান ছিলেন তিনি।

লোকজন আত্মীয়-স্বজনে বাড়ি পরিপূর্ণ হ'য়ে থাকতো। নানা দেশ থেকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা আসতেন। স্তোত্র পাঠ, সংস্কৃত কাব্য আলোচনা ও আবৃত্তি যখন চলতো, তখন এক অদ্ভুত পরিবেশ গ'ড়ে উঠতো। কর্ত্তাবাবুর গভীর নিষ্ঠা এবং আভিজাত্য, তাঁদের গর্ব্বিত মস্তক উন্নত করে রেখেছিল। কিন্তু এও তো ইতিহাস— আমাদের গল্প তো ইতিহাস— আমাদের গল্প তো বর্ত্তমানকে নিয়ে। তারপর? সবাই একে একে চ'লে গেলো— সগৌরবে এগিয়ে এলো বর্ত্তমান, অবরোধ গেল ভেঙ্গে! আভিজাত্য-বোধের হোলো মৃত্যু।

* * * *

সেদিন গভীর নিঝুম রাত্রে হঠাৎ এলোমেলো বাতাস শুরু হোলো, ক্রমে ক্রমে সেই উদ্দাম বাতাসের গতি বেড়ে যায়। থর থর করে কেঁপে ওঠে চারিদিক। সেই ঝড়ের দোলায় কম্পিত হতে লাগলো মস্ত-বড় বাড়িটাও। মনে হোল বুঝি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এই নিমেষে। বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শোনা যায় সেই জীর্ণ প্রাসাদের প্রতিটি রন্ধ্রে। বিরাট গর্জ্জনে সারা রাত্রি চ'ললো ঝড়ের দাপট। ঝন্ ঝন্ করে দরজা-জানালাগুলো আছড়ে প'ড়লো! সব বুঝি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়!

শূন্য ঘরের জীর্ণ খড়খড়িগুলো থেকে থেকে আর্ত্তনাদ করে ওঠে। গাছের ভীরু পাতাগুলোও থর্ থর্ করে কাঁপে সেই মহাকালের তাণ্ডবনৃত্যের প্রচণ্ড ঝঙ্কারে। প্রকৃতির উদ্দাম স্রোত বাধা দেবে কে?

সে এলো—!! অন্ধকার বিদীর্ণ করে মৌনতাকে ছিন্নভিন্ন করে সে ডাক এসে পৌঁছালো এতদিনে। সমাপ্তির পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলো। চারিদিক অন্ধকার, সহসা কানে এলো একটা বিকট শব্দ। ছাদের ওপরে একটা পেঁচা উঠলো ডেকে চ্যা……অ্যা……পায়রাগুলো ঝট্‌পট্ করে ওঠে। ঝড় থেমে গেলে কিসের আর্ত্তনাদ শোনা যায়—!!

তারপর সব নিস্তব্ধ; ওপরে নক্ষত্রবিহীন অন্ধকার আকাশ! নীচে ধ্বংসের স্তূপ।

* * * *

আকাশে দেখা দিয়েছে প্রভাতের নূতন সূর্য্য, পূর্ব্ব দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে তার রক্তিম আভা। পুরাতনের সব কিছুই গেছে শেষ হয়ে, জীর্ণ অট্টালিকার ভগ্নস্তূপের মধ্যে সেই পুরাতন ভৃত্যের হয়েছে সমাধি। বৃদ্ধের শিয়রের কাছে তখনও পড়ে আছে নাচ-দরজার প্রকাণ্ড চাবি ও জীর্ণ রামায়ণ বইখানা। যেখানে মৃত্যুর নীরবতা চারিধারে এনেছে স্তব্ধতা—সেই উঠানের অপর প্রান্তেই জেগে উঠেছে নবীন জীবনের প্রচণ্ড কলরব।

প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে চলেছে লুকোচুরি খেলা, এই ভাঙ্গনের মধ্যে দিয়েই হয়তো আবার গড়ে উঠবে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, কিন্তু এও তো কল্পনা !!

কাঠের কাজ

সৃষ্টিকর্তা গাছে দিলেন কাঠ—আর মানুষের বুদ্ধি আবিষ্কার করলে কুঠার, এই দুইয়ের সংঘাতে সৃষ্টি হোল কাঠের নবরূপ। আদিম কাল থেকেই মানুষ ব্যবহার করে এসেছে কাঠকে আপনার ব্যবহারের সামগ্রী হিসাবে। মানুষের রুচির ক্রমবিকাশের সঙ্গে কাঠের জিনিষে জেগে উঠেছে তার সুরুচির নিদর্শন। শিশুর খেলনায়, রাজার রাজপ্রাসাদ থেকে যুদ্ধ-জাহাজের মধ্যেও পাই অপূর্ব দারুশিল্পের পরিচয়। বৌদ্ধ-যুগের প্রাসাদ, বিহার ও ভবনের মধ্যে খুঁজে পাই দারুশিল্পীর যাদুময় স্পর্শ। এই ভারতের অদ্ভুতকর্মা শিল্পীদের প্রেরণা ও শিক্ষার মোহিনী স্পর্শ লাগে সুদূর বর্মা, যবদ্বীপ, সিংহল, ইন্দোচীন, চীন, নেপাল ও ভূটানের কারিগরদের হাতুড়ি-বাটালির গায়ে। তারই শত শত নিদর্শন আজও দেখতে পাই এই সব দেশের দৈনন্দিন ব্যবহারিক

আসবাবপত্র ও স্থাপত্যের কলা-কৌশলে। ভারতের কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকার প্রান্ত পর্যন্ত ভারতীয় দারুশিল্পীর সৌন্দর্যবোধের বিচার আজও পাই শত শত আকারে ও বিভিন্ন প্রকারে। কাশ্মীরের কারু-কার্যখচিত আসবাব, বাক্স, পেটিকা, ফুলদানি, বাতিদান জগদ্বিখ্যাত। নগণ্য পল্লী, সাধারণ গ্রাম, ছোট শহর চিরকালই যোগান দিয়েছে এই সকল শিল্পসম্ভার। স্বল্প-পরিচিত বা অপরিচিত শিল্পীরাই হোল এ সকলের নির্মাণকর্তা।

বাঙ্গলার জলহাওয়া মানুষের জীবনযাত্রায় দিয়েছে দারুশিল্পকে একটি নিজস্ব রূপ। শিশুদের খেলনায়, স্ত্রীলোকের কারুকার্যময় প্রসাধন সামগ্রীতে, গৃহের পাটাতনে, স্তম্ভে, নৌকার গায়ে, দরজায়, বাতায়নে, কাঠের পাদুকায়, নিত্য ব্যবহারের শত শত বস্তুতে। দাক্ষিণাত্যে এই শিল্প উৎকর্ষতা লাভ করেছে চন্দন কাঠের খোদাই কাজে ও নারিকেল মালার নানা ব্যবহারিক জিনিষের গায়ে।

আজ সিমেণ্ট, ইট ও লোহার যুগে আমরা হারাতে বসেছি বহু-যুগের অর্জিত কাঠ-খোদাইয়ের নিপুণতাকে। এই সহজলভ্য অতি সুন্দর শিল্পকে এখনও পুনর্জীবিত করা যায়, যদি আমরা সেদিকে দৃষ্টি দিই। আজ দিকে দিকে হাহাকার, বেকার-সমস্যা, পল্লীবাসী নিরন্ন—সহজ-জাত শিল্পের চাহিদা অতি সামান্য। যদি আজ সাহায্য দানের দ্বারা আবার সেই সকল পণ্যসম্ভারের চাহিদা বাড়াতে পারা যায়, যদি নির্বাণোন্মুখ কলা-প্রদীপকে প্রজ্জ্বলিত করা যায়, তাহলে শুধুই যে হাজার হাজার শিল্পী-পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হয় তা নয়, উপরন্তু আমরাও, যারা এই পাঁচমিশালী আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে প্রকৃত সৌন্দর্যবোধের পরম আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছি, আমাদেরও জীবনে দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীর মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্যের ছাপকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে ধন্য হতে পারি। ভারতের স্বার্থের জন্যই আজ আমরা চাই দেশীয় শিল্পকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে।

ভারতবর্ষের মধ্যে এই শিল্প উৎকর্ষতা লাভ করেছে। কাশ্মীর

এবং মাদ্রাজে বহুকাল থেকেই এক বিশেষ ধরণের কাজ চলে আসছে। মহীশূরের চন্দনকাঠের খোদাই কাজের মধ্যে লতাপাতা ও জন্তু-জানোয়ারের নক্সাই বেশি দেখা যায়। প্রাচীন মন্দিরের অনুকৃতিরও আভাস পাই। আমাদের বাঙ্গলাদেশের মূলে আছে ধর্ম, শিল্পধারার মধ্যেও সেই ভাব ফোটাবার চেষ্টা দেখা যায়। মঙ্গল-ঘট, শঙ্খ, পদ্ম, মাছ, ধানের শিষ প্রভৃতির নক্সাগুলি এদেশে ধর্মের প্রতীক হিসাবে প্রচার ও ব্যবহার করা হয়েছে। আশা করা যায়, এই সকল লুপ্ত শিল্পই আবার নূতন রূপে আবির্ভাব হবে। কাঠের ওপর গালার কাজ ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন কাজ। বিহার, বীরভূম ও আসামে এর প্রচলন আছে। কাশ্মীরের কাঠের কাজ বিশ্ববিখ্যাত। প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকেই এরা শিল্পের পরিকল্পনা পায়। ফুল, পাতা, পাখীর যে ছন্দরেখা আছে, তার দ্বারাই শিল্পের পরিকল্পনা করে নেয়। এ ছাড়াও মনের উচ্ছ্বাসকে অবলম্বন করে নানারূপ পরিকল্পনা করে। আঙ্গুরপাতা ও পদ্মের নক্সাই বেশি দেখা যায়। এ ছাড়াও এক প্রকার ছোট্ট ফুলের নক্সা দেখা যায়—এ কাজগুলি খুব সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। রূপার জিনিষের মধ্যেও এই নক্সাটির বহু প্রচলন আছে। কাশ্মীরের কাঠের কাজে পালিশ থাকে না, কিন্তু বিনা পালিশেই এই শিল্পের প্রকৃত সৌন্দর্য পরিদর্শিত হয়। মহীশূরের চন্দনকাঠের কাজেও পালিশ থাকে না। ঐ দেশে চন্দনকাঠের ওপর হাতির দাঁতের কাজেরও বহু নিদর্শন মেলে। হায়দ্রাবাদে এক প্রকার চেয়ার, সোফা তৈরি হয়—এর মধ্যেও যথেষ্ট শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায়। রঙিন গালার পালিশের ওপরে খুব সূক্ষ্ম কাজ হয়।

ব্রহ্মদেশের কাঠের কাজের পরিকল্পনার সঙ্গে চীনদেশীয় কাজের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ড্রাগন এবং অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের নক্সার মধ্যেও বিশেষত্ব দেখি। আমাদের দেশে পল্লী-গঠনের মধ্যেও দেখা যায় প্রাচীন শিল্পীরা তাদের শিল্পী-পল্লাতে, সহরে, গ্রামে নানা প্রকার বস্তুসম্ভার তৈরি করতো। প্রাচীনকালের এই সাধারণ ব্যবহার্য বস্তুগুলি

এখন সৌখিন সমাজে "কিউরিও" হিসাবে বসবার ঘরে স্থান পেয়েছে। সে-যুগের সৌখিন ধনী লোকেরা ইচ্ছামত নক্সা প্রভৃতি দিয়েও শিল্পীদের পরিকল্পনার খোরাক যোগাতেন।

বাঙ্গলার পল্লীসমাজে যদি আবার শিল্পরুচি জাগে তবে অল্প পরিশ্রমের দ্বারাই চাহিদার সৃষ্টি করবে। প্রাচীনকালে শিল্প-শিক্ষা তেমন সুলভ ছিলো না, এর জন্য বহু পরিশ্রম করতে হোতো। কারণ শিল্পীরা তাদের জাতীয় ব্যবসা নিজেদের মধ্যেই রেখে দিতে চাইতো। এখন এদেশে দারুশিল্প শেখবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। ভারত সরকারের তরফ থেকেই শিল্পকলার উন্নতি বিধানের জন্য বহু ব্যয় করা হচ্ছে। আজকাল কৃষি-বিদ্যালয় ভবনে কাঠের কাজ অবশ্য জ্ঞাতব্যরূপে ধরা হয়, যাতে গৃহের স্বচ্ছন্দতা বাড়ানো যায় এবং প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারা যায়। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। অন্যান্য স্বাধীন দেশের মত আমাদেরও প্রয়োজনীয় জিনিষের মধ্যে যতটা নিজে করা সম্ভব—তার জন্য অপরের মুখ চেয়ে বসে থাকলে চলবে না। প্রাচীন কালের শিল্পীদের ন্যায় কাঠ ও কুঠারের সংঘাতে পুনর্জীবিত করতে হবে আমাদের হারানো শিল্পের কলা-কৌশল। এই শিল্পকে আজ লোকায়ত্ত করে তোলার ভার শিল্পীদেরই হাতে। বিশেষ করে জনসাধারণকে আজ এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সমবেত চেষ্টার ফলে আমরা সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হবো। রূপকারের হাতেই গড়ে উঠবে ভারতীয় শিল্পধারায় নব-রূপ।

ঈশপের গল্প

ঈশপের গল্পের প্রচলন যথেষ্টই আছে এবং এ গল্প অনেকেই শুনেছেন— আজ আমি তাই থেকেই দু-একটী গল্প বলবো। তার আগে ঈশপের কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। ঈশপের জন্ম হয় এশিয়ার অন্তর্গত

ফ্রিজিয়া নামে একটী দেশে। প্রথম জীবনে তিনি ক্রীতদাস ছিলেন। কিন্তু তাঁর বাকচাতুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে প্রভু ইয়াডমন তাঁকে মুক্তি দেন। এর পরে ঈশপ নানা দেশের রাজসভায় গিয়ে তাঁর সরস গল্পের জন্য সকলের প্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর গল্পের খ্যাতি ক্রমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঈশপ নানা দেশ ঘুরে শেষে লিডিয়ার রাজা ক্রেজারের রাজসভায় উপস্থিত হলেন। রাজা তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন। রাজসভায় আরো অনেক দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের নীরস বাদানুবাদ রাজার মনস্তুষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু ঈশপ তাঁর সরস গল্পের মধ্য দিয়ে নীতিকথা শুনিয়ে সহজে রাজার মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুতরাং রাজসভায় তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো সকলের উপরে। রাজা ক্রেজার তাঁকে খুব পছন্দ করতেন এবং ঈশপের প্রতি তাঁর বিশ্বাস যথেষ্ট ছিল। এই কারণে অনেক সময় রাজকার্য্যের ভার দিয়ে ঈশপকে নানা দেশে তিনি পাঠাতে লাগলেন। একবার তাঁকে কার্য্যের জন্য "ডেল্‌ফি"তে যেতে হয়েছিল, সেখানে তিনি তাঁর স্বরচিত কতকগুলি গল্প বলেন, যার মধ্যে ওখানকার অধিবাসীদের প্রতি শ্লেষোক্তি ছিলো। তাইতে সেই দেশের পুরোহিতেরা ক্রুদ্ধ হয়ে ফ্রিডিয়ার এক খাড়াই পাহাড়ের উপর থেকে ঈশপকে মাটিতে ফেলে দেয়। তার ফলে ঈশপের মৃত্যু হয়। যেখানে তাঁকে হত্যা করা হয়, সেখানে ভীষণ মহামারী দেখা দেয়। সেখানকার অধিবাসীরা ভীত হয়ে ওঠেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারীকে ক্ষতিপূরণের টাকা দেবেন বলে ঘোষণা করেন। ঈশপের বংশের কেউ এ সংবাদ পেয়েও এলো না দেখে, শেষে সেই টাকা ঈশপের প্রভু ইয়াডমনের নাতিকে দেওয়া হয়। তাঁর মৃত্যুর প্রায় দুশো বছর পরে, এথেন্সের যেখানে সপ্তঋষির মূর্ত্তি আছে, তার ঠিক সামনেই ঈশপের একটী প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত হয়। এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন তখনকার এক বিখ্যাত শিল্পী ল্যাসিপাস। ঈশপের গল্পের চরিত্রগুলি পশুপক্ষী হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলি মানুষের চরিত্রেরই নানা দোষগুণের প্রতিরূপ। এই ভাবে গল্পের মধ্যে শিক্ষা

দেবার রীতি আমাদের দেশের হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, জাতক প্রভৃতিতেও দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর লেখা গল্পের থেকে দু-একটী গল্প আমি বলছি—

এক বনে একটী খরগোস বাস করতো। সে অত্যন্ত নিঃসহায় ছিল, কারণ অল্পবয়সেই মা-বাবাকে হারিয়েছিলো। বনের বড় বড় জন্তু জানোয়ারেরা তাকে খুব স্নেহ করতো এবং তার দুঃখে সহানুভূতি দেখাতো। তারা তাকে বলতো—"দেখ খরগোস, বিপদে পড়লে আমাদের কাছে এসো, আমরা সাহায্য করবো।" একবার এক ব্যাধ সেই খরগোসকে আক্রমণ করলে। সে তখন প্রাণভয়ে ছুটে ষাঁড়ের কাছে গিয়ে বললে,—"তোমার কাঁধে চেপে পলায়ন করলে আমার বিপদ হবে না। এই সময়ে আমাকে সাহায্য করো।" খরগোসের কথা শুনে ষাঁড় বল্লে—"আমার এখন অন্য কাজ আছে, বিরক্ত কোরো না।" কাজেই খরগোসটী সেখান থেকে ফিরে এসে মোষের কাছে গেলো। সেও ওই একই কথা বললে। এইরূপে প্রত্যেক বন্ধুর কাছ থেকেই খরগোস একই উত্তর পেলে। তখন সে বুঝতে পারলে যে, যে সকল বন্ধু তাকে সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলো, তারা সত্য কথা বলে নি। মৌখিক ভদ্রতা দেখিয়েছিলো মাত্র। এমন সময় ব্যাধও ক্রমশঃ তার কাছে এগিয়ে এলো, তখন সে দেখলে নিজের উপর নির্ভর করতে না পারলে মরতে হবে। এই ভেবে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে। সে যাত্রায় সে রক্ষা পেলে। এই গল্পটী পড়ে আমাদের এই শিক্ষা হয় যে—অপরের কাছ থেকে সাহায্যের প্রত্যাশা না কোরে নিজের উপর বিশ্বাস রেখে কাজ করাই ভালো। আত্মনির্ভরতা থাকলে সকল বিপদকেই তুচ্ছ বলে মনে হয়। বিপদে এবং সম্পদে সকল সময়েই শুধু একমাত্র ভগবানই প্রকৃত বন্ধু। অপরের কাছে সহানুভূতির প্রত্যাশা না করাই শ্রেয়।

আর একটী গল্প হচ্ছে—

একবার একটী ছেলে নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। তার স্বভাবটী কিছু চঞ্চল ছিলো। নদীতে তখন জোয়ার এসেছে, অন্য সকলে

অল্প জলে দাঁড়িয়ে স্নান করছিল। ছেলেটী কিন্তু সাহস দেখাবার জন্য সাঁতার কেটে অনেকটা দূরে চলে যায়। তীরে একটী বলিষ্ঠ যুবক দাঁড়িয়ে ছিলো, সে বালকটীকে ডুবে যেতে দেখে তাকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করতে লাগলো। তার উপদেশ এত বেশী দীর্ঘ হতে লাগলো যে, ছেলেটী প্রায় ডুবে যায়। সে তখন ওই যুবককে কাতর কণ্ঠে বললে, 'মহাশয়, আগে আমায় উদ্ধার করুন তার পরে যত খুসী বকবেন, আমি ডুবে গেলে আর মিছামিছি বকে লাভ কি হবে।' এমন সময় অন্য একটী যুবক লাফিয়ে পড়ে এবং ছেলেটীকে জল থেকে উঠিয়ে আনে। এই গল্পের সার অংশটীতে বোঝা যায় যে,—মুখে যা বলবে কার্য্যে তা দেখাতে হবে। শুধু মুখেতে বড় বড় কথা বললে আসলে কাজ কিছুই হয় না। মুখে কথা বলার চেয়ে কার্য্যে দেখানোই বাঞ্ছনীয়।

এবারে আর দুটী গল্প বলে আমার গল্পের ঝুলিটী বন্ধ করবো।

কোন এক গমের ক্ষেতের মধ্যে ভরতপাখী বাসা বেঁধেছিলো। তার কয়েকটী বাচ্চা হয়েছে। ওপরে নীল আকাশের পানে তাকিয়ে তারা মনের আনন্দে গান করে, ভোরের আলোতে তারা জেগে ওঠে। পাকা গমের মিষ্টি গন্ধে তাদের মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। মা-পাখী রোজ বেরিয়ে যায় বাচ্চাদের খাবারের সন্ধানে। বাচ্চারা মার অপেক্ষায় বসে থাকে। সেদিন মা-পাখী ফিরে এসে দেখে বাচ্চারা ভীষণ ভয় পেয়েছে। মা জিজ্ঞাসা করলে—"আজ তোদের কি হয়েছে?" তারা বল্লে—"মা, আজ আলের ধারে দুজন লোক এসেছিল। তারা বল্লে, গম তো বেশ পেকে উঠেছে, এবার কাটতে হবে। কাল আমাদের বন্ধুবান্ধবকে ডেকে নিয়ে আসবো। আমরা একলা এত কাজ পারবো কেন?" মা-পাখীটা সব শুনে বল্লে—"তাইতেই তোদের এত ভয়?" বাচ্চারা বল্লে—"না মা, ওরা অনেক বন্ধুদের ডেকে আনবে বল্লে। আমাদের কি হবে মা তাহলে?"

মা পাখী বল্লে—"কিছু ভয় নেই তোদের, তোরা যেমন আছিস চুপচাপ বসে থাকিস।"

পরের দিন যথাসময়ে লোক দুটী আবার এলো, কিন্তু কই তাদের বন্ধুবান্ধব কেউ সঙ্গে আসেনি তো! ওই দুজন লোকের মধ্যে বয়স্ক লোকটী বাবা আর অন্যটী ছেলে। বাবা বল্লে—"কই, আজ বন্ধুবান্ধব তো কেউ এলো না। তুই কাল গিয়ে আমাদের আত্মীয়-কুটুম্বদের ডেকে আন দেখি।" ছেলে বল্লে—"আচ্ছা।"

মা বাসায় ফিরে এলে বাচ্চারা সকল কথা জানালে। মা-পাখীটা হেসে বল্লে—"কিছু ভয় নেই তোদের। তোরা নিশ্চিন্ত হয়ে বাসায় বসে থাক।"

পরের দিন ক্ষেতে কেউ এলো না। তার পরের দিনও নয়। দুদিন এইভাবে কেটে যাবার পর আবার সেই লোক দুটী ক্ষেতের ধারে এসে দাঁড়ালো। ক্ষেতের অবস্থা দেখে বয়স্ক লোকটী তার ছেলেকে বল্লে—"কই, ওরা তো কেউ এলো না দেখছি।" ছেলে বল্লে—"দুদিন তো আমরা অপেক্ষা করলাম তা ওরা এলো কই। আর বেশী দিন তো এভাবে রাখা চলে না, ফসল নষ্ট হয়ে যাবে।" তার বাবা বল্লে—"কেউ যখন এলো না তখন আর কি করা যাবে। কাল ভোর বেলা থেকে আমরা দুজনেই কাটতে সুরু করি, কি বলিস?" ছেলে বল্লে—"সেই ভালো হবে বাবা, কাল ভোর থেকেই কাজ সুরু করা যাক।" পাখীর বাচ্চারা তাদের মাকে সেদিনের সকল কথাই বল্লে। সব শুনে মা বল্লে—"তবে আজ রাত্রেই আমাদের এ ক্ষেত ছেড়ে চলে যেতে হবে।" বাচ্চারা আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কেন মা, আজ রাত্রেই চলে যেতে হবে কেন?"

মা বল্লে—"তোমরা বুঝতে পারলে না! এবারে ওদের নিজেদের কাজ নিজেরাই করবে বলে ঠিক্ করেছে। অপরের মুখ চাইছে না। এবারে ক্ষেত সাফ হয়ে যাবে। অপরের মুখ চেয়ে বসে থাকলে কোন কাজ সারা হবে কিনা সন্দেহ আছে। নিজের কাজ নিজে করাই ভালো।"

ইঁদুরদের এক মস্ত সভা বসেছে—নানা জায়গা থেকে নানা রকমের ইঁদুর এসে জমা হয়েছে, বড় ইঁদুর, মাঝারি, ছোট, সব রকমেরই আছে। সকলেই বিশেষ চিন্তিত, চিন্তার কারণ হচ্ছে পাড়াতে এক বড় শিকারী বেড়াল এসেছে, তার জন্যে ইঁদুরদের বংশ লোপ পেতে বসেছে। দিনের পর দিন সে যেভাবে ইঁদুর মেরে চলেছে, তাইতে ভয় হবারই কথা। বেড়ালের ভয়ে তারা গর্ত্ত থেকে মাথাটী পর্য্যন্ত বার করতে সাহস পায় না। কি জানি কোন ঝোপের মাঝে, কিম্বা গাছের আড়ালে যদি সে ওৎ পেতে বসে থাকে, যদি দেখতে পায়, অমনি তার ঘাড়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দিবারাত্রি গর্ত্তের ভেতরে লুকিয়ে থেকে তারা অস্থির হয়ে পড়েছে। কি করে ওই দুষ্টু বেড়ালকে জব্দ করা যায় শুধু সেই একমাত্র চিন্তা। সুতরাং একটী নিরাপদ জায়গা বেছে নিয়ে তারা সভা করলে। অনেক পরামর্শ হলো কিন্তু কোনোটাই শেষ পর্য্যন্ত টেঁকে না। সকলেই বিশেষ চিন্তিত। সবশেষে একটী বাচ্চা ইঁদুর প্রস্তাব করলে—"এক কাজ করা যাক্, এই অত্যাচারী বেড়ালের গলায় একটী ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া যাক্, সে কাছে আসবার আগেই আমরা ঘণ্টার শব্দ পাবো, তখুনি আমরা পালিয়ে যেতে পারবো। তাহলে আর আমরা বিপদে পড়বো না।" প্রায় সব ইঁদুরই এই প্রস্তাবটী সমর্থন করলে। সকলেই বললে—"ঠিক্ কথা, এই যুক্তিই ভাল।" একটী বুড়ো ইঁদুর এক কোণে দূরে বসে এদের সব আলোচনা শুনছিলো। এবারে সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—"আমাদের এই বন্ধুটী যে প্রস্তাব করেছেন এটা অবশ্য খুবই ভালো। তবে—কথা হচ্ছে--যদি ঠিক মত এ প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করা যায়। কিন্তু আমি জানতে চাই, ওই বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটী বাঁধবে কে?"

তখন সকলে মুখ-চাওয়াচায়ি করতে লাগলো। সত্যিই তো, এতক্ষণ এই কথাটীই তাদের মনে হয়নি। কেউ আর একথার উত্তর দিতে পারে না, তখন বুড়ো ইঁদুরটী বললে—"দেখ বন্ধু, যুক্তি অনেক রকম দেওয়া যায়। সেটা তত কঠিন নয়, কিন্তু সেই যুক্তি মত কাজ

করাই সব থেকে কঠিন।" উপদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করা সহজসাধ্য নয়। অপরকে পরামর্শ দেবার আগে ভেবে দেখতে হবে যে—সেই যুক্তিটী কার্য্যে পরিণত করা সহজ হবে কিনা, তার পরে পরামর্শ দেওয়া সঙ্গত হবে।

ঈশপের এই প্রকারের বহু গল্প আছে। তিনি প্রত্যেকটীতে বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা দিয়েছেন। গল্পগুলি সব করুণ, সুযুক্তিপূর্ণ। এই গল্পগুলির বিশেষত্ব হচ্ছে, এগুলি ছোট ও বড় সকল লোকের কাছে সমাদর লাভ করেছে।

মা

আমার মা কি হারায় কখন
লুকিয়ে আছে গোপনে,
মার সে আঁখি যায় কি ভোলা,
মনের মাঝে জাগায় দোলা,
মিলিয়ে আছে সেই চাহনি
নীল আকাশের অঙ্গনে।

তারার মাঝে দেখিতে পাই মায়ের নয়ন-তারা,
সে চাহনি দেখি আজি বিশ্বভুবন ভরা।
আলতা পরা চরণ দুটি দেখিতে পাই স্বপনে,
মা কি আমার হারায় কভু, লুকিয়ে আছে গোপনে।
মার সীমন্তের সিঁদুর রেখা রাঙ্গায় গোধূলির প্রাঙ্গণে,
বৈশাখের ঘন আঁধার মায়ের চোখের অঞ্জনে।

ঘুম ভেঙ্গে যায় গভীর রাতে
নিদ্ আসে না আঁখিপাতে
মা জাগে মোর শিয়রেতে
হাস্য মধুর বয়ানে।
মা কখনও হারায় নাকো
রয়েছে মোর নয়নে।
যখনি পাই দুঃখ ব্যথা
মনে পড়ে মায়ের কথা,
তোর চরণেই জানাই মাগো,
আমার ব্যথা গোপনে॥

শরতে আগমনী

শরতের রাণী আসিল আজিকে
হৃদয় মোদের উঠিল ভরি ;
নূতন সাজেতে সাজিল ধরণী
আনিছে তাহারে বরণ করি'।

নবীন ধানের মুকুট মাথায়
শেফালির মালা গলাতে যার,
শিরিষ বকুল নানা ফুলদলে
ভরিয়া এনেছে সাজিটি তার।

সোনার বরণ আঁচলখানি যে
লুটায়ে পড়েছে মাটির 'পরে ;
সকলের মনে আনন্দ আজ
আনন্দময়ী আসিছে ঘরে ॥

অহঙ্কার

করিস কেন মিছামিছি বৃথা অহঙ্কার,
রুদ্ধ ঘরে আছিস বসে
ফেল রে ভেঙ্গে দ্বার।

দেখ রে চেয়ে অসীম পানে
সীমার রেখা নাই সেখানে ;
ক্ষুদ্র হতেও ক্ষুদ্র রে তুই
কণামাত্র সার।

শান্তি যদি চাস্ রে মনে
বেরিয়ে যা রে সঙ্গোপনে,
সবার তরে কাঁদিস রে তুই
নিস্ রে সেবার ভার।

পরিচ্ছদে হয় না বড়
গর্ব্বে ঢাকা যার,
জ্ঞানের ভূষণ পরিস্ রে তুই
ঘুচ্‌বে অহঙ্কার॥

স্মরণে

গভীর নিশীথে নিভে আসে দীপ
মেঘে ঢাকা থাকে চাঁদ;
বসি নিরালায় তোমারি লাগিয়া
মনে জাগে কত সাধ।

দখিনা বাতাস চুপে চুপে আসে
মোর বাতায়ন তলে,
কি যে রেখে যায় কি কথা শুনায়ে
গোপনে কত না বলে।

তুমি যদি আজ আসিতে হেথায়
আধো আলোকেতে বসি' দুজনায়
আঁধার রাতের গভীর পরশ
করিতাম অনুভব;
ভাসিয়া আসিত দূর বনানীর
চামেলীর সৌরভ।

যামিনী আমার জাগিয়া কাটিছে
একেলা বিজন ঘরে,
জ্যোছনা হয়তো পড়েছে লুটায়ে
তোমার নয়ন 'পরে।

আজিকার রাতি বিবশ নিঝুম,
যদি আধো রাতে ভাঙ্গে তব ঘুম ;
মোর নাম স্মরি ব্যথিবে কি হিয়া
মোরে যদি মনে পড়ে॥

রবীন্দ্র স্মরণে

শ্রাবণের কাল মেঘ করিল কি গ্রাস
'রবি'হীন হলো বুঝি তাই বিশ্ব আজ ?
কবি, তুমি কোথা আজ কোন্ সুরলোকে
রচিছ নূতন গান নবীন আলোকে।

ভরিয়া রয়েছে হেথা পূর্ণ পাত্রখানি,
অফুরন্ত দানে তব ফুরাবে না জানি।
তবুও মেটে না আশা তবু জাগে ক্ষুধা।
আজি আরো পেতে চায় তব স্নেহ-সুধা।

সেথা কি ভরেছ সাজি নব উপচারে
গাঁথিছ নিপুণ কোরে তব ছন্দ মালা,
অনুরাগে সিক্ত করি আপনার করে
পারিবে না পাঠাইতে এ ধরণী 'পরে।

রূপ, রস, গন্ধে ভরা আজি কোনখানে
উছলি উঠিছে তাই তব ছন্দ গানে ;
সেথা কি শুনিতে পাও নূতনের ডাক
ফেলে আসা অতীতের 'পঁচিশে বৈশাখ'।

আজি হেথা কালো মেঘে বিষাদিছে মন,
আবার আসিল ফিরে 'বাইশে শ্রাবণ'।
তোমারে স্মরণ করি ফেলি অশ্রুধার,
হে মোর অমর কবি লহো নমস্কার ॥

গান্ধীজী

চলে গেছো আজ সেই অমরায়
তুচ্ছ করিয়া এ ভাঙ্গাগড়া,
যুগ যুগান্তে শুনি এই বাণী
গেছে যারা চলে ফেরে না তারা।

আজিকে মোদের হৃদয় বেদনা
রেখেছি ঢাকিয়া গোপন কোণে,
শুক্তির বুকে মুক্তার মত
বন্ধ সে আছে সঙ্গোপনে।

মরণ! সে কি নিতে পারে কাড়ি
স্মরণ-গ্রন্থি টুটিয়া ?
স্মৃতি জেগে রয় গন্ধ আঁকড়ি
পড়িলে কুসুম ঝরিয়া।

আজি কি কার্য্য হয়ে গেল শেষ
স্বাধীনতা দিলে আনি' ?
তাই কি গিয়াছো শান্তির পারে
ছাড়িয়া জন্মভূমি ?

আজিকে মোদের কে জাগাবে প্রাণ
কে দিবে প্রেরণা আনি,
তুমি আজ নাই কে শুনাবে আর
তব মধুময় বাণী।

পারিনি জানিতে মৃত্যুর দূত
এসেছিলো তব দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিয়ে গেল আজি
এই ভারতের 'পরে।

তব চিতানলে হেরি আজ জ্বলে
দুখের রক্তরেখা,
সহিতে হবে তা লাজ অপমান
ভাগ্যে যা আছে লেখা

আজিকার এই দুঃসহ ব্যথা
হয়ে যাক অবসান,
হে মহামানব! আসিও আবার
লইয়া মহৎ প্রাণ।

জন্ম লইয়া এ ভারতবর্ষে
রেখো ভারতের মান,
সর্ব্ব কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠুক
তোমারি সে আহ্বান।

কঠিন যে কাজ করি গেলে আজ
ভারত মুক্ত তাই ;
তব স্মৃতি জাগে আজো মন মাঝে
তুমি আজ হেথা নাই।

প্রভু, করিও করুণা দিওগো শান্তি
যে গিয়াছে তব পাশ ;
সান্ত্বনা-বাণী পাঠায়ো মোদের
মিটায়ো সকল আশ॥

মরণ

মরণ ! তুমি রুদ্রের রূপে এসো না বন্ধু
শান্ত চরণে আসিও।
হৃদয়ের মাঝে এসো রাজ বেশে
সকল কালিমা নাশিও।

আমি আপনি তোমারে করিলে স্মরণ
কাছে এসো তুমি—হে মোর মরণ,
জানাইলে মোর সকল কামনা
বাসনা সফল করিও।

রহিব জাগিয়া তোমারি লাগিয়া
বাতায়ন খুলে রাখি',
শীতল পরশ দিয়োগো আমারে
নয়নে নয়ন রাখি'।

যদি মোর মনে কভু জাগে ভয়
সাথে যেতে যদি লাগে সংশয়,
তোমার করুণা-পরশন দিয়ে
জীবন-দীপটি নিভায়ো।

ফেলিয়া সকলি
যাব তব সাথে, বন্ধুর বেশে আসিও ॥

ফাল্গুনে

আজিকের রাঙ্গা ফাল্গুন দিনে
রাঙ্গা আবিরের খেলা ;
সে তো একদিন একটি বেলার
ক্ষণিকের মধুমেলা।

এ খেলার মাঝে লুকায়ে রয়েছে
হৃদয়ের অনুরাগ ;
অন্তর ভরে রেখেছি মিলায়ে
প্রীতিচন্দন ফাগ্।

রাঙ্গাইয়া দিব সবাকার মন
জ্বালাব দীপ্তশিখা ;
ভেদাভেদ ভুলি সবাকার ভালে
দিব কুম্‌কুম্ টীকা।

মুছিবে না কভু ঘুচিবে না এই
প্রাণের মিলন লিখা ;
রহিবে দীপ্ত তোমার চিত্তে
রক্তিম ফাগ্-রেখা।

আবির গুলায়ে খেলিব রে হোলি
রাঙ্গা হয়ে যাক প্রাণ ;
সকল দ্বন্দ্ব দ্বিধা ঘুচে যাক্
নির্ম্মল হোক প্রাণ ॥

প্রাণের ডাক

প্রাণে তোমার পরশ দিয়ে
দ্বন্দ্ব দ্বিধা ঘুচিয়ে দাও ;
দুঃখ তাপে দগ্ধ হিয়া
তুমিই প্রাণে শান্তি দাও।

পারছিনে কো ডাকতে আর
সহ্য করা হ'ল ভার ;
মুছিয়ে দিয়ে সকল কালি
সকল ব্যথা হরণ করো।

সুখের দিনে ভুল করি যে
ডাকতে তোমায় পরান ভরে ;
দুখের সাথে জড়িয়ে থেকে
তাইতে ডাকাও আকুল করে।

ডাকতে আমি পারবো না আর
সুখে দুঃখে তোমায় প্রিয় ;
রাখবো সদাই মনে মনে
হৃদয় মাঝে আসন নিও।

সংসারের এই ঘূর্ণিবায়ে
ছড়িয়ে গেল মন প্রাণ ;
তুমিই জ্বালাও আমার প্রদীপ
রাঙিয়ে দিতে আঁধার প্রাণ।

শুনতে তুমি পারছো না কি
প্রাণের এ ডাক্ হে মোর প্রিয় ;
আকুল প্রাণে ডাকছি হে নাথ,
আমার সকল বোঝা তুমি নিও ॥

তৃপ্তি

(১)

পথে পথে যাই যে হেঁকে
ফুলের মালা চাই,
আর পারিনে বইতে বোঝা
শেষ করে তাই যাই।

সকাল থেকে ফিরি একা
কখন তোমার পাবো দেখা,
পাত্রখানি উজাড় করেই
তোমায় দিতে চাই।

(২)

দিনের শেষে ক্লান্ত বেশে
ফিরছি যখন একা,
হঠাৎ দেখি পথের মাঝে
তারই সাথে দেখা।

চিরদিনের আরাধনার
কল্পনার রাণী
আমার কাছেই এগিয়ে এসে
চাইলে মালাখানি।

সাজিয়ে দিনু তারে আমি
অভিসারের সাজে,
মনে হলো পূর্ণ আমি
আমার সকল কাজে ॥

বর্ষা বিদায়

বরষা রাণীর বিদায় চাহনি
শরতের মেঘে ফেলেছে ঢাকি ;
বিদায়ের পালা এলো যে তাহার
কেমনে তাহারে ফিরাবে ডাকি।

দেখি আনমনে কেতকীর বনে
নাইকো লোলুপ ভ্রমরার দল ;
কদম কেশর লুটায় আজি যে
বরষা-রাণীর চরণ 'পর।

ডাহুকির ডাকা বন্ধ হলো যে,
ময়ূর ময়ূরী নাচে না আর ;
শিশিরসিক্ত বনানী আজিকে
কেমনে ভুলিবে স্মৃতিটি তার ॥

সারী

১

সোনার খাঁচায় বন্দী হয়েছে
আমার মুখরা সারী—
গাহে নাকো আর মধুর সে গান,
কে নিলো সে গান কাড়ি !

বসি এক কোণে ভাবে আনমনে
পুরানো দিনের কথা,
কেমনে জানাবে নিঠুর মানবে,
হৃদয়ের ব্যাকুলতা।

ভোরের বেলায় জাগিয়া উঠিত
সাথীদের মিঠে ডাকে—
হাত ধোরে তারা যেতো বাহিরিয়া
ছোট নদীটির বাঁকে ।

বনের সরস সুমিষ্ট ফলে
মিটাতো তাদের ক্ষুধা,
ভাবিত দুজনে হরষিত মনে
এই স্বরগের সুধা ।

ফুলের শাখায় দিতো তারা দোল
ভরিতো আকাশ গানে—
সাঁঝের বেলায় ফিরিতো কুলায়
মার কাছে খুশি মনে।

জানি না কেমনে, শুধু অকারণে
আসিয়া রাজার দ্বারী
নির্ম্মম করে বন্দী করিলো
নিয়ে গেলো তারে কাড়ি।

বন্ধ করিয়া সোনার খাঁচাতে
খেতে দিলো ফল আনি'—
মুদিয়া নয়ন রহিলো বসিয়া
ছুঁইল না অভিমানী।

২

অন্ধকারের বন্ধ কারাতে
থাকিতে লাগে না ভালো,
আজিও হেথায় প্রবেশ করেনি
উষার প্রথম আলো।
পাষাণের সম হৃদয় এদের
জানে না বাসিতে ভালো।

মনে ভাবে এরা গর্ব্ব করিয়া
খুসি নাহি কেন মনে?
বনের পথেতে ঘুরিয়া বেড়াতে,
বসেছো স্বর্ণাসনে।

এতেও তোমার গেলো নাকো রোষ,
ভাঙ্গিল না অভিমান ?
ভালবাসা দিনু, করি আনন্দ
গাও তব প্রিয় গান।

ওরা বুঝিবে না ! কত যে যাতনা
কত যে বেদনা মোর,
বুকে ওঠে বাজি রুদ্ধ বেদনা
আঁখিতে বহে যে লোর ;

পারি না গাহিতে শেখানো এ গান,
আছে যত কথা, নাহি আছে প্রাণ,
রিক্ত আমি যে, সকলি দিয়াছি
প্রতিদান কিছু চাই,
মুক্ত করিয়া দাওগো আমারে
বনেতে ফিরিয়া যাই ॥

হাসনুহানা

আমার হৃদয় ভরে দিয়েছিলি
আপন গন্ধে তোর,
ফুটেছিলি তুই মোর আঙ্গিনাতে
হাসনুহানাটী মোর !
কেন গেলি ঝরে এ মাটির 'পরে,
রেখে গেলি স্মৃতিখানি !
মোর মনে জাগে গত যামিনীতে
ফুটেছিলি অভিমানী !

চাঁদ বুঝি তোরে চেয়েছিলো ? তারি
আশায় ছিলি রে জাগি।
উষার বাতাসে পড়িলি ঝরিয়া
তাই কি শরম মাগি ?
আপনা বিলায়ে কেন গেলি ঝরে,
না শুনায়ে তব বাণী—
কার 'পরে আজি অভিমান তব
কারে দিলি হিয়াখানি !
আমার লিখন ফুটে থাকে শুধু
পথের ধূলির 'পরে,
কেহ তুলে নেয় ভালোবেসে তারে
কেহ অনাদর করে।
ক্ষুদ্র যদিও এই বনফুল,
নাহিকো রংয়ের গৌরব।
তবুও যখন উঠিবে ফুটিয়া
মিলিবে হয়তো সৌরভ।
চলিতে চলিতে বনপথে যেতে
কত লোকে তারে দলে।
পথের স্মৃতিটী পড়ে থাকে পথে,
তখনি তাহারে ভোলে।
কল্পনা দিয়ে যে ফুল সাজায়ে
গাঁথিয়াছি মালাখানি,
যামিনীর শেষে শুখাবে সে-ডোর
কেহ চিনিবে না জানি ॥

মূল্যহীন

আমি ভাবি তাই কি হবে কবিতা লিখে ?
শুধু অকারণে ! মূল্য যার নাই।
জানি মনে মনে, কিন্তু তবু লিখে যেতে হয়,
ভালমন্দ ভাবিবার নাহিক সময়।
বাতাস যখন বয় উতলা ব্যাকুল,
সে কি কিছু ভাবে ?
সমুদ্রের বক্ষ ভেদি' ছোট বড় ঢেউ
বাহিরিয়া আসে যবে।
চঞ্চল শিশুর সম ছুটে বালুচরে
কলকল স্বরে,
এই প্রশ্ন তখন কি করে ?
যখন চন্দ্রিমা উঠে আলো করে নভে
সে কি মনে ভাবে—
কেন করি আলো বিতরণ
মাঝ পথে যায় কি সে থেমে ?
তাই ভাবি মনে—আমার কবিতাগুলি
রেখে যাবো নিভৃতে গোপনে
যেমনি পথের মাঝে ফোটে বনফুল অতি সঙ্গোপনে।
কেহ তার নাহি রাখে খোঁজ, পড়ে থাকে পথের ধূলায়—
কত লোকে পথে যেতে তারে দ'লে যায়।
তবু ফুটে থাকে পথে। নাইবা প্রকাশ হোলো
এ লেখা আমার কাগজে মাসিকে !
নাইবা জানিলো লোকে ! তবু যাবো লিখে।
অক্ষম লেখনী মোর, ভাষা নাহি তার
শুধুই কল্পনা মাত্র দিনু উপহার ॥

মানা

জল আনতে ছল্ করে আর নীল যমুনায়

যাস্‌নে বধূ,—যাস্‌নে বধূ্।

মহুয়া বনের মাতাল হাওয়ায়

দোল দিয়ে যায় পাপিয়া-বধূ্।

নাম না জানা ফুলের মেলা,

চম্পা, যূথী, বকুল, বেলা,

কাঁদছে কেন গোপন ব্যথায় ?

বুকভরা তার আছে মধু্।

বুলবুলি আজ গোলাপ শাখে

দোল দিয়ে যায় পরাগ মেখে,

নীরবে তাই আছে জেগে,

আমের শাখায় কোকিল-বধূ্।

তাইতে বলি আজকে রাতে,

যাস্‌নে তুই আর যমুনাতে

কাঁদন ভরা ফাগুন সাঁঝে

একলা পথে যাস্‌নে বধূ্॥

অভিমান

মাগো—তুমি দুষ্টু বড়, কেবল আমায় বকো,

আদর কোরে কেন আমায়

কাছে ডাকো নাকো ?

তোমার সঙ্গে কোরব আড়ি

চলে যাবো মামার বাড়ী,

দেখবো এবার আমায় ফেলে
কেমন কোরে থাকো।
মাগো—তুমি দুষ্টু বড়, কেবল আমায় বকো।

কে তোমাকে তুলে দেবে
শিব-পূজার ফুল ?
ঘোষ বাবুদের বাগান থেকে
আন্‌বে টোপা কুল ?
কে ভুলিয়ে দুধ খাওয়াবে
তোমার দুষ্ট পুষি—
বাবা এলে খবর দিয়ে
করবে তোমায় খুশি।
এবার ঝড়ে আম কুড়িয়ে রাখবো ভোরে আমি,
সকালবেলা এসে দেখেই খুশি হবে মামী।
ভারি মজা, মামার বাড়ী মণ্ডামিঠাই খাবো,
তুমি যদি আনতে না যাও
থেকেই আমি যাবো॥

অভিসারিকা

যুথিকার মালা পরিও গলায়, অঙ্গে অরুণ বাস,
মুকুতার মালা ফেলিয়ো খুলিয়া
তোমারে সে দেয় লাজ।
আভরণ নাহি সাজে ও অঙ্গে,
কমলের বালা ও মনিবন্ধে
সাজিয়ো রাণী—
বনদেবী সাজে হরি'তে হৃদয় আজ।

কাজল পরিয়ো সজল নয়নে
উজল রহিবে মধুর বয়ানে—
এলাইয়ো বেণী, ফণিনীর সম
দুলিবে পিঠের মাঝ।
অভিসারে যবে যাবে গো বালিকা
তুলি নিও হাতে কুসুম-মালিকা
কুঞ্জের দ্বারে রহিও দাঁড়ায়ে
ফেলিয়া সকল কাজ॥

একা

দিনগুলি মোর যায় যে কেটে—
একলা চেয়ে পথের পানে,
বাদল বায়ে যায় শুনায়ে—
কি-যে-কথা সেই তা জানে।
যখন আমি একা জাগি,
মেঘের পানে তাকিয়ে থাকি
আকাশে যে মাদল বাজে
বাদল সাঁঝে সুর মিলায়ে।
কাছে এসে চুপে চুপে
তারে যখন সুধাই আমি—
যাবার বেলা কি দিলে আজ
শোনাও মোরে আশার বাণী।
সে সুধু কয় একটু হেসে
পরাজয়ের মালাখানি॥

গান

এক

তোমারি সুরে বাঁধা
আমার বীণাখানি,
সোহাগ ভরে আজি
তোমারে দিনু আনি।

আজিকে মিলন রাতি
জ্বালায়ো প্রেমের বাতি
হৃদয় রাখিনু পাতি
রাখিও চরণখানি।

দুয়ার খুলিয়া প্রিয়া,
শরমে জড়িত হিয়া,
তোমারি বরণ মালা
আমারে পরায়ো রাণী॥

দুই

ঝর ঝর ঝরে ধারা
আজি বাদলে,
গুরু গুরু গরজন
বাজে মাদলে।

ঝিল্লি মুখরিত
দামিনী চমকিত,
কম্পন লাগে হৃদে
ঘন ঘটা রে।

হিয়া 'পরে বাজে আজি
কাহার চরণ রাজি
ঘন ঘোর ঘটা আজি
আকাশ ছেয়ে ।

ব্যাকুল বকুল যূথী
কেতকী নব-মালতী
কদম লুটায় আজি
ধূলির 'পরে ।

আজিকে বিরহী হিয়া
কেন ওঠে ব্যাকুলিয়া,
কাহার কাজল আঁখি
স্মরণ করে ॥

তিন

উতলা বায়ে বাদল রাতে
একেলা বসি প্রিয়া,
তরাস জাগে পরাণ মাঝে
ব্যাকুল আজি হিয়া ।

কেমনে বসি রহিছো জাগি
প্রদীপখানি জ্বেলে ?
সহাস মুখে দাঁড়ানু যবে
কহিলে, কেন এলে ?

কোর না লাজ, রেখ না ভয়
মিনতি তব কাছে,
সমুখে আসি দাঁড়ায়ো হাসি
সজল আঁখি মেলে।

বাজায়ো বীণা মোহন করে
করুণ স্বরে প্রিয়া,
পরাণখানি বাঁধিব আজি
প্রেমের রাখী দিয়া

চার

বরষার দিনে বসি বাতায়নে
চাহিয়া সুদূর পানে
হে প্রিয়, আমারে ক্ষণিকের তরে
পড়িবে কি তব মনে ?

ঘন গরজনে সঘন নিশীথে
যখন জাগিয়া রবে,
উতলা বাতাস কানে কানে তব
কার নামখানি কবে ?

কত সুখ-স্মৃতি কত অনুরাগ
কত মান অভিমান,
হয়তো তোমার ক্ষণেকের তরে
ব্যাকুল করিবে প্রাণ।

সুখ-স্বপনেতে দেখিবে জাগিয়া
তোমার প্রিয়ার আঁখি,
স্বপনেরি সাথে মিলাবে যখন
বুঝিবে সকলি ফাঁকি।

ঘন বরিষণে কেতকীর বনে
আঁধার ঢাকিবে যবে—
বসি নিরালায় উতলা হাওয়ায়
পরাণ ব্যাকুল হবে।

বরষা-মুখর ক্লান্ত সাঁঝেতে
চামেলিরে কবে ডাকি'
পিয়াহারা পাখী ডাকে পিয়া পিয়া
বেদনা রাখিবে ঢাকি॥

পাঁচ

(কীর্ত্তন)

(আহা) এত প্রেম সখি ভুলিয়া কেমনে
রয়েছে রাধারে পাশরি,
(আর) যমুনা পুলিনে বাজে নাকো সেই
রাধা নামে সাধা বাঁশরী।
(সখি) আর বাজে না, বাজে নারে—
সেই রাধা নামের সাধা বাঁশীখানি
রাধা রাধা বলে আর বাজে না।

(হায়) কেমনে রাধা ধৈরজ ধরে,
এ বেদনা সখি কহিতে নারে
(তার) হিয়ার মাঝারে গোপনে রেখেছে
এ বেদনা কারে কহিতে নারে।

(যবে) যমুনার তীরে ছিলো সে দাঁড়ায়ে
নয়নে নয়ন দিয়া,
সে চাহনি হায় স্পর্শে হৃদয়
তারে দিয়েছিনু হিয়া—
(আমি) তারে দিয়েছিনু হিয়া।

সে যে হিয়ার মাঝে লুকায়ে আছে,
তাহারে আজিকে ভুলিবো কেমনে
ধরিবো কেমনে হিয়া।
(সখি) আমার বঁধুয়া গিয়াছে চলিয়া
আমারি আঙ্গিনা দিয়া।

আমি কেমনে আজি
রহিব ঘরে!
(সখি) সে যদি আজিকে ভুলিবে আমারে
কেন সে ভুলালো মোরে।
যদি মনে নাহি রবে কেন মিছে তবে
বাঁধিলো প্রেমের ডোরে।

হায়, সখি আর সহিতে নারি,
ঐ শ্যামের পিরিতি
কি জানি কি রীতি
বিরহিণী রাই বুঝিতে নারে।

(হায়) কমলিনী তাই ধূলাতে লুটায়
গোপনে নয়ন ঝরে—
(সেই বাঁকা শ্যাম বিহনে রাধার নয়ন ঝরে)
(যা সখি, তারে ডেকে আন তোরা)
(আর যে আমি সহিতে নারি!)

আমার বারতা জানাস্ তাহারে—
আসিবি তু'কথা কয়ে,
সে যে কাঁদায়ে রাধায় চায় কুব্জায়
মথুরায় রাজা হয়ে—

রাধারে কাঁদায়ে যে গেছে চলিয়ে
তারে সেধে কিবা ফল,
পারিস্ যদি তো মাগিয়া আনিস্
শুধু তার আঁখিজল।

থাক্ সখি তোরা
সাধিস্ নাকো,—
এমন করে যে ভুলিতে পারে
(ওরে) তারে আর কেহ সাধিস্ নারে।

মিছে মিছে এই মনের বেদনা
মিছে করি তারে কামনা,
যে সুখের দিন গিয়াছে চলিয়া
আর তো ফিরিয়া পাবো না॥